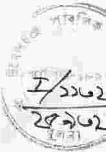
রাজাবলি

আবুল বাশার





প্রারম্ভের গোড়ার কথা

কোনও কোনও রচনার ভূমিকা প্রয়োজন হয়। আমি যখন 'রাজাবলি' লিখতে শুরু করি, কয়েক পৃষ্ঠা লেখার পরই মনে হয়েছিল এর একটি ভূমিকা রচে দিলে রচনাটি পাঠক অধিক উপভোগ করতে পারতেন। গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার আগে এ লেখা পাঠ করে যাঁরা আমাকে কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই রচনাটি সম্বন্ধে কিছু আগাম সংকেত আমার তরফ থেকে দিয়ে রাখলে পাঠকের সুবিধা হত বলে পরামর্শ দিয়েছেন। যাঁরা এই সুযুক্তি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অগ্রসর পাঠক, তাঁদের মতামতকে উপেক্ষা করা যায় না।

অগ্রসর পাঠক এবং আমার নিজের ভাবনার ঐক্য থেকে আর সমস্ত পাঠকের সুবিধার কথা ভেবেই ভূমিকাটি রচিত হল।

পাঠকের সুবিধার কথা যখন উঠেছে, তখন সাধারণভাবে তাঁদের যে কিছু অসুবিধা হয়েছে এবং হবে এ কথা ধরে নেওয়া যায়। উপন্যাসটি লিখতে শুরু করে এবং লিখতে লিখতে বেশ কতক বার মনে হয়েছে যা লিখছি তাকে আর কোনওভাবে অধিকতর স্বচ্ছ করে তোলা যেত নাকি! যদিও সব উপন্যাস সব সময় স্বচ্ছ জলের তলে বালির উপরে পড়ে থাকা মুদ্রার মতো তার সর্বস্বের স্পষ্টতা-বিধান করে না।

উপন্যাসটির ভাষা এ রকম কেন হল, সেকথা প্রথম বলে নেওয়া ভাল। এই ভাষাটি এই উপন্যাসের জন্যই একমাত্র ব্যবহৃত ভাষা ; এ রকম আগে কখনও লিখিনি। অন্তত প্রথমেই সাত রকম বাংলা ভাষায় এই উপন্যাসটিকে শুরু করার চেষ্টা করেছি—আলাদা আলাদা ভাবে। সব রকম উপন্যাসের জন্য এক প্রকার বাঁধা ভাষায় আমি বিশ্বাসী নই। আসলে তা হয়ও না, হওয়ার জো নেই। লেখকের যেমন নিজস্ব ভাষা এবং কণ্ঠস্বর থাকে তেমনই প্রত্যেক উপন্যাসের নিজ-ভাষা এবং কণ্ঠস্বর থাকে। একটি নির্দিষ্ট ও বিশেষ উপন্যাসের জন্য বিশেষ-নির্দিষ্ট ভাষা জুগিয়ে তোলা রচনারই অন্তর্নিহিত প্রণালী। বাঁধা এবং পোষা ভাষা লেখকের শৈলী-শৃঙ্খল। ভাষাকে লেখক-সুলভ মুদ্রাদোষ-কবলিত করা কখনও কখনও লেখকের কিছুটা ব্যক্তিত্ব-বিধায়ক হলেও সেই বৈশিষ্ট্যের সীমাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া উচিত—আমার ভাষার পূর্বের মুদ্রাদোষ এ উপন্যাসেও কিছু আছে কিন্তু নতুন স্বভাবও কিছু কম নেই। সে যাই হোক, শুরু করবার আগে সাতটি ভাষায় বা বিভিন্ন বয়ানে লিখে যাচাই করে নিয়ে তার কোনও একটিকে নির্বাচিত করে নেওয়া হয়েছে।

মানুষ তার আদিতেই ভাষা-সমস্যায় ভুগেছে। সেই ভোগান্তি থেকেই আদিপুস্তক (ওল্ড টেস্টামেন্ট) প্রণীত হয়। খুবই বিস্ময়কর এ কথা যে, ভাষাই মানুষকে আদিতে বিচ্ছিন্ন এবং ছিন্ন করেছে। এই মারাত্মক বিষয়কে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করাটা আমার

কাছে বিশেষ তাৎপর্যবহ ঠেকেছিল বলেই আমি 'মরুস্বর্গ' লিখি। আধুনিক উপন্যাস যে কোনও সমস্যারই আদিতে গিয়ে, শিকড়ে নেমে তার বিশ্বব্যাপ্ত সমগ্রতায় পৌঁছতে চায়।

ভাষা তো আদৌতে শুধু ভাষা নয়, তা সমূলে ভাষা-সংস্কৃতি। ভাষা-ভাগ মানে সংস্কৃতিরও বিভাজন। ভাষার বিভাজন-ক্ষমতাকে ঈশ্বর কুটনীতিজ্ঞের মতো আদিপুস্তকে ব্যবহার করেন। এত বড় আঘাত মানুষ মরুভূমির বুকে সহ্য করেছে। ঈশ্বর মানুষকে যতভাবে অভিশপ্ত করেছেন তার মধ্যে ভাষাভাগ প্রধানতম, কেননা তাই-ই মানুষের আদিম বিচ্ছেদ। আদম-ইভের বিচ্ছেদের চেয়ে তা অনেক গুণ ভারী ও সামাজিক। আরব মরুভূমি শুধু কোনও সুজটিল ধর্মক্ষেত্রই নয়, তা প্রবলভাবে ভাষাক্ষেত্র।

আধুনিক মানুষ বিচ্ছেদ-প্রবণ, ভাব দিয়ে, ভাষা দিয়ে, ধর্ম দিয়ে সে ক্রমাগত নিজেকে ছিন্ন করে চলেছে। মরু-ঈশ্বরের সমস্ত ভূমিকা আজ সে নিজেই গ্রহণ করেছে। অথবা কেন সে বিভক্ত হয় তা সে নিজেও জানে না। ভাষা ও ধর্মের এই বিচ্ছেদগত দাহিকা-শক্তি কীভাবে বিদীর্ণ করে মানুষকে তার আদিরূপ প্রত্যক্ষ করার লোভ থেকেই মরুস্বর্গের জন্ম। বলে রাখা ভাল, এত বিচ্ছেদ ও ছিন্নতার মধ্যেও মানুষ মরুভূমে স্বর্গ গড়ার চেষ্টা করেছিল, সে তার আত্মকৃতির মধ্যে ঈশ্বর-কৃতিকে উদিত করতে চেয়েছিল। মূলত মৌখিক লোক-পুরাণই এই কাহিনীর দ্রষ্টা, লোকই এই কাহিনী প্রথম মরুমর্তে প্রত্যক্ষ করে, তারপর তা বিশ্বগামী হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে পাল্লাদারি করাটা আদিপুস্তকে যেমন সুলভ, আমার দাদিমার মুখেও তা অনর্গলিত ছিল। মরুস্বর্গের বীজ দাদিমায়ের দেওয়া। মূলত রাজাবলিও তাঁরই উপহার, দাদিমায়ের আত্মা ছিল পুরাণ-মুগ্ধ।

আদিপুস্তকের ঈশ্বর অনেকটাই রক্তমাংসের ঈশ্বর। তিনি যতখানি জাদুময় অলৌকিক, ঠিক ততখানিই বাস্তব। ঈশ্বরকে রক্তমাংসে ধরবার চেষ্টা মানুষের গোড়ার চেষ্টা। আদিপুস্তকে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে নদীর ধারে এক রাত্রিতে মল্লযুদ্ধ করে ঈশ্বরাঘাতে নিজের উরু ভেঙে ফেলে। ভগ্নউরু সেই মানুষটির নাম বাংলার মৌখিক পুরাণ অনুযায়ী ইয়াকুব (যার অর্থ প্রবঞ্চক।) কেননা যাকোব বা ইয়াকুব তাঁর যমজ-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃ-সম্পত্তির অধিকার থেকে কূটকৌশলে বঞ্চিত করেন। আদিপুস্তকে তিনিই ইজরায়েল। ইজরায়েল মানে একজন (ভগ্নউরু) বিজেতা, যিনি মল্লযুদ্ধে ঈশ্বরকে পরাস্ত করেছিলেন। মল্লরণ একটি রক্তমাংসের ঘটনা, যাতে ঈশ্বরের মাংসে অবধি আঘাত করা যায়। সেই ঈশ্বরকে আঘাত করা যায় যিনি ভাষা দিয়ে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং আজও সেই ছিন্নতা আমরা বহন করছি।

'রাজাবলি' উপন্যাসে সেই ঈশ্বর রাজনৈতিক-ঈশ্বর। এবং ঐতিহাসিক ঈশ্বর। ইতিহাসকে তিনি রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ছিন্নমূল মানুষকে যিনি বারবার 'মাটি দেব' দেশ দেব'—বলে আহ্বান করেছেন। আজও পৃথিবীর মূল আলোড়নগুলি ঘটে একই আহ্বানে, কখনও তা ঈশ্বর-নিঃসৃত, কখনও তা মনুষ্য-নিঃসৃত। এই আহ্বানকে সামনে রেখে চলতে থাকে ভাষা-ধর্মের বিভাজন-লীলা, মানুষের দল-বাঁধার কাজ। ভাষা ভাষাকে খায়, ধর্ম ধর্মকে খায়—খায় অথচ শেষ করতে পারে না। দলকে আমরা প্রাচীন সময়ে গোষ্ঠীতে বদলে নিতে

পারি। ধর্মযুক্ত ভাষা-সমস্যা, অথবা ভাষাযুক্ত ধর্ম-সমস্যা অবিকলই থাকে।

ঈশ্বর ভাষা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করেন, ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে, নির্ধারণ করে মানুষকে খাস-বান্দায় রূপান্তরিত করেন এবং এই নির্বাচনকে ঐতিহাসিক কাজ বলে আত্মতুষ্ট থাকেন—মানুষ এবং দল (গোষ্ঠী) বাছাইয়ের কাজটি লক্ষ করবার বিষয়—মানুষের বিভাজিত রূপটিই আধুনিক উপন্যাসের উপযুক্ত। আদিপুস্তকে মানুষের যে ভাজক-প্রবৃত্তি তা আজ অবধি কোথাও বদলায়নি। ভাজকতার আদি গল্পটি নোহের জাহাজ তৈরির গল্প ; কারণ তিনি তাঁর বিভাজিত বোধ থেকে নিজের সন্তানকেও পরিত্যাগ করেন, জাহাজে সেই সন্তানের জায়গা হয়নি।

এই ভাজক-প্রবৃত্তিই কি মানুষের নিয়ন্তা ? এই-ই কি তার আদি ও অসমাপ্ত ট্র্যাজেডি ? মানুষের কোনও সার্থকতা বা সুপরিণাম এই ভাজক-বৃত্তির দংশ থেকে মুক্তি পায়নি , মানুষ দংশিত হতে হতে প্রেম এবং মৃত্যুকেও অতিক্রম করে—সার্থকতা হল একটি নিঃসঙ্গ মূর্তি, যে কিনা প্রেম এবং মৃত্যুকে কখন পেরিয়ে চলে গেছে আমরা জানি না, মানুষ মূর্তি হয়ে না উঠলে কাজ শুরু করতে পারে না। কারণ মানুষের ভাজক-প্রবৃত্তি তাকে তাড়া করছে মরু-ঈশ্বরের মতো, যেন তা মরুরথ, তা যে একাদশ অশ্বারোহী, যেন সে এক রহস্যময় মরু-শিবিকা।

এই সব প্রতীকী-সংকেত থেকে রাজাবলির নিজ ভাষা গঠিত হতে চেয়েছে বলে এই ভাষা এতখানি দিব্যতা-স্পৃষ্ট। প্রতীক-সারকে ধরাই এ ভাষার অভিপ্রায়। ভাষার অন্তর থেকে প্রতীক এবং প্রতীকের অন্তর থেকে ভাষা এই এক উপন্যাস-ভাষার নিহিত তত্ত্ব। এ উপন্যাসের কাহিনী প্রতীক-বাহিত অর্থাৎ পুরাণ-প্রতীকী, এ কথা পাঠককে বলে দেওয়া সমীচীন। কারণ ভাষার প্রথম বর্ণমালাটি (আলিফ) ঈশ্বরের প্রতীক। তা যতখানি ঈশ্বর, ততখানিই মানুষ। আবার এই 'আলিফ' লাঠির মতো দণ্ডায়মান, যেমন আব্রাহামের হস্তধৃত লাঠিটি—উপন্যাসে ব্যবহৃত অক্ষর-প্রতীক ভাষাবর্ণমালার প্রাথমিক ইতিহাসকে ধরেই এগিয়েছে। অক্ষর-প্রতীকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, কেননা তিনি ভাষা দিয়ে মানুষকে ভাগ করেছেন। সমস্ত উপন্যাসটি ঈশ্বর ও মানুষের ভাজক-বৃত্তির দ্বারা বিক্ষত।

বিক্ষত এর নায়ক। কারণ এই বিভাজনবাদের অভ্যন্তরে তিনি নিক্ষিপ্ত। সেই বিচারে শলোমন আজকের মানুষও বটে। তাঁর রাজসত্তার সঙ্গে নবিসত্তার বিরোধ আমার বিচারে ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য ছিল। কারণ প্রচলিত লোক-পুরাণে তাঁর রাজসত্তার সার্থকতা নবিসত্তার মধ্যে খোঁজা হয়েছে। নবিরা কেন রাজা হয়ে উঠবেন আমার দাদিমায়ের কথকতায় সে প্রসঙ্গ ছিল। দাদিমা বলতেন, রাজা সুলেমান (শলোমন) যত বড় রাজা, তত বড় নবি। ছেলেবেলায় শুনে মনে হত, রাজার মহত্ত্বের সঙ্গে নবির মহত্ত্ব সমানুপাতে একাধারে সম্মিলিত হয়েছে, এ অসম্ভব নয়, বরং তাইই স্বাভাবিক। লোকগল্পে যা দ্বন্দ্বহীন, ইতিহাসে তাইই দ্বন্দ্ববিদীর্ণ—ইতিহাসের দিকে চাইলে শলোমনকে দ্বিধাহীন এক মাত্রিক টাইপ করা কি সম্ভব ? প্রত্যেক প্রাচীন জাতি তাদের নিজেদের জন্য মরুভূমিতে একজন উপযুক্ত রাজার অনুসন্ধান করেছে। কারণ তারা তাদের ঈশ্বরভূমিকে দখলীকৃত 'দেশ'রূপে গণ্য করতে চেয়েছে। ঈশ্বরের জন্য দেশ দখল কর এবং তার জন্য রাজা বানাও। আজও মানুষ মাটি দখল করতে পারলে ঈশ্বর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চিন্ত হয়। তাছাড়া আধুনিক রাজনৈতিক ধর্মীয় মৌলবাদ

যেকোনও দেশকে ঈশ্বরের দেশে পরিণত করতে চায়। সেই কারণে আদিপুস্তকের ঈশ্বরও একজন রাজনৈতিক ঈশ্বর।

ধর্মের রাজনৈতিক সদাপ্রভু-ঈশ্বর মানুষের ইতিহাসের নিয়ন্তা। ধর্ম-রাজীনীতি-ইতিহাস সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গি দিব্যতন্ত্রের যুগে ছিল এক নবগঠিত দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির স্রষ্টা আদিপুস্তক। আদিপুস্তকই সেই পুস্তক যে কিনা প্রথম ধর্ম-রাজনীতি এবং ইতিহাসকে এক মর্ত্য-মরুতে মাখামাখি করেছে। ইতিহাস সম্বন্ধে এই সচেতনতা ধর্ম এবং রাজনীতির নতুন অধ্যায়ের সূচক। এই অধ্যায়ের ভিতরেই দিব্যতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের সমন্বয় এবং বিরোধ দেখা দেয়।

দিব্যতন্ত্রে রাজার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রাজার দিব্যতন্ত্র প্রয়োজন। ঈশ্বর যখন মানুষের রূপ ধরে পৃথিবী শাসন করতে আসতেন তখন ছিল দিব্যতন্ত্রের যুগ। প্রাচীন কালে মিশরের রাজারা ছিলেন আসলে দেবতা। অর্ধেক মানুষ অর্ধেক দেবতা। পৃথিবী শাসন করে তাঁরা শেষে দিব্যবস্ত্র পরে স্বর্গে ফিরে যেতেন। উপন্যাসে লোক-পুরাণ অনুযায়ী আমি কাবুস বলে উল্লেখ করেছি এই রাজাদের। ঐতিহাসিকরা এঁদের রামাসিস বলেছেন, আদিপুস্তকে এরা ফরৌন। আমার উপন্যাস শুধু সাহেবদের লিখিত ইতিহাস ভিত্তিক নয়, নয় পুরোপুরি আদিপুস্তক ভিত্তিক, এতে রয়েছে লৌকিক পুরানেরও ব্যবহার। ফলে উপন্যাসের পক্ষে সঙ্গত এই মিশ্রণ পাঠকদের একটি নতুন অভিজ্ঞতার সামনে এনে ফেলে। তাঁরা আমারই মতো অনুভব করবেন, আদিপুস্তকের রাজকাহিনীর মানবিক দ্বন্দ্বগুলি এ যুগেও নতুন করে আবিষ্কার করা যায়। এই দ্বন্দ্বের বীজ দিব্যতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের সংঘাত থেকে উদ্গত। দিব্যতন্ত্র থেকে নবির জন্ম বা উদ্গাম, রাজতন্ত্র থেকে রাজার উত্থান। এখানে রাজা কিন্তু দেবতা নন, তিনি আসলে মানুষ।

শলোমন দেবতা ছিলেন না। তিনি প্রথমে রাজা, তারপর নবি। বাংলার লোক-পুরাণে শলোমনের এই দ্বৈতসত্তাকে একাধারে বিলীন করা গেলেও আমরা পারিনি। কারণ শলোমনের হাতের অস্ত্রগুলি কখনও দিব্যাস্ত্র ছিল না, তা ছিল লোহার তৈরি। কারণ তাঁর যুগেই লোহা আবিষ্কার করেছে মানুষ। যাঁরা মরুভূমিতে প্রথম লোহা বানায় তারা আদিপুস্তকের অতি গৌণ চরিত্র কিন্তু ইতিহাসের চোখে তারা সম্মানিত। শলোমনের মা বৎসেবা এই জাতির মেয়ে। ধর্মের রাজনৈতিক ঈশ্বর এই জাতি (হিটাইট)-কে ইতিহাস গড়ার কাজে নির্বাচন না করলেও উপন্যাস এদের গুরুত্ব দিয়েছে। গুরুত্ব দিয়েছেন শলোমন। লোহার আবিষ্কর্তা এবং ঘোড়ার প্রথম ব্যবহারকারী হিটাইটের সঙ্গে শলোমনের পূর্ব-পুরুষদের সংসর্গ অতি প্রাচীন। সংসর্গে এলে সংঘাতও বাধে। উপন্যাসে বেধেছে। ধর্মের রাজনৈতিক ঈশ্বর যে জাতিকে ইতিহাসের পথ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন, সেই জাতিদের গ্রহণ করেছে উপন্যাস। আদিপুস্তকের উপেক্ষিত জাতিরা রাজাবলিতে উপেক্ষিত হয়নি। কারণ তারাও ইতিহাসেরই অন্তর্গত। এক লোক-পুরাণ যে-চরিত্রকে সমাদর দেয়নি, পরবর্তীকালের ভিন্ন পুরাণ তাঁকেই করেছে ইতিহাসের মুখ্য নায়ক। উপন্যাসে ইশ্মায়েল তেমনই একটি চরিত্র। আদিপুস্তকে তিনি অবহেলিত, বিতাড়িত, ম্লান। কুরানে এবং ইসলামীয় মৌখিক-পুরাণে তিনিই বিদীর্ণ-সত্তা প্রাচীনতম প্রধান। আদিপুস্তকে তিনি যেরূপ এবং কুরানে এসে তিনি যেরূপ হয়েছে তা উপন্যাসের

বিচারে একটি মানবিক দ্বন্দ্বের কারণ, যে-দ্বন্দ্ব আধুনিক মানুষের পক্ষেই আবিষ্কার-যোগ্য বলে আমি মনে করি। উপন্যাসের 'উৎসর্গ'-অধ্যায় সেই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি, এই দ্বন্দ্বের দিশা অন্যত্র মিলবে না। আদিপুস্তকের আত্মসাৎ-বুদ্ধি এবং কুরানের আত্মোদ্ঘাটন-মহিমা যাইই হোক, ইশ্মায়েল এবং আব্রাহাম সেই সমূহ-পুরাণ-বৃত্তের বাইরেও রক্তমাংসের অস্তিত্ব। দিব্যতন্ত্রীদের সকল আকাঙ্ক্ষাকে রাজাবলি পরীক্ষা করতে চেয়েছে। এবং শলোমন চেয়েছেন পরীক্ষা দিতে। তাঁর রাজসত্তা এবং নবিসত্তার দ্বন্দ্ব তাঁরই পক্ষে হৃদয়-বিদারক হয়েছে, যদিও এই হৃদয়কে দিব্যবলে হোক, মনুষ্য-চেনতা থেকেই হোক, মরুবিশ্বে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন তিনি।

আদিপুস্তক যুদ্ধ-যাত্রার কাহিনী, জ্ঞাতি-নিধনের উপাখ্যান। সেই রক্তাক্ত ইতিহাসের বুকে হৃদয় লোহার মতো নবীন সম্পদ, সেই হৃদয়কে আমরা পশুবধ্য, শিশুবধ্য মরুতে স্থাপন করতে চেয়ে কী দেখলাম তাইই রাজাবলির নিজ-ভাষায় লিখিত হয়েছে।

শিশুবধ আদিপুস্তকের একটি মুখ্য বিষয়। ইশ্মায়েলের কাহিনী দাদিমায়ের মুখে শৈশবে শুনেছিলাম কিন্তু আদিপুস্তক অন্যরকম বলেছে। সেখানে গোষ্ঠীপিতা আব্রাহাম তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ইসহাক (আইজাক)-কে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেন—কারণ উৎসর্গের সম্মান দাসীপুত্র ইশ্মায়েল পেতে পারেন না। আদিপুস্তক যে সম্মান ইশ্মায়েলকে দেয়নি, তা কুরান কোন্ বিচারে দিয়েছে?

আদিপুস্তকের সঙ্গে কুরানের আন্তঃসংযোগ এবং আন্তঃবিরোধ 'উৎসর্গ' নামের অধ্যায়টি রচিত করে তুলেছে। মনে রাখতে হবে, ইসলাম ধর্মের প্রধান একটি স্তম্ভ কুরবানি অর্থাৎ আত্মত্যাগ, বলিদান বা 'উৎসর্গ'। হজরত মুহম্মদের জন্মের চার হাজার বৎসর আগে নবি ইশ্মায়েল জন্মেছিলেন। চার হাজার বৎসর সময়, সময় হিসেবে খুব স্বল্প মনে করার কারণ নেই। শলোমনের রাজত্বকাল উপন্যাসের প্রত্যক্ষ সময় হলেও আদি নবি নোহ (নুহ্ নবি) থেকে উপন্যাস তামাম সময়কে স্পর্শ করতে চেয়েছে। যিশুর জন্মের সাড়ে নয় শত বৎসর আগের সময় উপন্যাসের গৃহীত প্রত্যক্ষ সময়, কিন্তু 'উৎসর্গ'-অধ্যায়টি বিবেচনা করলে ইশ্মায়েলের সময়কেও গোচরে আনতে হবে। হজরত মুহম্মদ তাঁর ধর্মের একজন প্রধান-পুরুষ হিসাবে তাঁরই জন্মের তিন-সাড়ে-তিন চার হাজার বৎসর আগের ইশ্মায়েলকে নির্বাচন করলেন কেন?

ইশ্মায়েলের জীবন-কথা তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন ইতিহাসের যুক্তিতে তার একটি বিচার আছে। সকলেই স্বীকার করবেন, প্রথমে কুরানের কোনও লিখিত রূপ ছিল না। কুরানের আয়াতগুলি লোকমুখে প্রচলিত ছিল। সেই বিচারে কুরানকে শ্রুতি বলা যায়। বলাবাহুল্য আদিপুস্তকও শ্রুতি এবং তা কুরানের চেয়ে পুরানো। আদিপুস্তকের সঙ্গে কুরানের শ্রেষ্ঠ সংযোগ এবং অনমনীয় বিরোধ ঘটেছে ইশ্মায়েল নামের একশি শিশু-কিশোরকে কেন্দ্র করে। সংযোগ এবং বিরোধের এমন দৃষ্টান্ত পুরাণ-ইতিহাসে কমই দেখা যায়। ইশ্মায়েল-কথা হজরত মুহম্মদ পান শ্রুতি থেকে। অথবা তাঁর খোদা তাঁকে এ কথা বলেছেন।

পুণ্য-সঞ্চয় ছাড়াও আদিপুস্তক পাঠের নির্ভেজাল ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আদিপুস্তক ইশ্মায়েলের রূপবর্ণনার জন্য একটি মাত্র পংক্তি খরচ করেছে।

আদিপুস্তক বলেছে, ইশ্মায়েল ছিলেন গর্দভ-মনুষ্য, গাধার মতো। গাধার মতো বলশালী এবং একগুঁয়ে, নিশ্চয় তাঁর আকৃতিতেও গাধার ছাপ ছিল। বিশেষ করে তাঁর কান দু'টির কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা গাধার সঙ্গে ঈষৎ মেলে। ইশ্মায়েল অর্থ ঈশ্বরের কান। সেই কানে তিনি ভবিষ্যতে রাজ-কুণ্ডল পরবেন বলে আভাস দেয় আদি পুস্তক। কিন্তু তিনি কিভাবে রাজা হয়েছিলেন, কেমন রাজা, সেই কাহিনী অবর্ণিত রেখে দেয়। তাঁকে এবং তাঁর মাকে কঠিন উপেক্ষা করেছে ইহুদি-গ্রন্থ ওল্ডটেস্টামেন্ট। তাঁকেই সাগ্রহে মরু-বালুকা থেকে চার হাজার বৎসর পর তুলে নিয়ে ইসলামের স্বর্ণকুণ্ডল রূপে প্রতিভাত করেন হজরত মুহম্মদ।

আদিপুস্তক যা বর্ণনা করেছে তাইই সত্য নাকি কুরান যা বলেছে তাই, আমাদের হাতে এই সত্যের মীমাংসা নেই। কুরান মান্য, কিন্তু কুরানই আদিপুস্তককে মান্য করতে বলেছে, অন্তত মাননীয় বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু আদি পুস্তকের সঙ্গে কুরানের বিরোধও সংগোপন থাকেনি। আমার অভিলাষ এই যে, এই দুই সুমহান গ্রন্থের সংযোগ এবং বিরোধকে আমি উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করেছি। কিভাবে করেছি তাইই পাঠকের উপভোগের বিষয়।

উৎসর্গের প্রাপ্য সম্মান কেন আমি ইশ্মায়েলকেই দিলাম, তার জবাব একটিই আর তা হল তিনি হতভাগ্য। এটিই এই উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ। আদিপুস্তকের সদাপ্রভু ঈশ্বর যাঁদের নির্বাচন করেননি, উপন্যাস তাঁদেরই গ্রহণ করেছে। পুরাণে যিনি উপেক্ষিত, কাব্যে তিনি উপেক্ষিত না হতেও পারেন।

আমার কোনও উপন্যাসই আমাদের চিরচেনা মাটিকে বিস্মৃত হতে পারে না। তবে আমার রচনার আরও একটি গভীর প্রবণতা রয়েছে আর তা হল, সাধারণভাবে পাঠক যাকে পরিচয়ের অযোগ্য মনে করেন তাঁর নিস্পৃহ-আলস্যে, আমি তাকেই খুঁচিয়ে তুলে আনি, খুঁড়ে খুঁড়ে মরুকূপের মতো জাগিয়ে তুলি। চার হাজার বছরের পুরনো মরুমর্ত তার পৌরাণিকতায় আমার চিরচেনা বাংলার মাটির পক্ষে কখনও পর ছিল না। মানুষ পুরাণবদ্ধ জীবন, নতুন মানুষের কাছেও সেই পুরাণের আধুনিক বিন্যাস সম্ভব, লোকায়ত পুরাণের চিরজীবিতা আমার চেনা মাটিকেই আরব মরুভূমি অবধি প্রসারিত করে দেয়। আমি নাস্তিক কিন্তু কোনও ভাবেই ধর্ম-বিদ্বেষী নই। যে-কোনও ধর্মেরই আমার কাছে নিজস্ব পোষকতা আছে। উগ্র নাস্তিকদের পক্ষে আমার এই মনোভাব গ্রহণ করা কঠিন। ধর্ম শুধু কোনও আধ্যাত্মিক বিষয় নয়, তা মানুষের এক মস্ত ইতিহাস। আমি আমার অস্তিত্বকে কতভাবে পরীক্ষা করেছি, প্রতিটি উপন্যাসই সেই পরীক্ষা। আমাদের দৃষ্টি পুরাণচক্ষু থেকে নির্গত হয়ে লোক-কল্পনার বিক্ষিপ্ত অন্ধকার বাতাসে আলো আর বৃষ্টির মতো বেঁকে বেঁকে মাটিতে পড়ে চলেছে, আধুনিক মানুষের চোখও কিংবদন্তি খোঁজে, মালা দেওয়ার জন্য তারও মূর্তি প্রয়োজন। মিথ ছাড়া মানুষ হয় না।

মিথ (Myth) কথাটি আমরা বাংলার মতো ব্যবহার করি। তাই বলছি সাধারণ মানুষ মিথচক্ষু, এমনকি অসামান্য যিনি তিনিও। মিথের বিভা দিব্যতা মাত্র, কিন্তু মিথের মাংস বাস্তব। নায়িকা আনাথ শলোমনের চোখে মিথের লাবণ্য ; কারণ সে একাধারে যুদ্ধ আর প্রেমের দেবী। আনাথের চোখে শলোমনের পা মিথ প্রোথিত, চোখ মিথের মণিকা। তাই শলোমনের দেহকে পেয়েও পায় না আনাথ,'না পেয়েও

পেয়ে যায় তার শরীরেরই অভ্যন্তরে, স্পন্দিত সত্তায়। মিথ ক্রমাগত বাস্তবকেই বিকিরণ করে, সত্যি বলতে কি কুরবানির ঈদে আমরা কি ইশ্মায়েলের মাংসকেই ভক্ষণ করি না ? কারও আপত্তি থাকলে, আইজাককেই নিশ্চয়ই খাই আমরা !

উটকে নবির বদলে ভক্ষণ করে মানুষ। মরুভূমিতে উটের গুরুত্ব অপরিসীম। উটকে হজরত মুহম্মদের পূর্ববর্তী অতীতে মানুষ পূজাও করত। আমি কুরান-হাদিস ও মৌখি লোকপুরাণ থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেছি। কোনও প্রতীচ্যের সাহেবের লিখিত সুলভ-গ্রন্থে এমন তথ্য পাওয়া যায় কিনা জানা নেই। হজরত মুহম্মদ তাঁর নির্দেশাত্মক উপদেশাবলী হাদিসে নারীদের উটপূজা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। উটের পিঠে হলেও স্বামীর কাম-নিবৃত্তি করা নারীর কর্তব্য বলে হজরত মুহম্মদই নির্দেশ করেন। হাদিস পড়ার ফলেই সাহিত্যে উটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হই—মহানবির নির্দেশ কতখানি নারীবাদ বিরোধী তা দেখানোর কোনও অভিপ্রায় আমার ছিল না। আমি অত সতর্ক লেখক নই যে, উটের সমগ্রতা না বুঝে কবিতা ফাঁদিয়ে বসব। 'মরুস্বর্গ' প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা ভাষায় নারীবাদীরা উট নিয়ে কবিতা লিখলেন, কিন্তু কোথা থেকে উটের পূজা বা উটপৃষ্ঠে সঙ্গমের কথা কবিতায় এল, তাঁরা সেকথা স্বীকার করলেন না ; এই কারণে যে, তাঁরা ধরেই নিয়েছেন সাহেবের গ্রন্থেই নিশ্চয় উটের সর্বাচার সম্বন্ধে বিশদ উল্লেখ রয়েছে। স্বয়ং ইশ্মায়েলকেই যদি আদিপুস্তক চেপে দিয়ে থাকে, বাঙালির কবিতাই বা আমাকে চেপে দিয়ে বিক্ষত করবে না কেন ?

উটের নবি ছিলেন সালেহ এ কথা লোক-পুরাণ সমর্থিত। মৃত্যুর পর পশুপালক অরামীয় যাযাবর গোষ্ঠীর মানুষ আরব মরুভূমিতে সমাধির জন্য জায়গা পেত না—সালেহ-র এই সমস্যা হয়েছিল। তারপর কী হয়েছিল তা উপন্যাসেই রয়েছে, এখানে যা বলার কথা তা হল, প্রতিটি লোক-উপকথা মরুভূমির কোনও না কোনও সংকটের নির্যাস, সেই উপকথার বাস্তব মাংস রয়েছে। আদি পুরাণের সঙ্গে ইসলামীয় পুরাণের সংযোগ কোথাও কোথাও চরম বিরোধাত্মক, সেই বিরোধ থেকে আদিপুস্তককে দেখা যেতে পারে। যেমন উটের উপস্থাপনায় আমি সেই বিরোধের সূত্র মনে রেখেছিলাম।

সাহেবদের লেখা গ্রন্থের কাছেও আমার কিছু ঋণ রয়েছে। তবে সাহেবদের গ্রন্থে যা পেয়েছিলাম তা থেকে শলোমনের আদল সরাসরি বার করে নেওয়া সম্ভব হয়নি। শলোমন সম্বন্ধে বিশদ কিছুই পাওয়া যায় না সেখানে। যা-ও বা তথ্য যতটুকু পাওয়া যায় তা শলোমন সম্বন্ধে অত্যন্ত বক্রতা প্রকাশ করে। কারণ নতুন বাইবেলে স্বয়ং যিশুই শলোমন সম্বন্ধে কিছুটা তির্যক। শলোমনের কৃতিত্ব কখনও যিশুর দ্বারা গভীরভাবে আদৃত হয়নি। শলোমনের মন্দির-চাতালে দাঁড়িয়েই যিশু শলোমনকে ঈষৎ উপেক্ষা করে শিষ্য-শাবকদের উপদেশ দিতেন।

অথচ বাংলার প্রচলিত মৌখিক লোক-পুরাণে তাঁর প্রজ্ঞার সংবেদন যুগ যুগ ধরে প্রচারিত, আদি পুস্তক তাঁর প্রজ্ঞাকে সম্মানিত করেছে বারংবার। সুবিচার কথাটিই শলোমনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, তিনি পশুপক্ষীকেও তাঁর সুবিচারের আওতায় এনেছিলেন। পশুবধ্য মরুতে এই লোককথার সম্মান ছিল।

সাহেবদের লিখিত গ্রন্থে সন্নিবেশিত মিশরীয় এবং আরব্য উপকথাকে আমি সন্তর্পণে

ব্যবহার করেছি, সাহেবদের অভিপ্রায় মান্য করিনি সর্বাংশে, কোথাও কোথাও বিরোধী-ব্যবহার অলক্ষ্য নয়। এইভাবে আদিপুস্তক পাঠের নিজস্ব অভিজ্ঞতা উপন্যাসে সঞ্চারিত করেছি।

শলোমনের ছায়ামূর্তি ও মূর্তির কল্পনা লোক-পৌরাণিক, অন্যত্র শলোমন জ্বেন পুষতেন, এটি উদ্ভট কথা, তাই বর্জিত হয়েছে, জ্বেনকে রূপকাশ্রয় দিয়ে শলোমনের অন্য এক বলবান রাজসত্তার জটিলতা এনেছি। শিশুবধ সংক্রান্ত উপকথাও দাদিমার মুখের। তবে শলোমনের রূপ বর্ণনায় মিশেছে বাংলার লোক-পুরাণের সঙ্গে সাহেবী-গ্রন্থের সংগৃহীত তথ্য, যা তাঁরা যে-কোনও সারগন বা রাজচক্রবর্তী সম্বন্ধেই প্রয়োগ করেছেন। সুলেমানী চোখ বলে এক ধরনের চোখের বর্ণনা দাদিমাই করতেন, এই চোখের সন্ধান ইংরেজিতে লেখা পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস বইতে নেই। সুলেমানী সুমিষ্ট কয়রা চোখের কথা আমার অন্য একটি ছোটগল্পে রয়েছে। নোহের কথা, তাঁর বীজ-সংরক্ষণ বৃত্তির কথা আগেও লিখেছি ছোটগল্পে। বীজ এবং জীবকে ঘিরে প্রজ্ঞার সংবেদনই সাহিত্যের মূল।

এই ভূমিকা শুধু 'রাজাবলি' সম্বন্ধেই নয়, 'মরুস্বর্গ' সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। নোহের গল্পটা নানা দেশে নানাভাবে পল্লবিত হয়েছে, আমি সেই গল্পের মুসলমানি সংযোজন, যা লোক-উপকথায় বর্ণিত, তাইই নিয়েছি, হতে পারে আরব্য উপকথাতেও তা অনুরূপ বা অন্যরূপ।

আমি কোনও নবিকে খাটো করিনি। অকারণ বৃহৎ-মহৎ-ও করিনি। কারণ আদিপুস্তক তাঁদের দোষেগুণে বিবৃত করেছে। আদিপুস্তককে উপন্যাসের ভিত্তি করার কারণই হল, এই মহান গ্রন্থটি দিব্যতন্ত্রী পয়গম্বরকে গুণান্বিত শুধু করেনি, দোষযুক্তও করেছে, তাঁদেরকে মানুষের মতো করে গড়েছে। উল্লেখিত সব নবিই আদিপুস্তকের নবি, পৃথিবীর অন্য ঈশ্বর-গ্রন্থে তাঁরা এসেছেন সেই আদিগ্রন্থের অবদান হিসাবে। সৎচিত্ত ধার্মিকই এ কথা স্বীকার করবেন, ঐতিহাসিকের কাছে আদিপুস্তক ঈশ্বরগ্রন্থ হিসাবে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহুদি-সভ্যতা ছাড়াও এ গ্রন্থ আরও বিচিত্র সভ্যতার পারস্পরিক সংঘাতের পরিণাম, অন্যান্য গ্রন্থের ফলশ্রুতি। ইতিহাসিকরা এইভাবেই দেখেছেন আদিগ্রন্থকে। অতএব উপন্যাসে গোষ্ঠীবাদী সংগ্রামটি বলাবাহুল্য আদি পুস্তকের সমর্থনেই গৃহীত। গৃহীত হলেও সেই বিবাদ-লড়াই উপন্যাসের সম্পূর্ণ নিজস্ব কায়দায় সাজানো হয়েছে। কারণ শলোমনের ভেতরের দ্বন্দ্ব আদিপুস্তকে কিছুই নেই, তাঁকে কখনও হৃদয়বাদী প্রেমিক রূপে কল্পনা করেনি ইহুদিগ্রন্থ। তাঁর দিব্যতার প্রশংসা করলেও রাজতন্ত্রী শলোমনের হৃদয়ানুসন্ধান পুরাণকারদের অভিপ্রেত ছিল না। শলোমন তাঁর রাজত্ব খুইয়েছিলেন বিভিন্ন নিষিদ্ধ জাতির নারীদের যৌন-সংসর্গ দোষে। চরিত্র-স্খলনের এই পাপ সদাপ্রভু সহ্য করতে পারেননি।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, যাঁর মা আদি দেবদেবীর পূজা করেন এবং নিষিদ্ধ জাতি, সেই মায়ের সন্তানটি কেমন হতে পারেন। শলোমনের প্রজ্ঞার একটি ঔপন্যাসিক গড়ন বার করেছি আমরা। উপন্যাসে তাঁকে আমরা পিতৃ-স্খলনের দায়ে বিক্ষত করেছি, প্রজ্ঞাবানের পক্ষে এই দ্বন্দ্বই কি স্বাভাবিক নয়? মরুভূমির বিভাজনবাদ তাঁকে নিঃসঙ্গ করেছে। তাছাড়া নিষিদ্ধ জাতির নারীমাংসের প্রতি মানুষের যৌন প্রবৃত্তি প্রবল হয়। প্রতিপক্ষকে মানুষ শুধু অসি দ্বারা বশীভূত করেই তৃপ্তি পায় না, তাদের নারীদের

যৌন-প্রহারে ছিন্ন এবং অভিভূত করে যুদ্ধের চরম আনন্দ উপভোগ করে। এই ধর্ষকামিতার অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম রূপও আছে। আছে তার নান্দনিক আদল এবং নান্দনিক তির্যকতাও। মানুষের প্রজ্ঞাই তার যৌনতা ও প্রেমকে জটিল করেছে। যৌন-প্রহারে অভিভূত নারী তার কামার্ত অশ্রুকে বিজেতার জন্যই উৎসর্গ করেছে এই মরুতে, মরুভূমি সেই অশ্রুকে শুষে গিলে নিয়েছে মাত্র। না, তারপরেও কোনওপ্রবল বাস্তব থেকে যায় মানুষের মাংসে, শোণিতে। সেই ভার সম্ভবত নারী একাই বহন করে, ইতিহাস জানতে পারে না। শলোমনের প্রেমের উপসংহার এইভাবেই টেনেছি আমরা। এই জটিলতার কারণ শলোমনের কোনটি ছায়া এবং কোনটি মূর্তি এবং কোনটি সে নিজে, উপন্যাস নির্ধারণ করতে পারেনি।

পাঠকদের একটি বাড়তি কথা এইবেলা জানিয়ে রাখি। ভিন্নতর এক কৌতূহল তাতে নিবৃত্ত হবে। হজরত মুহম্মদ লোককথা এবং কুরান অনুযায়ী ঈশ্বরের প্রথমতম প্রাণ। তাঁর আগে কিছুই সৃষ্ট হয়নি, না আকাশ, না মর্ত, না কোনও নীহারিকা, না কিছু, সপ্ত আকাশ নয়, ব্রহ্মাণ্ড নয়, চরম শূন্যতার মধ্যে বিরাজ করেছেন স্বয়ং ঈশ্বর এবং মুহম্মদ। ঠিক একই কথা নিজের সম্পর্কে বলেছেন শলোমন। তিনি সৃষ্টির আদিতে একমাত্র প্রাণ যিনি শিশুরূপে খোদার কোলে খেলা করতেন। ব্যাখ্যা করব না আর, শলোমনের সঙ্গে হজরত মুহম্মদের উপলব্ধির এই সমতার কথা উল্লেখ করলাম মাত্র। এ থেকে কুরানের সঙ্গে আদিপুস্তকের আন্তঃসংযোগের বিষয়টি পাঠকের কাছে আরও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে।

কোনও শাস্ত্রই হজরত মুহম্মদ চরিত্রের কণামাত্র স্খলন বরদাস্ত করে না, আমার বিচারে তাই তাঁকে অবলম্বন করে কখনও কোনও উপন্যাস রচিত হতে পারে না, অন্তত ভারতবর্ষে বসে সম্ভব নয়। পাঠককে স্পষ্ট বলে রাখি, একজন আধুনিক লেখক যদি কোনও চরিত্রকে স্পর্শ করার কোনও হেতুই না পান এবং সেই প্রবল চরিত্রকে স্পর্শমাত্রই লেখকের জন্য মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা জারি করে রাষ্ট্র, তাহলে বুঝতে হবে, সেই মহৎ চরিত্র শাস্ত্রমূলেই একদিন শুকিয়ে যাবে। শাস্ত্র বলশালী, কিন্তু সাহিত্য দুর্বল নয়, আধুনিক রুচির কাছে সাহিত্য কখনও কখনও শাস্ত্র অপেক্ষা গ্রাহ্য। শুনতে কারও পক্ষে মন্দ হলেও, এ সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক হস্তক্ষেপে শাস্ত্র ম্লান হয়নি, তিনি তাঁর আধুনিক যুক্তির সঙ্গে শাস্ত্রকে গেঁথে তুলেছিলেন, তিনি যেভাবে কৃষ্ণসার গ্রহণ করেন, আমরা মহানবিকে সেভাবে স্পর্শ করারও অধিকারী নই।

ফের বলে রাখি, আদিপুস্তকের সঙ্গে কুরাণের আন্তঃসংযোগ লক্ষ করা অপরাধ নয়, কারণ তা এক শ্রেষ্ঠ সংযোগ। বাঙালি মুসলমান অত্যন্ত স্পর্শকাতর প্রাণী, তাঁরা কুরান এবং মুহম্মদ শোনা মাত্রই শিউরে ওঠেন। তাঁদের ভরসা দিই, আমি দুই মহান গ্রন্থের ঐক্য এবং বিরোধ দেখেছি উপন্যাসের খাতিরে, কোরানকে কোথাও ব্যবহার করিনি, হজরত মুহম্মদ এই গ্রন্থের ত্রিসীমার মধ্যে নেই। কারণ মহানবি মুহম্মদের জন্মের চার-হাজার বৎসর পশ্চাতে চলে গেছি আমি। 'আদিপুস্তক' মুসলমানের মান্য কিন্তু অমান্যও বটে, তাছাড়া এই পুস্তক বিশ্বমানবের সম্পত্তি, একা কারও নয়।

মহাবিশ্বের প্রথমতম প্রাণ কে? শলোমান নাকি মুহম্মদ—মীমাংসা জানা নেই। আদিপুস্তক কিন্তু শলোমনকেও স্খলিত করেন, তিনিও অভিশপ্ত। অভিশপ্ত মানুষই আধুনিক উপন্যাসের যোগ্য। তাই এই উপন্যাসের নায়ক শলোমন (সুলেমান নবি

নায়ক নন এ উপন্যাসে)। দুর্ভাগ্যজনক এ কথা যে, ধর্মের রাজনৈতিক ঈশ্বরই শেষ অবধি এই উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ এবং সীমাবদ্ধ করেছেন।

মরুভূমিকে আমি সুর-অসুরে বিভক্ত করতে পেরেছি, এ কারণে বহুদেববাদী ধর্মের সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সেই মরুভূমির আদি-পুরাণের উদ্দেশে, যার বয়ানে দেবতাও দোষেগুণে চিত্রিত। এ ভূমিকা মাত্র, সব কথার স্পষ্টতা-বিধান এখানে বাঞ্ছিত নয়। ইতি—

লেখক

১. ডাক-হরিণ

বলা হয়, এল্‌-ইলোহে-ইস্রায়েল। অন্যভাবে লেখা যায়, এল্‌-এলোহি-ইস্রায়েল। আবার অন্যতর করা, অতএব, ইতিহাসেই ধরে। পাঠক ধৈর্য ধরুন, আমি কোনও জট-জটিল- দুর্বোধ্য কাহিনী গাইব না। আমার ভাষা পুরাণসম্মত এবং মিশ্র এবং পুরাণে-ইতিহাসে গলাগলি। ভাষা ঘুমিয়ে থাকে, তাকে জাগালে কৌম-ঈশ্বর জাগেন, মরুমর্ত দেখা যায় চোখে, মরুবিস্ময় নীল নদীতে ঢেউ ভাঙিয়া যায়, উথলায় মরিচা-নদী যর্দন, মহানদী ফোরাতে নরম রোদ পড়িয়া জলছবি হইয়া যায়।

সাধু ও ইতর ভাষার বিবাদভঞ্জন করুন এল্‌। ভাষা দিয়া ভাগ করুন এলোহি তথা এলাহি। ভাগ করুন বাবিলকে। মানুষকে বিভক্ত করুন দয়াময়। বাবিল (বাবিলন) অর্থ ভেদ এবং এলাহি মানুষকে ভাষা দিয়া বিচ্ছিন্ন করলেন। অর্থাৎ ভাষাভেদ করলেন হেথা। বাবিলন হল ভাষাক্ষেত্র এবং ভেঙে পড়া মিনারের প্রত্নগরী, কিন্তু এক্ষণে সে কথা থাউক। আমি এল্‌ হইতে উপাখ্যান উদ্গত করিব।

আমিই কেন করিব, প্রথমে বলি। আমি আবু-উল বাশার। বাশার মানে মানুষ কিন্তু আবু অর্থ পিতা। উল্‌ হল বিভক্তি, ইংরেজি OF অর্থাৎ র অথবা এর। তার মানে মানুষ-এর পিতা। মানুষের পিতা কে?

আদম। এক্ষণে এক আদম এই কাহিনীর কথাকলি ফুটাইবেন, নাচ নয়, কথা কহিবেন, বিবৃতি শুনাইবেন।

এল্‌-কে কোথা পাব? কিরূপে দেখবেন আদম? বর্ণমালার দৃষ্টে দেখলে ইহা মরুতে পোঁতা লাঠির মতো। যেমন কিনা মোজেশ বা মোশি বা মুশার হাতে লাঠি ছিল একখানি। যদ্বারা অলৌকিক কাণ্ড হইত। যাকে আষা বলতে পার। নানান মোজেজা (যাদু) দেখানোর লাঠি।

মোশির পূর্বে চাহিয়া দেখো। লাঠিটি মাটিতে প্রথম পুঁতেছিলেন আব্রাহাম। না, আব্রাহাম তখন তিনি হন নাই, তখন তিনি অব্রাম অর্থাৎ অব্রাহ্মণ অর্থাৎ বেদুইন অর্থাৎ বেদে এবং শুধুমাত্র গোষ্ঠীপিতা, মোড়ল। যদিও অব্রাম প্রথমাবধি দিব্যতন্ত্রী, ব্রহ্মবাদী। যাকগে, আগে বলি, তিনিই প্রথম ভূমরুতে লাঠিটা পোঁতেন। লাঠি পোঁতার অভিপ্রায় হল, এই মাটিটুকু আমার। লাঠি পুঁতলেই কি মাটি হয়?

হয় না। তবে কিভাবে হয়? লাঠি তো পুঁততেই হবে, তাঁবু ফেলতে হবে, গুলিবাঁট করতে হবে জমির। তারপর...

এই লাঠিটাই মানুষের প্রথম অক্ষর। এল্‌ বা আলিফ বা আলফা। কেননা আলিফ অর্থ ষাঁড়। এল-এর অন্যতম অর্থও কিন্তু ষাঁড়। বা বৃষদেব। বা বালদেব। আদম

বলিতেছেন, এল্ না হইলে আল্লা হইত না।

গল্পের পূর্বাহ্ণে মরুবৃক্ষ এলার তলে অব্রাম লাঠি পুঁতেছিলেন, তাঁবু ফেলেছিলেন। বৃক্ষ এলা এল্-অধ্যুষিত ছিল। এলাতলে আগুন জ্বলিত। হোমাগ্নি ফুটিত, লাঠি পুঁতিয়া মরুবাসী বালদেবকে ভোগ খাওয়াইত ; আশেরা বা কালিকা দেবীর অর্চনা করিত। কালিকা ঝড়বৃষ্টি ঘটাইত।

অব্রাম এসেছিলেন ফোরাত নদীর তলদেশ থেকে। ইউফ্রেতিস নদীকে আদিপুস্তক ফোরাত কহে। ইউফ্রেতিসের একটি ভাইনদী আছে। তাইগ্রিস। এই জোড়া নদী বয়ে আসতে আসতে তলে নেমে পারসী সাগরে পড়বার আগে গলা জড়াজড়ি করেছে। এই মিলনস্থলের কাছাকাছি ছিল পুরনো উর নগর। এখানে জন্মেছিলেন অব্রাম। তাঁকে ছিন্নমূল করে রাজা নিম্রোদ।

নিম্রোদ আগুনের পুজোটুজো করত। তার এক চেলা ছিল ইবলিস। ওই ইবলিস ছিল হাপর-টানা কর্মকার, হাপরের আগুন ছিল অনির্বাণ। এত বদ প্রবৃত্তি তার যে, অব্রামকে পুড়িয়ে মারার জন্য নিম্রোদকে মতলব দিয়েছিল শয়তানটা। অব্রাম তখন লাঠি হাতে তার পশুপাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। রাস্তাটা ছিল ফোরাতের কূলে কূলে। নদী ধরে তিনি এগিয়ে যান উত্তর দিকে। বেরিয়ে পড়ার সময় তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন ভাইপো লোতকে। লোট বা লোত ছিলেন আমাদের গল্পের একজন দামি লোক।

লোত ছিলেন অব্রামের অংশী, সাদাসিদে কিন্তু অভিশপ্ত। সে কথায় আসব আমরা। আগে বলে নিই, অব্রাম ফোরাত নদীতীরে কিছুকাল ছিলেন। তাঁর পশুপাল, ভাইপোর পশুগণ এবং লাঠি— এ ছাড়া ছিল তাঁবু। আলিফ তথা এল্ অর্থ কৃষকচিহ্ন ষাঁড়, তাঁরও হয়তো ছিল, কিন্তু ছিল না কালো রঙের মাটির অধিকার। মরুভূমির অনেক রঙ। প্রধান রঙ দুটি। কালো আর লাল। কালো মরু শস্যপ্রধান, লাল মরু উষর। অব্রাম চাইছিলেন, কালো মরুতে আলিফ পুঁতে বে (beth)-র প্রতিষ্ঠা। বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর বে অর্থাৎ বিটা অর্থাৎ B. এক্ষণে বলি, beth বা বেথ অর্থাৎ বাড়ি। কোথায় বাড়ি ? তাঁর তো কেবলই তাঁবু। অবশ্য তখনকার বাড়িগুলি ছিল তাঁবুরই মতো দেখতে। ছবি থেকেই অক্ষর বা বর্ণ তার আকৃতি ধরেছে। অব্রামের বে ছিল না, ছিল পশুদল, সঙ্গী ভাইপো, হাতে লাঠি, পাশে নদী, সম্মুখে পাহাড় আর সুন্দরী স্ত্রী সারি। তাঁর তৃতীয় অক্ষরটি তে বা জি। জিমেল বা ক্যামেল বা উট। তাঁর লাঠি আর উট ছিল কিন্তু বাড়ি ছিল না। তিন-অক্ষরী এই গল্পটা পরে বহু-অক্ষরী হবে।

আদম বললেন, আমি অব্রামকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং দুর্জ্ঞেয় এবং কিছুটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির দেখেছি। তাঁর পথকে করেছিলাম আধভাঙা চাঁদের মতো অর্ধগোলাকার। তাঁর চোখে দিয়েছিলাম কালো মাটির স্বপ্ন। তাঁর মনে দিয়েছিলাম মধু আর দুধের লোভার্ত প্রলোভন। ইলোহে তাঁকে স্বপ্নদ্রষ্টা করেছিলেন। মনে রেখো, স্বপ্ন দেখে সেটার অর্থ করতে পারা পুরাযুগের একটি ক্ষমতা ও কৌশল। এ যাঁর ছিল না, তিনি কী করে মরুতে আধিপত্য করবেন, এলাবৃক্ষতলে কী করে পুঁতবেন তাঁর আষা ?

এক ধরনের স্বপ্নবিৎরাই নবি হয়েছিলেন। সেদিন তাঁদের স্বপ্নের মধ্যেই ছিল আগামি দিনের ইঙ্গিত। উচ্চকোটির স্বপ্নবিদ্ ছিলেন নোহ। নোহ ছিলেন মিশ্রীয়

(মিসরীয়) নৌ-কারিগর, চমৎকার নির্বাচক, পরিত্রাতা এবং সংরক্ষক। সর্বোপরি স্বপ্নবিদ্। তিনি দেখেছিলেন, নীল নদীর আকাশচুম্বী জলোচ্ছ্বাস। তিনি দেখেছিলেন মহাগ্রীষ্মে অতি শুষ্ক দিবসে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন ; স্বপ্নার্থটি তাঁরই কেবল জানা ছিল। মহাপ্লাবনের সংবাদ বয়ে এনেছিল তাঁর স্বপ্নের ভাষারা। তখন তিনি মরুভূমির এরস বৃক্ষ দ্বারা অথবা মরুদেবদার দ্বারা জাহাজ বানাইলেন। যখন তিনি জাহাজ গড়েন তখনও তিনি কারিগর। কিন্তু যখন তিনি সেই জাহাজে ঢুকাইবার জন্য বীজ আর জীবদের বাছতে শুরু করলেন তখন থেকেই তাঁর মধ্যে দিব্যতা দেখা দিল। কাকে তিনি নেবেন আর কাকে তিনি নেবেন না। অর্থাৎ কাকে তিনি রাখবেন এবং কাকে ফেলে দেবেন। কোন্ জীব ও বীজের পরিত্রাণ করবেন তিনি— কোনগুলি বিনষ্ট হবে।

নির্বাচন, ত্রাণ এবং সংরক্ষণ— এই তিন নীতিই ইতিহাস রচেছে। আদম বললেন, কিন্তু যাদের ফেলে দেওয়া হল, নেওয়া হল না, তারাও কি থাকে না ইতিহাসে ? আব্রাহাম তাঁর ভাইপো লোতকে মরুভূমে ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর ?

এসো গল্পটা ঠিক এখান থেকেই শুরু করি। নোহ্ তাঁর এক সন্তানকে তাঁর কাঠের জাহাজে নেননি, জাহাজ ছেড়ে গিয়েছিল এবং অভিশাপ দিয়েছিলেন অবিশ্বাসী পুত্রকে। সেই পুত্র, যে কিনা পিতার স্বপ্ন বিশ্বাস করেনি। মানুষের মাংসেই গেঁথে আছে সেই নিয়ম, তোমার স্বপ্ন যে বিশ্বাস করে না, তাকে ফেলে দাও, মারো, তাড়াও, হত্যা কর।

ইতিহাস রক্তাক্ত, তোমারই পুত্র, পুত্রজ্ঞাতি, তোমারই অংশীর রক্তে। যে এল না, সে কদর্য, ঘৃণ্য। যে এল না, সে আক্রমণীয়, সে শত্রু।

আদম বললেন, আব্রাহাম লেবানন পাহাড়ের গা-ঘেঁষে এগিয়ে চললেন ফোরাতের তীর ছেড়ে। চললেন কোথায় ? নিম্রোদ তাঁকে পিছন থেকে তাড়া করেছিল। তাড়া খেয়েছেন স্বপ্নদর্শী আব্রাহাম। একই রকম তাড়া খেয়েছেন পরবর্তীকালে মোশি। পিছন থেকে তেড়ে এসেছিল ফরৌন বা রাজা কাবুস বা রামাসিসের সৈন্যদল, এসেছিল, শোনা যায়, লোহিত সাগর বা লাল দরিয়ার তীর অবধি। এই ছিন্নমূল, তাড়াখাওয়া মানুষের হাতেই ইতিহাস তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরাই জ্ঞাতিমাংসকে বিদ্ধ করেছে তীর দিয়ে, খড়্গ দ্বারা ছিন্ন করেছে তাদের, যারা স্বপ্নকে সত্য মনে করেনি।

এই রকমই একজন ছিলেন লোত, ছিলেন এষৌ বা ইদোম, ছিলেন ইশ্মায়েল। এঁরা কারা ? এসো, গল্পটা শুরু করা যাক।

গল্পের জন্য আমরা আব্রাহামের তাড়া খেয়ে ফেরা ভূভাগ স্থাপিত করি সামনে। দেখি, কোথা দিয়ে তিনি কোথায় চলেছেন ?

ঠিক এই জায়গাটায়, এই এলাতলে প্রথম তাঁবু পড়ে। এই স্থান কূপ দ্বারা, গাছ দ্বারা চিহ্নিত। এখানে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লেন সম্রাট শলোমন। কেউ নেই এই সুনসান অপরাহ্নে, এই কূপস্থলীর ধারে। কেউ বুঝতেও পারছে না, অশ্বচালিত সম্রাট একা একা এখানে কী করছেন !

কেনানের সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাজচক্রবর্তী সারগন (রাজা) শলোমনকে গল্পের জন নির্বাচিত করলেন আদম। লোকে বলে, এই প্রথম মরুভূমিতে এমন একজনকে

পাওয়া গেল যিনি ইলোহের কাছে স্বপ্নেও কোনও অধিকার দাবি করেননি, আমাকে হেন দাও তেন দাও, করেননি। সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে কী চেয়েছিলেন তিনি ?

আব্রাহামের সঙ্গে শলোমনের স্বপ্নের কতই না তফাত। হবেই বা না কেন ? একজন, সঙ্গে উট, তাঁবু আর হাতে লাঠি, নিজেরই জীবনকে খেদিয়ে ফিরছেন লাল মরু থেকে কালো মরুতে। মাটিতে লাঠিখানা পুঁতে জোর গলায় বলতে পারেন না, এই মাটিটুকু আমার ! গ্রামের লোকেরা তাঁকে জায়গা দিতে চায় না, বেদেকে কে জায়গা দেবে !

এইটুকু ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন সারগন শলোমন। তাঁর এখন সৈনিকের বেশ, সঙ্গে হিত্তীয় অশ্ব শাম, কুচকুচে কালো। পাহাড়ি ঘোড়াটা মিশ্রীয় পিরামিডের চেয়ে কৃষ্ণতনু এবং কঠিন। ইহা উত্তরের কৃষ্ণসাগরের কাছাকাছি হালিস নদীর তীরে জন্মে বেড়ে ওঠা ঘোড়া, ইহার শৈশব কেটেছে হালিস নদীবেষ্টিত চমৎকার উপত্যকায়। এর চোখে কৃষ্ণ সমুদ্রের কালো জল চিকচিক করে, ইহাকে তাঁবে আনতে যথেষ্ট মেহনত করতে হয়েছে।

আব্রাহাম সারা জীবনে কখনও দু' চোখে ঘোড়া দেখেননি। দেখেছেন খচ্চর। দেখেননি বলতে চড়ে দেখেননি। কারণ, ঘোড়া যে বশ মানে, একথা বিশ্বাস করাটাই সে-যুগে ছিল বিস্ময়কর। তিনি চিনেছিলেন ভারবহী দুটি জীবকে, উট আর খচ্চর।

ইতিহাস সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ সম্রাট শলোমন জানেন এই হিত্তীয় বা হিটাইটরা জাতির পিতা আব্রাহামকে দাক্ষিণ্য করেছে অতীতে। সেই ইতিহাস ভোলবার নয়। উপরের হিব্রোন বা ইফ্রোন উপত্যকায় সেই ইতিহাসের স্মৃতি রয়েছে ; রয়েছে আব্রাহামের সমাধি, রয়েছে আব্রাহাম-পত্নী সারি ওরফে সারার কবর। সেটি মকপেলা গুহার ভিতরে সুরক্ষিত রেখেছেন শলোমন। ইফ্রোনের অধিকার ক্ষেত্র ইফ্রোন-উপত্যকা, এই ইফ্রোন একজন হিত্তীয়।

কিন্তু এই সংরক্ষণের কী প্রয়োজন ছিল ? ইতিহাসকে কেন মনে রাখতে হবে ? ইতিহাসের বিস্মরণ ঘটলে জাতি বাঁচে না। জাতিকে গড়াও যায় না। শলোমনের চাই সমস্ত ইতিহাস। পুরাণের সর্ববিধ নাটক তাঁর জীবন-চরিতে ঢুকে পড়ছে। তিনি এই মরুমর্তকে কী চোখে দেখেন তাইই তো আসলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী এবং তাইই আদমের কিস্সা।

শাম, এই কৃষ্ণ অশ্ব, এটাও তো ইতিহাস। একসঙ্গে এত কথা বহন করেন বলেই তো তিনি সারগন। অশ্বের নাম, তাও হিত্তীয় ঘোড়া, শামের অপর নাম, ডাকনাম শামস্। হায় দয়াময়, এই শামস্ তো আর এক ইতিহাস। একসঙ্গে কিভাবে জুড়েছেন সম্রাট ?

কোন কথাটি আগে ভাবতে চান শলোমন ? শাম না শামস্ ? কোনটি আগে ? উট না অশ্ব ? আগে নোহ, না অব্রাম ? সময় ধরে পরপর ঘটনা তো আসে না। তাঁর হৃদয় কিভাবে চিন্তা করে ?

এখানে প্রতিটি বালুকাকণায় ইতিহাস আর পুরাণ জড়ানো। কত নাটক, কত গান ! কত সহস্র যুদ্ধ, কত ভেরীবাদন, কত শান্তিপ্রস্তাব, কত দিব্যদান, কত সংহার, কত অশ্রু, কত যে রুধির-তমসায় লিপ্ত ভূমরুর উপাখ্যান। আদম বলেন, এই মরুই মানুষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দর্পণ। এখানে যৌনকাম অমোঘ, মানুষের রুধির পান

অমোঘ, এখানে আত্মাকেই চূর্ণ করেছে মানুষ ; এখানে সভ্যতা ফুটে উঠেছে রাজবৃক্ষ জলপাই-এর মতন, এখানে ঈশ্বরবৃক্ষ এলাতলে এল্, আলিফ, আলফা-এলাহি, প্রভুদেব ও মূর্তিহীন ইয়াহো এক ঘাটে বারি পান করেছেন মরু-জিহ্বায়, এখানে অযুত মোজেজা (যাদু) দেখেছে উট-পূজক বেদুইন এবং আর্যরা আর দেখেছে অসুর এবং কাবুসরা আর দেখেছে কিবতিরা ও হিত্তীয়রা। আর কারা দেখেছে এই সব ?

এখানে সূর্যদেব শামসকে প্রথম প্রণাম করেছে মানুষ। সূর্যকে প্রণাম করা যদি কোনও সভ্যতা হয়, যদি হয় আকাশ-প্রতিভার ধর্ম, মানুষের পরিব্যাপ্ত উপাসনা, তা-ও এই মরুমর্তের দান। সম্রাট শলোমন তাই সূর্য-মন্দিরগুলি মরু থেকে নিশ্চিহ্ন করেননি। তিনি যে কিছুই উৎখাত এবং নিশ্চিহ্ন করতে পারেন না। কেন ? তিনি কি কেনান মরুভূমির প্রথম রাজা শৌলের মতো নির্বাচনে অপারগ ? শৌলের মতন তিনিও কি দ্বিধাদীর্ণ এবং পাগল ? তিনি কি জানেন না কে তাঁর ইলোহিম ? কে তাঁর এল্ ? কে তাঁর সদাপ্রভু ?

পাগল ! হৃদয় কি বলে ? তিনি কেন তাঁর হিত্তীয় কৃষ্ণঅশ্বটিকে শামস্ বলে ডাকেন ? সূর্য বলে ডাকেন কেন ইহাকে ? এই হয়টি তাঁর কে হয় ? এ কি তাঁর মাতৃদান ? এই কথা ভাবিবা মাত্র শলোমনের মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। ভূমরু তাঁর চোখের সামনে দুলতে থাকে। কেমন ঝাপসা লাগে সব কিছু। সবই ধুলাভস্মসদৃশ ভাসমান, সবই মরীচিকাবৎ কম্পমান জল ! কিন্তু আকাশে বৃষ্টি নেই।

বাস্তবিক হিত্তীয়রা কি তাঁর মাতৃশক্তি নয় ? তাঁর মা বৎসেবা ছিলেন বাবা দাউদের পরকীয়া প্রেমের নারী। বৎসেবা ছিলেন দাউদের সর্বাপেক্ষা অনুগত সেনা উরিয়ের স্ত্রী। এই উরিয় একজন হিত্তীয়। তারপর ? শলোমনের হৃদয় আর চিন্তা করতে পারে না।

এই রকমই এক গ্রীষ্ম ছিল সেদিন। ছিল দ্বিপ্রহর ঢলে পড়া তেজী রোদের লু। পুকুরে স্নান করছিলেন মা। না, তিনি তখনও শলোমনের মা নন। বৎসেবা দাউদের চোখে পরস্ত্রী, হিত্তীয় বউ। দাউদ দেখছিলেন ছাদের উপর থেকে পদ্মপুকুরের নিস্তরঙ্গ জলে ঢেউ উঠছে মৃদু মৃদু। কে ওই অপরূপা, নগ্ন মৃণালবাহু নারী, কে ওই উন্নত কুচযুগ উন্মুক্ত অপ্সরা, কে ওই হুরি ?

—কে, ও ?

—বৎসেবা।

—বৎসেবা কে ?

—ও একটা হিত্তীয় স্ত্রীলোক হুজুর !

—বুঝলাম। শোনো, নাথন, একে আমার চাই। তুমি আমার উপদেষ্টা স্বপ্নবিদ্।

—এ অন্যায় সম্রাট ! কেননা, আব্রাহাম কখনও তাঁর সন্তানদের জন্য কোনও হিত্তীয় স্ত্রী নির্বাচন করেননি। তাছাড়া বৎসেবা পরস্ত্রী।

—কার স্ত্রী ? উত্তর দিচ্ছ না কেন দিব্যতন্ত্রী নাথন ? তুমি কি দৈব-প্রতিভার সম্মান চাও না ?

—তোমাকে আমি হুজুর বলে ডাকি, তুমি বনি ইস্রায়েলদের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজা হয়েছ, তুমি সাম্রাজ্য দিয়েছ আমাদের। তুমি শ্রেষ্ঠ। কেন তুমি পরস্ত্রীতে লোভ কর !

—কার স্ত্রী সে ? মনে কর, যুদ্ধ শেষের পাওনা হিসেবে আমি বৎসেবাকে চাইছি।

—হিত্তীয়রা চিরকালের নরম স্বভাবের মানুষ, তারা এখন তোমারই অনুগত। উরিয় তোমারই সেনা। সামান্য সৈনিক, কিন্তু বলশালী এবং যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম সে পালন করে অক্ষরে অক্ষরে।

—মানে ? উরিয়র কথা তুলছ কেন ? আমি তো তাকে বিশ্বাস করি। ওকে আমি আরও দায়িত্ব দিতে চাই। ওকে আমি পুরস্কৃত করব।

—তা করবে। কিন্তু বৎসেবা তার স্ত্রী

নাথনের এই কথা শুনে কী সিদ্ধান্ত করেছিলেন সম্রাট দাউদ ? বিশেষ আর চিন্তা করতে পারে না সম্রাটের হৃদয়। হৃদয় দিয়েই তো মানুষ চিন্তা করে। এ কথা কত না পুরনো।

মিসরের আদিবাসীদের বলা হত কিবতি। রাজাদের বলা হত কাবুস। কিবতিদের চিন্তাশক্তি ক্ষুদ্র ছিল না। তারাই প্রথম আবিষ্কার করে মানুষ হৃদয় দিয়ে চিন্তা করে। কেন হৃদয় ? কারণ মৃত্যুর পর সত্যের পালক দিয়ে মানুষের হৃদয়কে ওজন করা হবে। এক পাল্লায় চড়ানো হবে হৃদয়কে অন্য পাল্লায় সত্যের পালক। মরুমর্তে তোমার হৃদয় সত্য ছিল কি না তারই পরীক্ষা করা হবে।

কিন্তু নরদেবতা কাবুসের হৃদয় কি সত্য ছিল কখনও ? পিরামিডের গায়ে যে কথা তাঁরা খোদিত করেছিলেন তা কি হৃদয়ের নির্দেশ মেনে ? যত শিলালেখ, যত পোড়া মাটির ফলক, সবই কি হৃদয়ের সত্য বলেছে ? নরদেবতা কাবুস কখনও পুরোপুরি মানুষ ছিলেন না।

কাবুসরা ছিলেন অর্ধেক মানব, অর্ধেক দেবতা। তাঁরা মুখ্যত দেবতা, এই মর্তে কিবতিদের শাসন করবার জন্য তাঁরা এসেছিলেন এবং বাস করেছিলেন বৃহৎ পুরীতে, সেই অট্টালিকাকেই ফেরো বলা হত, সেই আখ্যাই নামের সঙ্গে জুড়ে তাঁদের বলা হত ফরৌন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন লোকপুরাণে কাবুস। ফরৌন কোনও একজন লোক নয়, তাঁরা মর্তে এসেছেন বহুবার, যুগে যুগে।

কিন্তু কিভাবে এসেছেন সেই দেবতা ? মানুষের পোশাক পরে। দেখতে মানুষ হলেও বাস্তবিক তাঁরা আকাশ-প্রতিভা, তাঁরা মৃত্যুর পর দেহটাকে মরুভূমিতে ফেলে রেখে চলে যান, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দেবতার পোশাক পরে ফেলেন। দেহটা কিন্তু শস্তা নয়।

দেহ এক আশ্চর্য পদার্থ। একে সাজানো যায়, রাঙানো যায়, সুগন্ধিত করা যায়। খাইয়ে পরিয়ে সুখে রাখা যায় ! দেহ ভয়ানক সুখের জিনিস ! একে মর্তে ফেলে রেখে গিয়ে সুখ কোথায় ? দেহটাকে ফেলে রেখে কোথায় যেতে হবে সকলকে ? সেখানে দেহ ছাড়া কিভাবে ভেসে বেড়াবে কিবতিরা এবং কাবুসরা ? সেই এক তমসা পারে গিয়ে কাবুসরা মরুভূমিতে ফেলে রেখে যাওয়া দেহটাকে চাইত। দেহের মায়া কি সহজ কথা ! তাই তো দেহটাকে মমি করে রাখা। কিন্তু হৃদয় ?

হৃদয়ের তো মমি হয় না। এই অবধি ভেবে শামের পিঠে হাত রাখলেন শলোমন। তিনি কিবতিদের মহা আবিষ্কারকে শ্রদ্ধা করেন। হৃদয়কে আবিষ্কার করা চাকা আবিষ্কারের মতো চিরবিস্ময়কর ঘটনা। মানুষের হৃদয় লৌহরথ অপেক্ষা তেজস্বী।

লৌহরথ। অশ্ব। লোহা আর ঘোড়া। শলোমন পৃথিবীর প্রথম রাজা যাঁর প্রধান ব্যবসা ছিল রথ বিক্রি আর ঘোড়া কেনাবেচা। তাছাড়া হাতির দাঁতের কাজ, ডাক-হরিণের কপালের কস্তুরী সংগ্রহ করতেন তিনি। তাঁর আয়ের সিংহভাগ জোগাড় হত এক অদ্ভুত উপায়ে। শলোমন পথকর নিতেন বিদেশী বণিক এবং সৈন্যদের কাছ থেকে। কোনও মানুষই কর না দিয়ে কেনান (প্যালেস্টাইন) অতিক্রম করতে পারত না।

কেনান ছিল মরুমর্তের এমন এক দেশ, যার উপর দিয়ে না গেলে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে কোথাও যাওয়া যেত না। এ যেন এক আশ্চর্য সাঁকো, যুদ্ধেই যাও আর বাণিজ্যেই, এই সংযোগভূমি তোমাকে ছুঁতেই হবে। মরুভূমিতে এমন কোনও যোদ্ধৃজাতি জন্মায়নি, যার সৈন্যবাহিনী এই কেনান না মাড়িয়ে কোথাও বর্শা ছুঁড়তে পেরেছে ! পূর্বদেশ আসিরিয়ার সৈন্যবাহিনী যখন মিসর আক্রমণ করেছে এই পথেই গেছে। মিসরের গুপ্তচররা এই দেশে আত্মগোপন করে থেকেই অন্য দেশগুলির দুর্বলতার তল্লাশি নিয়েছে যুগে যুগে। বাবিলনীয়রাও এই দেশকে ঘা মেরে মিশরে আঘাত হেনেছে।

শলোমন জানেন, তিনি এক দুর্ভাগা দেশের সম্রাট। দেশটা প্রধানত উষর। ছোট ছোট পাহাড় দিয়ে ভাগ ভাগ করা। যুদ্ধের কাজে ব্যবহার ছাড়া এ দিয়ে কীই বা হয়েছে ! সবাই একে আঘাত করেছে এবং ছিন্ন করেছে। এর জমি মিসরের মতো শস্যদায়িনী নয়, যা কিছু উর্বর জমি তা-ও পড়ে ভূমধ্যসিন্ধুর উপকূলে।

মিসর থেকে একটি পথ সিধে এই উপকূল বরাবর উত্তরে চলে গেছে। এই পথটা সহজ এবং অবন্ধুর। আর একটি পথ যর্দন নদীর তীর ধরে চলেছে, অনেক ভাঙাচোরা এবং জটিল। এই পথে গিরিসঙ্কটের বঙ্কিমা আর উচ্চাবচতা, এর উত্তরদ্বারে একটি সংকীর্ণ গিরিখাত পড়ে, নাম মিজিডো বা মাগিদ্দ, এই পাহাড়টির নাম কারমাইল বা কারমেল।

শলোমন জানেন, এই উত্তরদ্বার দিয়েই মহাপিতা আব্রাহাম তাঁর পশুদল এবং ভাইপো লোতকে সঙ্গে করে ঢুকেছিলেন। এসেছিলেন যর্দন নদীর ধারে। নদীটা সমুদ্র-উপকূল অপেক্ষা নিচু। নদীর দুই তীরস্থ জমি খানিকটা উর্বর নিশ্চয়। এখানে আব্রাহাম পশু চরাতেন। নদী পেরিয়ে শিকিম (শেখেম) নগরে ঢুকে পড়েছিলেন নিশ্চয়। পশুদের গ্রামের তৃণভূমে ভাইপো লোতের জিম্মায় রেখে রাজার সামনে ষাষ্টাঙ্গ ভূমিপাত করে বলেছিলেন— বিনয় করি রাজা গো, আমাকে আর ভাইপোকে একটুখানি তাঁবু ফেলার ঠাঁই দাও। আমি তোমার জমি বাথান করে নষ্ট করব না। আমি বেদে কিন্তু বেঈমান নই।

রাজা বলেছিলেন— ফেলো কড়ি, মাখো তেল। তাঁবু ফেলার দাম দাও দশ কসিতা (মুদ্রা)। অধিকদিন থাকবে না। তাঁবু তোলার দিন বলে যেও, আর শোনো, আশেরা দেবীর থানে/ এলাতলে আমার নামে ভোগ দিও। যাও, তোমার ভাইপোও বোধ করি সুবালক।

—এঁজ্ঞে।

—আর শোনো, এই দেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয়, মাটি খারাপ। বর্ষা না নামলে দানাপানির কষ্ট। ক্ষয়া মাটি, কেঁপে ওঠে, পার তো কাবুসের দেশে নেমে যাও, ওই

দেশটা (মিসর) মরুভূমির গোলাঘর। সঙ্গে সুন্দরী কোনও বোন-ভগিনী থাকলে কথা নেই। বেচে দিতে হবে না, তাকে দেখিয়ে ফরৌনের আশ্রয় চেও, পেয়ে যাবে।

—আজ্ঞে, তা যা বলেছেন। হেঁ হেঁ!

তারপর অব্রাম আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকেন আর ভাবেন, সারি তো বিবাহ-পূর্ব সম্বন্ধে তাঁর ভগিনীই ছিল। তাকে বোন বলে চালালে যদি আশ্রয় মেলে... ইশ্! তা-ও কি সম্ভব!

দুর্ভিক্ষতাড়িত আশ্রয়হীন মানুষ যা করে তার চেয়ে নীচ কাজ কি করেছিলেন অব্রাম? অব্রাম উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাঁর চোখে মরুমৃত্তিকার স্বপ্ন, ঈশ্বর-পুরাণ তাঁকে দোষেগুণে মানুষ হিসেবেই দেখেছে, তিনি কখনও নরদেবতা ছিলেন না। ঠিক, এই জায়গাটায় তাঁর লাঠিটা প্রথম আঘাত করে— এই শেখেমে।

ইহাকেই তুমি আলিফ-স্থান বলিতে পার শলোমন। মরণ-সমুদ্র (Dead-Sea) কূলে মহাপিতা আব্রাহাম ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এত নিচু সমুদ্র পৃথিবীতে নেই। গ্যালিলি-হ্রদটা দেখ একবার। যর্দন নদী ওই হ্রদ আর উপসাগর (মরণ-সাগর)-কে যুক্ত করেছে।

মরণ-সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে মরিচা-নদী যর্দনের দিকে চাইলেন সম্রাট রাজচক্রবর্তী শলোমন। আশ্চর্য হতে হয়, শেখেমের এই হিব্রু-কূপটার জল সুশীতল নয়, উষ্ণ। তবে লবণাক্তও বলা যায় না। আকাশে চোখ তুলে চাইলেন দাউদ-পুত্র জ্ঞানী শলোমন। আকাশ-প্রতিভা আলিফের অযুত তারিফ করিতে হয়।

সদাপ্রভু যদি মরুভূমি বানাইলেন, তাহলে এত উত্তাপের মধ্যেও নীল নদী কী করিয়া হইল। যর্দন হইতে পারে, কিন্তু মরু-বিস্ময় নীল সম্পূর্ণত এলোহের দান। মরণ-সমুদ্র লবণ-বাষ্পে স্থির হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার সন্নিকট না হইলেও এই কূপটা উষ্ণ-প্রস্রবণযুক্ত স্বাদু সন্দেহ নাই। ইহা কী করিয়া হয়?

উন্নত অশ্বশক্তি সম্রাটের আছে। দেশ শাসনের মোজেজা তাঁর সুদৃঢ় সৈন্যবাহিনী, লৌহরথ এবং রাজ-চাতুর্য। তাই তিনি জানেন শুধু আধা দিয়া মরুবিজয় হয় না। রাজা না হইলে ধর্ম, পাথুরে ঈশ্বর-নিয়ম, ঈশ্বরীয় সিন্দুক— সবই তাম্রবৎ গলিয়া যায়।

যর্দন পারে ঘোড়া নিয়ে জেরিকোতে এলেন সম্রাট। জেরিকো কেনানের সর্বপ্রাচীন নগরী। এই নগরীর সাম্প্রতিক আদলটা শলোমনের গড়া। ইহা আগে ভূমিকম্প এবং পার্বত্য অগ্নুৎপাতে ধ্বংস হয়েছিল। ইহা বর্তমানে তাম্রনগরী; এখানের তামার খনি প্রসিদ্ধ।

যেখানে পাহাড় আগুন ঝরায় না, সেখানে তামা নাই। যেখানে শস্য-সবুজ কালো মাটি সেখানে তামা নাই। তাহলে লোতের স্ত্রী যে নুনের আকাশ-বৃষ্টিতে পুঁতে গিয়ে নুনের প্রতিমা হয়ে গেলেন, তা কি পাহাড়ের ক্ষার? এই সব অভিশাপের মাটিই তো শলোমনের দেশ।

এই দেশ ক্রমাগত যুদ্ধে ব্যবহৃত, পাহাড়ের আগুনে পোড়া, সমুদ্রের ক্ষারজলে পীড়িত, পাহাড়ে পাহাড়ে বিভক্ত, মানব-শোণিতে আর্দ্র-লবণাক্ত, তবু এর নাম কেনান। কেনান, নোহের এক পুত্র কেনান, তারই নামে দেশ। নোহের মধ্যম-পুত্র শাম বা শেম— কী আশ্চর্য সেই নামই দিয়েছেন ঘোড়াটার। আর নোহের যে-পুত্র

পিতার স্বপ্নকে অবজ্ঞা করেছিল, সে কোথায়? কোথায় লোতের বংশধররা?

শলোমন শামের পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। তন্দ্রা তাঁকে আকর্ষণ করছে। সৈনিকের কালো পোশাকে সমাবৃত দেহ। শিরস্ত্রাণে মস্তক ঢাকা। চোখ দু'টি ঝালরের ফাঁক দিয়ে সম্মুখে দৃষ্টি চালিয়ে দেয়। সেই চোখ এখন মুদে আসতে চাইছে। সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সম্রাট কেমন ঘোরের মধ্যে লক্ষ করলেন, খনির বর্জ্য-পদার্থ বিগলন করা সুউত্তপ্ত বিশাল জলাধারটির বাষ্পমধ্যে উপর থেকে কী একটা ছিটকে পড়ে গেল।

মানুষ। কেউ ফেলে দিল নাকি! হঠাৎ দেখা গেল তপ্ত জলাধার থেকে আঁকড়ি বাঁধা লৌহযন্ত্রটি মুখ ডুবিয়ে সাঁড়াশির মতো দেহটাকে চেপে ধরে উপরে তুলল, তারপর জলাধারের বাইরে যন্ত্র তার দাঁত ফাঁক করে ফেলে দিল। পথের উপর পড়ে গেল কালো হয়ে পুড়ে যাওয়া শ্রমিকের দেহখানি। ঠিক পিছনে, ঘটল ঘটনাটা, ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে চাইলেন তন্দ্রাচ্ছন্ন সম্রাট। কালো, দগ্ধে প্রাণ চলে যাওয়া মরুভূমির শ্রমিক, নব্য দাস।

কী অপরাধ লোকটার? কাজে ফাঁকি দিয়েছিল? লোকটা কি কোনও যৌন অপরাধ করেছিল! অত্যন্ত ঘুম পেয়েছে সম্রাটের, তিনি কিছুতেই নিজেকে জাগিয়ে রাখতে পারছেন না। শামের পিঠে ঢলে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন সারগন, আর পারছেন না তিনি।

তার পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছেন সম্রাট, শাম জানে এবার তাকে মরুঝড় সাইমুমের মতো ছুটতে হবে। মরুভূমিতে এই হত্যাকাণ্ড কিছু নতুন ঘটনা, যন্ত্র দিয়ে মানুষ মারার কৌশল লোহা আবিষ্কারের আগে কখনও দেখা যায়নি। তামার খনি হলেও মাল তোলার ওই যন্ত্রটা বেশ অভিনব। তপ্ত জলাধারটি গলিত তামার জঞ্জালে পূর্ণ। ওখানে শ্রমিকটাকে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হল। লোকটা নিশ্চয়ই অভিশপ্ত। কিন্তু কেন?

অথচ লোহার সম্পূর্ণ ব্যবহার এখনও কেনান আয়ত্ত করতে পারেনি। এখনও হিটাইটরা লোহা তৈরির সব মন্ত্র শলোমনকে দেয়নি। লোহা তৈরির কারখানাগুলি সেই উত্তর-সীমান্তে হিত্তীয় (হিটাইট) রাজাদের নগরগুলিতে অবস্থিত। অবশ্য সব নগরে নয়, ক্ষুদ্র নগর মালাটিয়ার হিত্তীয়রা লোহা বানায়। রাজারা এখন হৃতগৌরব, নামে রাজা, সবাই শলোমনের অধীনে মাথা নুইয়ে রয়েছে, শলোমন ক্ষুদ্র রাজাদের উপঢৌকন দেন এবং কর দাবি করেন না। এই রাজারা কতকগুলি নগরেই থাকে। খুব শৌখিন আর বিলাসী। নামেই রাজা, এদের যুদ্ধে মন নেই, এরা কাবুসের মতো নারীদেহ আর সুদ্রাক্ষার তাড়ি ভালবাসে। শলোমনের অধীনে এরা বেশ সুখে আছে। এদের জন্য নীল নদীর মাছরাঙার দামি চামড়া দিয়ে প্রস্তুত এক ধরনের রাজ-পরিচ্ছদ তোয়ের করে দিতে হয়।

মাছরাঙার চামড়া দামি, নীল নদী এবং ভূমধ্যসিন্ধুর উপকূলবর্তী ওই সব পাখিদের ফাঁদ পেতে শিকার করা হয়। একদল ফান্দাবাজ ধীবর ওই চামড়া জোগাড় করে, তাছাড়া এরাই সামদ্রিক শামুক-গুগলির কোষ থেকে রঙিন রস নিঙড়ে রং তৈরি করে। রস থেকে রোদে শুকিয়ে এক ধরনের গুঁড়ো তৈরি হয়, সেই গুঁড়ো জলে মিশিয়ে কাপড় রং করা হয়। এই কাপড় বেগনি-লাল, ময়ূরকণ্ঠী রঙ, অভিজাত

রঙের—এই কাপড়ের ব্যবহার ব্যয়সাধ্য। মাছরাঙার চামড়াকেও ধারকপদার্থের সাহায্যে রোদে শুকিয়ে মজবুত করে নেওয়া হয়। গুগলি কোষের রঙ থেকেই রঙের কারখানাগুলি সমুদ্র-উপকূলে গড়ে উঠেছিল, আজও সমুদ্র বন্দরে কারখানা রয়েছে।

শলোমন সমুহ রাজাদের এই পোশাক জুগিয়ে থাকেন। পোশাকই শুধু নয়, জেদ্দায় প্রতি সন যে সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়, সেই সুন্দরীদেরকেও রাজারা চায়। কখনও একে, কখনও তাকে দিতে হয়। হিত্তীয় রাজারা তবু শখে-ব্যসনে মজে থাকে, কিন্তু সমুদ্রকূলের পলেস্টীয় রাজাদের রোখ এখনও যায়নি। ওরা কী চায়, কী করতে চায়, বোঝা যায় না। সম্রাট দাউদ পলেস্টীয় ওই সব আর্যদের দমিয়ে রেখে গেলেও এরা এখনও বিপজ্জনক। সাপের লেজের মতো মরেও মরে না। তাই সব সময় সমুদ্র-বন্দরে শলোমন রথ এং সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রেখেছেন।

হিত্তীয়রা শলোমনের মাতৃশক্তি কেন, ক্রমশ আরও স্পষ্ট হবে। আদম বলতে চান, শলোমন হেত (হিত্তীয়)-এরই সন্তান। তিনি মাত্র অর্ধাংশে অব্রামীয় বা তিনি আরও অন্য কিছু। তিনি কিভাবে মরুভূমি শাসন করেছিলেন ভাবিয়া দ্যাখো! নারী ঘুষ দিয়া, রঙের কাপড় উপঢৌকন দিয়া, চোখ রাঙাইয়া!

তবু হিত্তীয় রাজারা লৌহবিদ্যার সূত্র শলোমনকে দেন নাই। উল্কাপিণ্ড হতে পাওয়া লৌহ-আকর এখনও কেনানের উত্তরাঞ্চলের সামগ্রী এবং কী করিয়া কী হয়, হেতের রাজার নির্বাচিত বিশেষ কারিগররাই জানে।

মালাটিয়ার কারিগর ওরা। মাত্র ক'টি পরিবারের মধ্যেই লোহা তোয়ের করার বিদ্যা লুক্কায়িত। মালাটিয়ার রাজা ইষানুল তাদের চোখে চোখে আগলে রাখে। এরা অতি সংখ্যালঘু। এদের বিদ্যাকে কাজে লাগাতে পারলেন না শলোমন। এই কারিগরদের জোর করাও যায় না, কারণ এদের মধ্যে অদ্ভুত বিদ্বেষভাব লক্ষ করা যায়। ইষানুল সর্বদা কারিগরদের অন্তরের সেই বিদ্বেষকে চাগিয়ে রাখে। কী সেই গোপন ঘৃণা?

একদিন নববর্ষের উৎসবে কোড়া পাখির যুদ্ধপ্রদর্শনী হল। কোড়া পাখি যুদ্ধবাজ পাখি। কোড়ার কপালে, যুদ্ধের যে লাল রঙ, সেই লাল রঙের পর্দা থাকে, ঠোঁট হলুদ। এই পাখিকে যুদ্ধ-শিক্ষা দেওয়া হয়। এদের গায়ের রঙ বেগনি। ইষানুলের খুব প্রিয় পাখি। মরুতে এদের বেদম কেনাবেচা চলে।

এরা যুদ্ধে নামলে ভেরী বাজায় ইষানুল একদল সাজানো যাজকদের দিয়ে। এরা মোশিবংশ লেবি। এই ভেরী পিত্তলের, ইহা ইস্রায়েলী মরুযুদ্ধের নকল মহড়া মাত্র। মোশির প্রতিনিধি যশুয়া জেরিকো আক্রমণের জন্য সাতজন যাজককে ভেরী বাদনে নিযুক্ত করেন, সৈন্যরা জেরিকোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে রাত্রিতে জেরিকোর পথে পথে যুদ্ধের মূকাভিনয় করে যেত, তারা মাঝে মাঝে হোপ হোপ করে মুখে আওয়াজ করত, কী দৃশ্য! যাজকরা চোরের মতন চলে যেত পথের উপর দিয়ে এবং হঠাৎ বাজিয়ে তুলত ভেরী!

নববর্ষের উৎসবটা কি বিদ্রূপ! শলোমন বুঝতে পারেন না। না, বিদ্রূপ নয়, এটি একটি মজা। ইষানুল ওই উৎসবে বক্তৃতা করে বলল—শুনে রাখো ভাইসব, যশুয়া মহৎ বীর সন্দেহ নাই, তারা ছিল কোড়া পাখির জাত। কিন্তু মজাটি হচ্ছে, কাকে কে মারে! মহাপুরুষ হেতের সুপুত্র উরিয়কে খড়্গাঘাত করল কে? মনে রাখবা, দাউদ মহৎ কিন্তু মাহাপাপী ছিলেন। ক্ষমা করবেন মহাজ্ঞানী শলোমন, কোড়াযুদ্ধ স্বাভাবিক

ঘটনা, আমি কারিগরদের ভুলে যেতে বলি এই কথা যে, ইজ্জৎ গেছে মোদের সেকথা ভুলে যাও! বিনয় করি প্রভু শলোমন, এটা নাটক মাত্র, দোষ নেবেন না।

এই বক্তৃতা শুনতে শুনতে একটি লেলিহান মরুনক্ষত্র কোথায় খসে গেল আর আগুনভরা একটি উট আকাশে ভাসতে থাকল। লি লি করে উঠল অপমানের চাপা চিরাগ, অষ্টোরৎ দেবীর হোমাগ্নি। আদম বলিলেন, শলোমন মালাটিয়ার উৎসব ছেড়ে মরুসরণিতে একটি মিশ্রীয় সাদা অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। একা। একা নয়, একা হতে চাইলেন। মিশ্রীয় সাদা ঘোড়া। মিসরে ঘোড়া কোথা থেকে আসবে! ঘোড়া তো হিত্তীয়দের তাঁবেদার জীব। কিন্তু শলোমনের যুগে মিসরেও ঘোড়ার ভাল বাজার। ঘোড়াটি সেই হাট থেকে কেনা। তুষার-ধবল এই ঘোড়াটির নাম রাম। রামাসিসের নাম অনুযায়ী, সংক্ষেপে রাম। এই ঘোড়াটাকে সম্রাট সুখের প্রতীক হিসাবে ধরেন, এটি যুদ্ধের ঘোড়া নয়। উৎসবে প্রমোদে শান্তিতে এটিতে চড়েন তিনি। এই একটি ঘোড়ার আরোহীকে মানুষ সহজে শনাক্ত করতে পারে, ইনিই সারগন।

সাদা ঘোড়া আর বেগনি-লাল রঙের রাজকীয় পোশাক, তখন সম্রাটের যোদ্ধবেশ নয়। সামগ্রিক গুগুলি-শামুকের কোষরস রঞ্জিত এই অভিজাত পোশাক বেশ ঢিলেঢালা। অনেকটা নবিবেশ, চোখমুখ গভীর প্রশান্তিতে ভরা। হাতে শলোমনের আকাশে তোলা আষা। এত সহজ, নরম মানুষ তিনি। মনেও হয় না, এই মানুষটির সুদৃঢ় অশ্বসৈন্য বাহিনীর কথা, বিশাল পদাতিক বাহিনী, বিপুল অস্ত্রসম্ভার এবং ইনিই জিরুজালেমে নির্মাণ করতে চাইছেন ইস্রায়েলদের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইলোহের মন্দির। পিতা দাউদ পারেননি। শুধু তিনি সাগরজাতি পলেস্টীয়দের হাত থেকে অর্থাৎ আর্যদের হাত থেকে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক উদ্ধার করে দিয়েছেন আর গড়ে তুলেছেন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী। আর্যরা নিয়ম-সিন্দুক বা ইলোহে-সিন্দুক যুদ্ধে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছিল ইস্রায়েলদের কাছ্ থেকে। সাত মাস সেই সিন্দুক আর্যরা অব্রামীয়দের ফেরত দেয় নাই।

আদম বলিলেন, ইহা খ্রিস্টপূর্ব সাড়ে নয়শো কালের ঘটনা দেখা যাইতেছে। তুষার-ধবল নববর্ষ পূর্ণিমায় সাদা অশ্ব মরুভূমে ছুটিয়া চলিয়াছে। পোশাক ঢিলেঢালা, একটি দীর্ঘ ময়ূরকণ্ঠী রঙের বসন সম্রাটের দেহকে বেড়িয়া আছে, তিনি আজ বুঝিবা স্বপ্নদ্রষ্টার মতন উৎসবে বাহির হইয়াছিলেন।

যত দিন গিয়াছে সদাপ্রভু ততই স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্ন হইতে দূরে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছেন। আব্রাহাম যত ইলোহিমকে স্বপ্নে দেখিতে পাইতেন, স্বপ্নে যত নির্দেশ আসিত, যত অনুজ্ঞা প্রকাশ পাইত, যত নিয়ম উদিত হইত—শলোমনের স্বপ্নে সেই রূপ হয় না। কেন?

লিপিকার লিখল, জীবনের চাপ থেকেই স্বপ্নদর্শী মানুষের বোধি ও চিৎচৈতন্য ঘটে। অব্রাম স্বপ্নের জন্য অপেক্ষা করতেন। একটা চিত্তঘূর্ণির মধ্যে থাকতেন অব্রাম।

শলোমন কি করেন না? অপেক্ষা? সদাপ্রভু মাত্র একবারই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। স্বপ্নের সেই উদয় রোমাঞ্চকর। এল্ শুধালেন—কী চাও শলোমন? তুমি কি যোশেফের মতো তারাদের চাঁদের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়তে দ্যাখো? আকাশের সপ্তর্ষি কি তোমাকে প্রণাম করে?

—না, ইলোহে। আমি কিছুই দেখি না।

—তুমি আমাকে দ্যাখো, আমি মোশির অগ্নিসংকেতকারী ঈশ্বর। আমিই সেই, যে আমি ছিলাম। কী চাও ?

—জ্ঞান।

—সাম্রাজ্য ? সম্পদ ? দীর্ঘ পরমায়ু ? আরও সৈন্যবাহিনী ? আরও মৃত্তিকা ? আরও... আরও...

—না, কেবল মাত্র জ্ঞান, আর কিছুই চাই না আমার।

—বেশ। তাহলে, প্রজ্ঞাকে বল, তুমি আমার ভগিনী, সুবিবেচনাকে বল, তুমি আমার সখী। তুমি প্রজ্ঞা আর চতুরতা-গৃহে বাস কর। পরিণামদর্শিতা হোক তোমার তন্ত্র।

—আমার হৃদয় যেন সত্য বলে।

—তাহলে তুমিই স্বয়ং সুবিবেচনা, তাই তুমিই পরম কৌশল এবং তুমিই চরম পরাক্রম।

লিপিকার আদম হতে লিখল, একবারই সদাপ্রভু শলোমনকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। এবং মালাটিয়ার সেই সুগন্ধ-মদির উৎসব রাত্রিতে অপমানিত শলোমন ইষানুলকে একটি কথাও বললেন না। চুপচাপ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অঙ্গন থেকে নিঃশব্দে সরে চলে এলেন। তখন তাঁরই সৈন্যবেশী ছায়ামূর্তি দু'জন, দু'পাশে এগিয়ে এল। উৎসবে উদ্ভ্রান্ত মানুষ কেউ প্রায় লক্ষই করল না, শলোমনের ছায়ামূর্তিরা অবিকল সম্রাটেরই সৈন্যবেশ, এরা অভিন্ন। এরা সশস্ত্র। সম্রাট চাইলেই এদের যে-কেউ একটি অস্ত্রাঘাতে ইষানুলের মাথা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতে পারত। সম্রাট কাউকে কোনওই ইঙ্গিত করলেন না।

শুভ্র অগ্নিময় অশ্ব চন্দ্রালোকে উতলা, মাটিতে পা খুঁড়ছে। পিঠে লাফিয়ে চড়লেন সম্রাট। দু'পাশের দুই কৃষ্ণঅশ্ব, আরোহী দুই ছায়ামূর্তিকে নিয়ে এগিয়ে চলল। ধীরে ধীরে সাদা ঘোড়ার গতিবেগ বাড়তে থাকল।

সম্রাট তাঁর দুই ছায়ামূর্তিকে সহসা বলে উঠলেন—মনে কর এই জ্যোৎস্নায় আমরা মরু-নরকের মধ্য দিয়ে চলেছি। কিবতিরা মনে করত, মৃত্যুর পর মানুষ ছায়ার মতো কোথাও ভেসে বেড়ায় আর মরুমর্তে ফেলে যাওয়া দেহটার জন্য আর্তনাদ করে। তোমরা আমার সেই ছায়া, কখনও তোমরা আমার এই দেহটা পাবে না। এই দেহের সুখও বুঝবে না, দুঃখও না।

—আমরা হত্যা করতে পারতাম রাজচক্রবর্তী প্রভু।

—না। তোমাদের কে হাবিল আর কেই বা কাবিল, আমি জানি না। তোমরা আদমের দুই সন্তান, আমার পাশেই তোমরা রয়েছ। তোমাদের আমি নিয়োগ করেছি। তোমাদের সুখ দুঃখও আমি বুঝি না। ছায়া এবং শরীর তো এক নয় হাবিল-কাবিল। [আদিপুস্তকে এরা কয়িন ও হেবেল নামে গণ্য]।

ছায়ামূর্তিরা কোনও উত্তর দিল না। তারা জানত, এই সম্রাট হয়তো কিছুটা রাজা শৌলের মতন উন্মাদ। তবে তিনি অপমানে জনসমক্ষে অবিচল থাকেন, একান্তে সেই মানুষ পাগল হয়ে যান।

—তোমরা আমাকে আপাতত ত্যাগ কর হাবিল-কাবিল। আমি বাঁচি।

—একা আপনাকে ছেড়ে দেব ?

—তাই দাও।

—রাত্রি গভীর হয়েছে সারগন। পথ নির্জন ঠিকই, কিন্তু শত্রুরা এলোন বনে আত্মগোপন করে থাকে। দেবদারের আড়ালে দাঁড়িয়ে অস্ত্র শানায়। ইতিপূর্বে একজন কুষ্ঠরোগীকে আপনি দেখেছেন।

—হ্যাঁ।

—বৈথেল থেকে আপনার কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিল। পরে কী দেখলাম আমরা ? লোকটা মিশ্রীয় গুপ্তচর। বলেছিল, ও একটা বাউর। স্বপ্নবিৎ সম্প্রদায় বাউর-বংশ।

—বটেই তো। আমার মনে পড়েছে। স্বপ্নবিৎরা এ যুগে স্বপ্নভ্রষ্ট হয় হামেশা। ওরা মিথ্যুক।

—ওই রকম বলেন বলেই তো নাথন গোষ্ঠীর একজন পয়গম্বরী করে বলে, আপনার পতন অনিবার্য।

—তাই বলে নাকি ? ওহ্ নাথন ! তাই না ? কী বলে ওরা ?

—আপনি নাস্তিক রাজা চতুর্থ আমেনোফিসের প্রতি অনুরক্ত।

—তাই নাকি ? আর কী বলে ?

—আপনি বলেন, আমেনোফিসের ধর্ম মোশিকে প্রভাবিত করেছিল।

—হ্যাঁ বলি। দ্যাখো হাবিল-কাবিল ! আমেনোফিসকে প্রভাবিত করেছিল সূর্য-ধর্ম। একথাও বলি। কেন বলি ? সত্য বলেই বলি। কারণ আকাশে সূর্য একটাই। ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়। নির্মল সত্য বলেছিলেন আমেনোফিস। সব ধর্মের সাধারণ সত্য একই, সূর্য যেমন একক। ঈশ্বরকে ধারণা করবার শ্রেষ্ঠ উপায় সূর্য, কোনও ঐতিহ্যই ন্যূন নয়, সবই কাল ও স্থান বিশেষে শ্রেষ্ঠ, সবই সুন্দর। কাউকে মরুমর্ত থেকে নির্বাসিত করা উচিত নয়। সূর্য কুষ্ঠ সারায়।

—আপনাকে ঘৃণা করে নাথন গোষ্ঠী। বলে...

—কী বলে ? চুপ করে রইলে কেন আদম-পুত্র !

—ভয় করে সম্রাট।

—আমি আজ নিরস্ত্র হে ধর্মের পুত্রগণ !

—এভাবে বলবেন না মহাধিপতি ! আমরা আপনার ছায়া হয়ে গর্বিত।

—বল আর কী বলে ওরা ?

—আপনি...আপনি...

—বলো ধর্মপুত্ররা, বলে দাও, ভয় ক'রো না।

—আপনি উরিয়ের সন্তান।

—কী ? উরিয়ের সন্তান আমি ?

—কেননা...

—কেননা ? কী বলতে চাইছ তোমরা ?

—অথবা আপনি অবৈধ। নাথন কখনওই মাতা বৎসেবার গর্ভ বিনষ্ট করেননি। একজন ভাববাদী এ কাজ করতেই পারেন না। আপনি ভেবে দেখুন, আপনি কে ?

—আমি কে ? কে আমি ? বলে মরুমর্তে অব্রামপুত্র ইশ্মায়েলের মতো, দাসীপুত্র

ইশ্মেলের মতো গগনভেদী আর্তনাদ করে উঠলেন মহামতি সম্রাট শলোমন। চিৎকার করে উঠলেন মহাবিস্ময়ে—ওরা এই কথা বলে ? বল, ওরাই কি বলে ?

হাবিল-কাবিল, শলোমনের ছায়ামূর্তি নীরব হয়ে গেল। এই সময় এক অদ্ভুত কুকুরের ডাক শুনতে পেলেন সম্রাট শলোমন। ভূচর-মরু নির্বাক ছিল চন্দ্রিকা-কলায়, ছিল নিঃসঙ্গ পর্বত শিখরে দিব্য-ব্যাপিনী চন্দ্রিমার মুখ, ছিল ভাসমান নিঃশব্দ আগুন-উট আর ফতুর ছায়াপথের ইলোহে-আলিফ-প্রভুদেব আর সাদা ডানার সৌর দেবদূতরা আর দক্ষিণের অনার্য পিরামিড নিঃসঙ্গ ছিল। পূর্বের সভ্যনদী ফোরাত কূলে কূলে কাঁদিয়া ফিরিতেছিল, মিশ্রীয় নদী নীল ফিতার মতো বহিতেছিল কাবুসের সংগীতে একাকী, মরিচা-নদী ঘর্দনে শিশির পড়িতেছিল শব্দহীন, কেবল একটি হরিণ কুকুরের মতো রোদন করিল।

ইহা ডাক-হরিণ, কস্তুরী-যাতনায় অধীর হয়েছে, একে আমি দেখব। বলেই সম্রাট সাদা ঘোড়াকে পায়ে গোত্তা মেরে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন। সম্রাটের দুই চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল নিঃশব্দে। তাঁর ছায়ামূর্তিরা অশ্বপৃষ্ঠে পিছু পিছু আসতে লাগল কিন্তু গতির মধ্যে তত উদ্দীপনা ছিল না। তারা সম্রাটকে দূর থেকে অনুসরণ করতে থাকে।

শলোমন এখন একা, অনেকক্ষণ একা। হাবিল-কাবিল কি নিজেরাও ওই কথা বলতে চাইল সম্রাটকে ? সে কি উরিয়র সন্তান হতে পারে ? সে কি তবে দাউদের ঔরস নয় ? নাথনপন্থীরা তার নামে অপবাদ রটাচ্ছে কেন ? কী লাভ এতে ? কী চাইছে ওরা ?

বৎসেবাকে সম্রাট দাউদ পুকুরের জল থেকে তুলে এনে ধর্ষণ করেন। কারণ সেই সময় পলেস্টীয় আর্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেছেন উরিয়। এই সাগরজাতি আর্যরা ভয়ংকর নিষ্ঠুরভাবে হিটাইটদের নগরগুলি তছনছ করে দিয়েছিল। লৌহ-কারিগরদের হত্যা করেছিল সপরিবারে। কত সেই সংখ্যা ? ফলে পরবর্তী সময়ে হিত্তীয়রা বাধ্য হয়ে দাউদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়। হিত্তীয়রা চিরকালই অত্যন্ত সংখ্যালঘু। এরাই ইতিহাসে অশ্ব আর লৌহশক্তির ব্যবহারকারী এবং আবিষ্কারক। কিন্তু সংখ্যাল্পতার কারণে আর্যরা এদের সর্বনাশ করতে পেরেছিল। আর্য বা সুরদের চাপে পড়েই এরা দাউদের সঙ্গে হাত মেলায়। অবশ্য অনেক আগে থেকেই এরা আব্রাহামকে চিনত।

ইষানুলের পুরো নাম ইষানুল খেতা। লৌহকারিগরদের কেউ লেখে অমুক খেতা, কেউ লেখে তমুক ইফ্রোন। খেতা শব্দটা মিশ্রীয়। খেতা মানে হিত্তীয়। ইষা গত বছর একটি প্রচার-পত্র লিপিকার দিয়ে লিখিয়ে প্রচার করেছিল। তাতে সে ভদ্রভাবে একটি পুরাণ-গল্পের উল্লেখ করেছিল। লিখেছিল, গল্প হলেও সত্যি। প্রচারপত্রের মাথায় বড় বড় অক্ষরে লিখেছিল ওই কথা। গল্পটি এই :

ঘটনা সত্য যে, আব্রাহাম উট পূজা করতেন না বা নিম্রোদের আগুনকেও পূজা দেন নাই। কিন্তু তিনিও হোম প্রস্তুত করিতেন এবং কেহ উট পূজা করিলে বাধা দিতে পারিতেন না। কেননা তাঁহার এক বংশ উট পূজা করিত। পরবর্তীকালে ইশ্মায়েলের ছেলেরা উট পূজা করিলে বিস্ময়ের কিছু নাই। নবী সালেহ উটের নবী ছিলেন। ভাবিয়া দ্যাখো বন্ধুগণ তাহা কিরূপে হইল। সালেহ মরিয়া গেলে মরুমর্তে তাহার কবর

হয় নাই। সে কালো মরুতে আশ্রয় পায় নাই, মরিলে লোকেরা তাহার মৃতদেহ উটের পিঠে চাপাইয়া দিয়াছিল। উট মৃত সালেহকে পিঠে লইয়া মারি পাহাড় কি গিলিয়দ পাহাড়ের কোলে চলিয়া গেল। তিন দিন তাহাকে আর দেখা গেল না।

তিন দিন বাদে উট ফিরিলে দেখা গেল মৃতদেহ উহার পিঠে নাই। উটের পিঠে একটি কুঁজ হইয়াছে, মৃতদেহ কুঁজের মধ্যে রহিয়াছে, উহাই সালেহের সমাধি। মরুমর্তে জমি না পাইবার ইহাই এক করুণ কাহিনী। এই কাহিনী আব্রাহামের পরে ঘটিয়া থাকিবে। ভাবিয়া দ্যাখো, কত আগে আদিপিতা ইফ্রোন কিরূপ সদয় ছিলেন। আব্রাহামের পত্নী সারি মরিয়া গেলে ইফ্রোন সমাধির জন্য নিজের ক্ষেত্র ছাড়িয়া দিলেন। এমন কি আব্রাহাম মরিলে পত্নীর পাশে মকপেলায় তাঁহার কবর হইল। তবু মনে রাখিও আব্রাহাম ইফ্রোনকে ঘৃণা করিতেন। খেতাকে অন্তর হইতে চাহিতেন না। শুনা যায়, ইফ্রোন কবরের মাটির জন্য আব্রাহামের নিকট একশো কসিতা (মুদ্রা) দাবি করিয়াছিলেন। করিতেই পারেন, কেননা আব্রাহাম স্বেচ্ছায় মুদ্রা না দিয়া পারিতেন না, কারণ মাটি খরিদ না করিয়া মুর্দাকে শোয়াইতে নাই।

এই উপকার সম্রাট দাউদ কোনও কালে স্মরণ করেন নাই। শুধু এইটুকু ওই প্রচার-পুস্তিকায় ছিল। কিন্তু আজ ? চরম বিদ্বেষ মুখেই প্রকাশ করে ফেলল রাজা ইষানুল।

আবার ডেকে উঠল ডাক-হরিণ। শলোমন বুঝতে পারছেন না কোথায় ডাকে পশুটা। যার কপালের মাংসের ভাঁজে কস্তুরী জন্মায়, সে ডাকে কুকুরের মতো ! একটা হরিণ কুকুরের মতো ডাকে ! এর চেয়ে বীভৎস-বিস্ময় আর কী হতে পারে ! কুকুরের মতো কেন ? কেন পাখির মতো নয় ? ডাকতে পারত গোবৎসের মতো ! তার গলায় অশ্বের হ্রেষা থাকলেও ক্ষতি ছিল না।

কস্তুরী-ঘ্রাণে পাগল হয়ে ডাকছে মাঝে মাঝে। তারপর ঘন ঘন ডেকে কিছুক্ষণ বেশ থেমে থাকছে। বালির স্তূপের আড়ালে চলে গেল পশুটা, তারপর কূপের দিকে এগিয়ে একটি এরস গাছের পিছনে, তারপর টিলার উপর উঠল। সম্রাটকে এভাবে ছুটিয়ে বেড়াতে লাগল ভূমরু-চরাচরে।

আজই মহোৎসবের রাতে সম্রাট এত নিঃসঙ্গ এবং উত্তেজিত কেন ? নাথনগোষ্ঠী চিরকালই বাবা দাউদকে অভিযুক্ত করেছেন। অভিযোগের কতখানি সত্য ছিল ? কী ঘটেছিল বাস্তবে ? দাউদ সামর্থ্য ও সম্পদ থাকা সত্ত্বেও জিরুজালেমে কেন সদাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করেননি ? বনি ইস্রায়েল চিরকাল একটি মন্দিরের স্বপ্ন দেখেছে। সীনয় পাহাড়ে মরুপ্রান্তরে অগ্নিসংকেতকারী ঈশ্বর মোশিকে যে উপদেশ দেন, তা দু'খানি প্রস্তরে উৎকীর্ণ ছিল। সেই প্রস্তর দু'খানি ঈশ্বর-সিন্দুকে সুরক্ষিত থাকলেও, এই সিন্দুক আর্যরা ছিনিয়ে নিয়ে সাত মাস নিজেদের কাছে রেখে দেয়। বাবাই সেই সিন্দুক প্যালেস্টাইনি আর্যদের কাছ থেকে উদ্ধার করেন। বনি ইস্রায়েলদের ঈশ্বর আছে, কিন্তু মন্দির নেই। ঈশ্বর-সিন্দুকটিকে তারা যত্নে সাজিয়ে মরুভূমির বুকে বয়ে বেড়াচ্ছে কতকাল। কিন্তু মন্দির ?

সামর্থ্য বাবার ছিল। তিনি মন্দির নির্মাণের জন্য যাবতীয় আয়োজন এবং সমারোহ করেন। তারপর সেই অভিলাষ ত্যাগ করেন কেন ? উরিয়-হত্যা এবং যুদ্ধের কালিমা তাঁর দুই হাতকে প্রলিপ্ত করেছিল বলে ? সেই হত্যা ও যুদ্ধ কেমন ছিল ?

হায় লোত, অভিশপ্ত লোত, তোমার সন্তানদের তুমি কোথায় ফেলে গেলে, কোন মরুমর্তে রেখে গেলে তাদের ? হায় বিষণ্ণ উরিয়, হায় হতভাগ্য খেতা, তুমিই বা কেন জন্মেছিলে ? তুমি কি বৎসেবাকে ভালবাসতে না ? তুমি কি বৎসেবার জন্য গায়কগোষ্ঠীর কাউকে কখনও বলনি ? বলনি যে, তারা বৎসেবার স্বামী-প্রণয় বা উরিয়কে পাওয়ার জন্য পূর্বরাগের গান বাঁধিবে ?

মনে পড়ে, আব্রাহামের ভাইপো লোত কিভাবে অভিশপ্ত হয়েছিলেন ? লোতকে সঙ্গে করে কেনানের শিখিমে যখন প্রবেশ করেন আব্রাহাম, তখনও সবই ঠিক ছিল। কিন্তু অবশেষে পশুধন আর সম্পত্তির বিবাদ তো চিরকেলে ব্যাপার। লোতকে কিছু পশুধন ভাগ করে দিয়ে মরুভূমির বুকে নির্বাসিত করেন অব্রাম। স্বার্থের ধূলিকণায় আচ্ছন্ন এই মরুভূমির মহাকাশ। লোতের সঙ্গে বসতি নিয়ে বিবাদ করেন দিব্যতন্ত্রী আব্রাহাম।

কিন্তু কী আশ্চর্য দুর্ভাগ্য লোতের যে, মরণ-সমুদ্রের তীরে পশুদল নিয়ে পড়ে থাকা তাম্বুধারী লোত একদিন দেখলেন, আকাশ থেকে নুন বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড় আগুন উগরে তুলছে। এই দুর্যোগ কেন ঘনিয়ে উঠল সেদিন ? শোনা যায়, লোতের জনপদ সেদিন পাপে ভরে গিয়েছিল। নগরের মানুষরা হয়ে উঠেছিল সমকামী। সকলে সমকামী কোনও কালে হয় না, সমকামী কিছু লোক হয়।

এই দুর্যোগের জন্য সমকাম বা ব্যভিচারই কি যথেষ্ট ছিল ? শলোমন বুঝতে পারেন না, লোতের আকাশ সেদিন কেন অত ধূম্রজটিল এবং অগ্নিকটু হয় আর নুনের বৃষ্টি হতে থাকে। পাহাড়, যে-পাহাড়ের উপত্যকা ক্ষুদ্র (সোর) হলেও তখনও নির্মল, সেদিকে ছুটে পালাতে থাকেন সপরিবারে লোত। ছুটতে ছুটতে তাঁর স্ত্রী পিছিয়ে পড়েন।

দেবদূতরা নাকি লোত পরিবারকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, ছুটে পালাবে কিন্তু পিছনে ফিরে চাইবে না, শাপ লাগবে। লোতের স্ত্রী পিছনে ফিরে দেখতে চেয়েছিলেন কিভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে তাঁর মরুভূমির পশুধন। তাঁর তাঁবু, তাঁর চুলা, তাঁর গাছপালা, তাঁর বসতি। [আদম বললেন আদিপুস্তক লোতের স্ত্রীর মনোভাবের কথা লেখে না]।

লোতের স্ত্রী পিছনে চাহিবামাত্র গন্ধক-বৃষ্টিতে পুঁতিয়া লবণ-মূর্তি হইয়া গেলেন। ইহা অভিশাপ। ভূমিকম্প, পর্বতের অগ্ন্যুৎপাত, ঝড়, গন্ধক-বৃষ্টি অভিশাপ সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঁচিয়া গেলেন লোত এবং তাঁহার দুই কন্যা-সন্তান। সোর পাহাড়ে লোত বাসা বাঁধিলেন। কেন বাঁচিয়া থাকিলেন সকন্যা লোত ? ওই পাহাড়ে তো আর কোনও জনমানব ছিল না। এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা, সর্বস্বান্ত এক বিভীষিকা লোতের সঙ্গী।

কটু গ্যাঁজানো দ্রাক্ষারসের নেশা ছাড়া অভিশপ্ত লোতের সম্মুখে আর কোনও ভবিষ্যৎ ছিল না। এই লোক তো অব্রামের মতোই কোনও স্বপ্ন বুকে করে উর ছেড়ে এসেছিলেন ? এই মরুভূমি কেন তাঁকে সর্বস্বান্ত করেছিল ? একথার উত্তর কোথায় পাবেন শলোমন ? কে দেবে উত্তর ?

মানুষের পুরাণ-ইতিহাস কখনও অভিশপ্তের পক্ষে কথা বলে না। কেন ? উন্মাদ লোত নেশার ঘোরে কী করলেন ? হে মধুপ-গুঞ্জিত রাত্রির জ্যোৎস্না-পুলকিত

দ্রাক্ষালতা (জ্যোৎস্নার তীব্রতায় মৌমাছি ভোর হয়েছে ভেবে মধু-সংগ্রহে ব্যস্ত) তুমি ক্ষমা কর। ওই যে দূর পাহাড়স্থলীর নুন-প্রতিমা, তুমিও ক্ষমতা কর জননী। ওহে উন্মাদ ডাক-হরিণ আমাকে ফিরে যেতে দাও ! আমি কে, বলে দাও !

শলোমন লোক-পুরাণ থেকে আবিষ্কার করেছেন এক আশ্চর্য সত্য এবং সংগ্রহ করেছেন অত্যাশ্চর্য ঘটনা। নবি এবং রাজারা তাঁদের পাপ মোছার জন্য অভিশপ্তকেই ব্যবহার করেছেন। আব্রাহাম ব্যবহার করেছেন অভিশপ্ত পুত্র ইশ্মায়েলকে। ইসহাক অভিশাপ দিয়েছেন পুত্র এষৌ বা ইদোমকে। লোতের বংশকে ব্যবহার এবং ধ্বংস করেছেন দাউদ। কেন ? না, তারা অভিশপ্ত ছিল। কেন অভিশাপ ?

কারণ, উন্মাদ মদিরাচ্ছন্ন লোত তাঁর দুই কন্যার গর্ভ সঞ্চার করলেন সোর পর্বত-উপত্যকায়।

—তুমি এ কী করলে লোত ?

—আমি জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না শলোমন ! আমাকে কন্যারা প্রলুব্ধ করেছে। মন আমার বিষণ্ণ, হৃদয় শূন্য, আমি তাড়িত, আমি কেন শেষ হয়ে যাব ? কন্যারা বলেছে, ইতিহাস এখানে শেষ হতে পারে না বাবা ! আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি, পারিনি। এবার পারব, নিশ্চয় পারব।

—তুমি ব্যক্তিগতভাবে কী করবে, তাতে আমার আগ্রহ নেই লোত।

—আমারও তাঁবুস্থলী ছিল শলোমন, আমার হাতে আষা ছিল, বিশাল পশুবাহিনী ছিল আমার ! আমার অস্থি আর মাংস কোথায় গোপন করে রেখে যাচ্ছি আমি ?

—কন্যাগর্ভে অভিশাপ জমা করলে তুমি।

—বিজয়ীর জোয়াল কে বইবে শলোমন ? কার কাঁধ অত চওড়া হবে ? আমি কাকা অব্রামের দাস ছিলাম। একথা তোমাকে তুষ্ট করে ? যদি করে, আমি তবে দাসানুদাস, আমার মাংস এবং অস্থি এই সোর পর্বতে রেখে যাব আমি।

—তুমি চুপ কর লোত, আমি নিরস্ত্র।

ডাক-হরিণ আবার কুঁই কুঁই করে ডেকে উঠল। এবার অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে সম্মুখে পাগলের মতো ছুটতে শুরু করলেন শলোমন।

আদম বললেন, ওহে লিপিকার লেখ, উরিয়কে কে খড়্গাঘাতে হত্যা করে ? সম্রাট দাউদ ধর্ষণ দ্বারা বৎসেবার গর্ভ সঞ্চার করেন। একথা গোপন করেছেন বৎসেবা স্বামীর কাছে কিন্তু দাউদের কাছে প্রকাশ করেছেন। তখন দাউদ ওই গর্ভের সন্তানের দায়িত্ব উরিয়র কাঁধে চাপানোর জন্য তাঁকে মদ খাইয়ে স্ত্রী-সহবাসে পাঠানোর পরিকল্পনা করেন। একজন সৈনিক তখন যুদ্ধকে এতই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন যে, মত্ত অবস্থাতেও সম্রাটের অনুমতি পেয়ে স্ত্রী-সহবাসে যাননি, অন্যান্য সৈনিকদের সঙ্গে সৈন্যাবাসে রাত্রি কাটিয়েছেন।

অবৈধ-সন্তান গর্ভের মধ্যেই বিনষ্ট হোক এই প্রত্যাশায় ইলোহের কাছে দাউদ কি প্রার্থনা করতেন ? নবি নাথন এই ঘটনায় সবচেয়ে রুষ্ট হয়েছিলেন। শলোমনের মন কখনও ভাবে, ওই সন্তান তিনি নিজে, এই সংশয়কে নাথনপন্থী কেউ কেউ প্রতিষ্ঠা করতে চায় কেন আজ ? নাকি বৎসেবার গর্ভের সন্তানটি উরিয়েরই ঔরস ? নাকি সেই সন্তান বৎসেবার গর্ভে বিনষ্ট করা হয় ? এবং তারপর অম্মোন-বংশের কোনও সেনাকে লাগিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে খড়্গ দ্বারা উরিয়কে বধ করা হয়। এ নিশ্চিত যে, কোনও

অম্মোন-সৈন্যই উরিয়ের ঘাতক।

উরিয়ের মৃত্যুর পর বৎসেবাকে পুরো অধিকার করেন দাউদ, তারপর বৎসেবার গর্ভে শলোমন উৎপন্ন হয়েছেন। একথা কি সত্য ? কে তিনি ? এই সংশয় শলোমন নিজেই কি সৃষ্টি করেছেন ? নাকি উরিয়-হত্যা ঘটনা চাপা দিতেই ঘটেছে ? অম্মোন কে ? লোতের কনিষ্ঠ-কন্যার গর্ভজাত সন্তান অম্মোন। জ্যেষ্ঠ কন্যার পুত্র মোয়াব।

লোত অভিশপ্ত। অম্মোন কি অভিশপ্ত নয় ? শলোমন কি মাকেও ঘৃণা করেন ?

সৈনিকের পবিত্রতা বলে একটি কথা চিরকালই শোনা যায়। যুদ্ধকালে স্ত্রী-সহবাস নৈতিকভাবে নিষিদ্ধ ছিল সেদিন, উরিয় তাঁর দৈহিক শুচিতাকে যুদ্ধেই উৎসর্গ করেন। একথা ভাবলে এক তীব্র কষ্ট শলোমনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই পবিত্রতার কী মূল্য দিয়েছিলেন দাউদ ? স্ত্রী-সহবাসে পাঠানোর জন্য উরিয়কে মদ্যপান করানো, এই চড়া নাটক অভিনীত হয়েছে এই মরুভূমিতে। কারণ তখন বৎসেবার গর্ভে দাউদের সন্তান এসে পড়েছে। বললেন আদম। কিন্তু মনে কর শলোমন, সম্রাটের যে-কোনও নির্দেশই পবিত্র। উরিয় মত্তাবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করেন। এই আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দিতে পার না।

নাথন জানতেন সমস্ত ঘটনা। এমন তো হতেই পারে বৎসেবার গর্ভে উরিয়ের সন্তান থাকাকালীন সম্রাট দাউদ বৎসেবাকে গমন করেন। অতএব আসল ঘটনা বৎসেবা জানতেন, মরুভূমির ধূলিকণা কিছুই জানে না। নাথন কি সাহায্যকারী ? বৎসেবার গর্ভের সন্তানকে বিনষ্ট করার পরামর্শ দাউদকে তিনিই দিয়েছিলেন। আদতে কী ঘটেছিল তুমুল যুদ্ধের কালে, রাজাবলির সেই গোপন কথা নানাভাবে এখন কল্পনা করে নিতে হয়।

হাবিল-কাবিলকে দু'টি উত্তম কথা শলোমন বলতেই পারতেন। বলতে পারতেন— সবই গুজব। এ কথায় কান দিও না। নাথনের পুস্তক সাক্ষ্যস্বরূপ। তিনি আমার জন্মের বৃত্তান্ত লিখেছেন। যে-কেউ ইচ্ছে করলে সেই গ্রন্থ পড়ে নিতে পারে। আমি দাউদেরই সন্তান, বৎসেবার গর্ভে উৎপন্ন হয়েছি। বৎসেবার গর্ভপাত সত্য হতে পারে বা ওই সন্তানকে জন্মের পর সদাপ্রভুই আঘাতে বিনষ্ট করেন। কারণ ওই সন্তান অবৈধ ছিল। আমি তারপর মায়ের গর্ভে এসেছি। এ সত্য, এ সত্য, এ সত্য। কিন্তু পাছে ওই অবৈধ সন্তান বেঁচে যায় সেই ভয়ে দাউদ উপবাস করতেন এবং শিশুটি মারা গেলে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উপবাস ভঙ্গ করেন। নাথন এই সবই লিখেছেন।

মরুভূমির অভিশাপ লোত, লোতের ছায়ামূর্তি বলে উঠলেন— রাজকাহিনী লেখার লোকের অভাব কোনও কালেই হয়নি হে পুত্র, তোমাকে পুত্র বলেই সম্বোধন করছি শলোমন !

—আজ্ঞে !

—নাথন চিরকালই রাজপরিবারের বন্ধু ছিলেন, তাঁর নবুয়ত (নবিত্ব)-এর জন্য দাউদের প্রশ্রয় এবং প্রশংসা— দুইই দরকার ছিল মনে রাখবে, নাথন নিরপেক্ষ নন। খানিকটা অভিনিবেশ দাও, লক্ষ কর নাথনের রচনার ওই অংশে দাউদের প্রতি ঘৃণাও কী কোমল। নাথন দাউদকে সমর্থন করেননি কিন্তু বিরোধিতাও করতে পারেননি স্পষ্ট করে। গর্ভপাত সমর্থন করেছেন বইকি ! কিন্তু গর্ভপাত কি সত্যিই হয়েছিল ?

আশ্চর্য যন্ত্রণায় মাথায় ভিতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল শলোমনের। ভেবে পাচ্ছেন না, একটি মিথ্যা রটনাকে কেন তিনি মাঝে মাঝে সত্য মনে করছেন ! এ তো রীতিমত কুৎসা।

—দ্যাখ লোত, তুমি অভিশপ্ত হতে পার, আমি নই। আমি রাজা, আমি রাজচক্রবর্তী, সারগন ! আমি পারিবারিক বন্ধু, পিতার উপদেশক নাথনকে, স্বর্গীয় নাথনকে অবিশ্বাস করি না, করে লাভ নেই। আমি তাঁর দুই পুত্রকে রাজকার্য দিয়েছি। একজনকে কোষাধ্যক্ষ প্রধান করেছি, অন্যজন রাজমন্ত্রী !

—সবই সত্য !

—তবে একথাও সত্য লোত যে, অভিশপ্ত তুমি, তোমার কন্যার গর্ভজাত অম্মোন এবং এক অম্মোনীয় বীর উরিয়কে হত্যা করেছেন। হত্যার কাজে ব্যবহৃত এই অম্মোন কিন্তু নিজেও রক্ষা পায়নি। দাউদের নির্দেশে সেই অম্মোনকেও হত্যা করা হয়।

—তুমি শলোমন ; তুমি শান্ত। তুমি উত্তেজিত হও কেন ? তুমি জানো যে, তুমি মাটির সরসতা এবং আকাশের সুনির্মল শিশির-কণা থেকে উৎপন্ন হয়েছ ; তুমি সুন্দর। মানবী-গর্ভ না পেলেও তুমি জন্মাতে। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি পুত্র !

শলোমন দেখলেন একটি ছায়ামূর্তি পাহাড়-চূড়ায় দাঁড়িয়ে আর্যা হাতে আকাশে হস্ত প্রসারিত করেছেন এবং কথা শেষ করেই শূন্যে চলে গিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেলেন।

তখনই আবার ডেকে উঠল ডাক-হরিণ। কুকুরের মতো ডাকলেও কুকুরের ডাকের সঙ্গে এর পার্থক্যও আছে। এই স্বরের পার্থক্য শলোমন জানেন। পশুপাখি, কীটপতঙ্গের স্বভাব, আচার-আচরণ, ধর্ম এবং জীবন পর্যবেক্ষণের এক নিবিড় বিদ্যা তাঁর জানা। মনে হয় তাঁর শরীরের কোথাও কোনও সংকেত গ্রহণের ধী-ঘড়ি বসানো রয়েছে, ছায়াঘড়ি যেমন সূর্যের খবর দেয়, সেই রকম ধী-ঘড়ি শলোমনকে দেয় পশুপাখিপতঙ্গের সংকেতাবলী এবং প্রকৃতির বিশদ সব ইশারা।

এই শাম এবং রামের আচরণ থেকে তিনি ভূমিকম্পের খবর পেয়েছিলেন। ঘোড়ার খুরে থাকে ভূমিকম্পের আগাম-তরঙ্গ। সেই সংবাদ তিনি প্রচার করে চার বছর আগে মানুষজনকে রাত্রে প্রান্তরে শুয়ে থাকতে বলেছিলেন। মানুষ বেঁচে যায়।

ইঁদুরের লাল মুখে থাকে মারীর সংকেত। শলোমনের ধারণা মোশি যখন তাঁর সঙ্গী ইলোহের খাস বান্দাদের কাবুসের জোয়াল থেকে মুক্ত করার জন্য মিশর থেকে টেনে বার করে আনেন তখন তিনি মারীর খবর ইঁদুরের মুখে পান। মিশরে মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ নিশ্চয়ই হয়েছিল। মোশির মহানিক্রমণ (মহাযাত্রা) ঘটেছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে। রাত্রির আকাশ ছিল অগ্নিময়, দিন ছিল মেঘাবৃত। এই মেঘ স্বাভাবিক ছিল না। রাত্রির আকাশও ছিল অস্বাভাবিক আগুনে ভয়াবহ।

নোহও নিশ্চয়ই ছিলেন প্রকৃতিবিদ। নইলে তিনি কী করে জানলেন মিশরে সাত বৎসর অনাবৃষ্টি হবে ! তারপর মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে নীল নদী। কী করে, কী করে ? যেমন শলোমন বৃষ্টির খবর বেশ কিছু আগে থেকেই বলতে পারেন ; মেঘের খবর পাওয়া যায়, কালো অতি ক্ষুদ্র নির্বিষ পিঁপড়ের মুখে। মনে রাখা দরকার, কোনও বিষযুক্ত পিপীলিকা মেঘ সম্বন্ধে পূর্বাভাস করতে পারে না। লাল পিঁপড়েরা তত অনুভূতিশীল নয়। মানুষের শরীরে ক্রোধ হল বিষের মতো, তা মনকে অশান্ত করে এবং গভীর অনুভূতি নষ্ট করে দেয়।

কালো পিঁপড়েরা নির্বিষ না হলে এবং অতিশয় ক্ষুদ্র না হলে মেঘের গন্ধ আগে থেকে পেত কী করে ? এই গ্রীষ্মে অশ্বারোহী সম্রাট চলেছেন ইফ্রোন উপত্যকায় মকপেলা গুহার কাছে কৃষ্ণ পিপীলিকা সন্দর্শনে, দেখতে চলেছেন সেই মহাবিস্ময় । কৃষ্ণ পিপীলিকা ক্ষুদ্র, তাদের মুখে ক্ষুদ্রতর মুক্তোবৎ ডিম । এই ডিমগুলিকে বহে নিয়ে তারা সুড়ঙ্গের গভীরে অন্তর্ধান করে— এই একটি মহৎ দৃশ্যের জন্য অপেক্ষা । সারা গ্রীষ্মে এই নিরাকুল প্রতীক্ষা সারগনের ।

এত ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছের প্রতি দৃকপাত যে শলোমন করতে পারেন, এক প্রভু এল্ ছাড়া কেউ ভাবতে পারেন না সে কথা । আকাশের চন্দ্রিমা বলতে পারেন সমুদ্র-নদীর জোয়ার কখন আসবে । মানুষ তুমি বড় জোর চাঁদের ভাষা বোঝার জন্য গণিত অধ্যয়ন করতে পার । চাঁদের সঙ্গে ঋতুমতীর ঋতুচক্রের হিসেব কতকটা একাকার । শোনা যায়, ধর্ষণ-মুহূর্তে ঋতুমতী বৎসেবা শোণিত-মুক্ত হয়েছিলেন ওই পুকুরের স্নানে ; চাঁদের রক্তাক্ততা থাকে না পূর্ণিমায়, তখন তিনি পবিত্রতম । নারী সবচেয়ে পবিত্র-মুহূর্তে গর্ভ ধরেন, পাশব-ধর্ষণে ছিন্ন হয় সহস্র চন্দ্রকলা, হায় ইলোহিম !

মানুষের সব সময়ই দু'টো রূপ । একটি রূপ পোশাকে মোড়া, কেজো চেহারা । আর একটি তার গোপন আত্মরূপ । কিন্তু শলোমনের আত্মরূপ কেমন ? বাবা তাঁর আত্মরূপে কেমন ছিলেন ? [অবশ্য কে আমার পিতা, জানি না ।] সম্রাট দাউদের আত্মরূপ ? একজন বীণা-বাদক, কবি । মুখটা অত্যন্ত নরম আর তাঁর ছিল কোমল সোনালী কেশপাশ, এই মানুষ কি সত্যিই উরিয়-পত্নীকে বলাৎকার করেন ?

এবার মরু-সরণি আকাশ-মুখো, ক্রমশ উর্ধ্বে প্রসারিত হয়ে উঠে যাচ্ছে । এখানেই তলায় উত্তরদ্বার কারমেল গিরিবর্ত্ম । ওই মুখটায় সৈন্য-ছাউনি এবং কর-সংগ্রাহকের ছাপরা আর প্রবেশ-তোরণ । অত্যন্ত কড়া প্রহরা মোতায়েন । ভারপ্রাপ্ত সংগ্রাহক-ব্যক্তিটি একজন ফিলিস্টাইন নব্য আর্য, অত্যন্ত দীর্ঘাঙ্গ এবং অসীম বলবান । খেতা গালিয়াৎ । এই ধরনের মিশ্রনাম শলোমন বিশেষ দেখেন না । শুধু এই নামই সম্রাটকে লোকটা (সদ্য তারুণ্যে ভরপুর, যুবা বলাই যথার্থ)-র প্রতি আকৃষ্ট করেছিল । সমুদ্র-বন্দর টায়ারের হিফাজ নামে এক গ্রামে যুবকটি তার মায়ের সঙ্গে রঙের কাজ করে পেট চালাত । একজন ভাল লিপিকার ।

—তোমাদের রঙের কাজ অত্যন্ত সুচারু, মা-ছেলে দু'জনই কারখানায় যাও ?

—না হুজুর ! বাড়িতেই করি । দুর্গন্ধে নাক পাতা যায় বলুন ! খুব অস্বাস্থ্যকর জায়গা আজ্ঞে ।

—উপার্জন খারাপ নয় ?

—আজ্ঞে ! কিন্তু খাটনি আছে ।

—তোমরা কেনানের আদিবাসী ? মানে ফিনিশিয় কিনা ! রঙের কাজ করছ কি না, সেই জন্যে বলছি ।

—আপনি কে হুজুর । মার্জনা করবেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, জ্ঞানী শুলায়মন, সর্বশ্রী সর্বাধিপতি সারগন, অবশ্যি আপনাকে নবি-প্রতিমাও বলা যায় । আপনি আমাদেরই রঙের পোশাক পরেছেন, বেগনি । ফিনিশিয়া মানে তো বেগনি রঙের দেশ, তাই না ? আর ধরুন, কেনান মানেও ময়ূরকণ্ঠী দেশ । তা ছাড়া মধুদুধের দেশও বলা যায় । কিন্তু মধুদুধে থাকতে হলে অনেক মেহনত ।

—চমৎকার ! তুমি তো দেখছি সবই জানো । নাম কী তোমার ?

—আজ্ঞে, খেতা ! বলে মাথা নিচু করল যুবকটি । সম্রাট লক্ষ করলেন যুবার মায়ের মুখটি কেমন অকারণ শুকিয়ে উঠেছে ।

—তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন ? তোমাদের চেহারাই বলে দিচ্ছে, তোমরা এখানকার নও । পুরো নাম কী তোমার ? তুমি যাই বল, হিত্তীয় নও । মিশরীয় নও ! আগে কোথায়-ছিলে তোমরা ?

—আস্কিলনে হবে বা । যুদ্ধের সময় ...

—চলে এসেছ, মানে পালিয়ে এসেছ ?

—না, আমি তখন মায়ের পেটে, পালিয়ে আসছিল মা আর বাবা ।

—তারপর ?

—বাবা আকাশে চলে গেলেন । পিছন থেকে বর্শা এসে মাটিতে গেঁথে দিল । আচ্ছা, যুদ্ধের কি শেষ নেই কখনও ?

—কই, এখন তো আর কোনও যুদ্ধ নেই, সব শান্ত । বল, পুরো নাম !

—খেতা ... গালিয়াৎ ! বলে চমকে উঠল যুবক । তারপর কাতর গলায় বিনয়ভরা বিস্ময় প্রকাশ করল— আপনি কি আসল সারগন ? বলুন, আপনি আমাদের হত্যা করবেন না ! আপনি কি ছায়ামূর্তি মহামহিম ?

—তা হলে তোমরা আর্য, তাই এত লম্বা । কিন্তু 'খেতা গালিয়াৎ', বড়ই আশ্চর্যের । অথচ তুমি ফিলিস্টাইন । ভয় পেও না, এই প্রত্যুষে দেবদূতের নিঃশ্বাসে আকাশ এবং মাটি পবিত্র, এখন কেউ খাপ খোলে না, অস্ত্র ঘুমিয়ে থাকে । আমার কাছে একটি ছুরি পর্যন্ত নেই । এখন আমি চলে যাচ্ছি, পরে আবার একদিন আসব । তোমাকে কিছু পরীক্ষা দিতে হবে গালিয়াৎ !

—আজ্ঞে আমি খেতা । পরীক্ষা কেন হুজুর !

—তুমি গালিয়াৎ হলেও আপত্তি নেই । ঘরের মধ্যে ওটি কে তোমার ?

—আমার যমজ বোন, দুই দণ্ডের ছোট । আনাথ ওর নাম । বিয়ে হয়েছে ।

—ও, আচ্ছা ! তোমার মতোই সুন্দর বটে তো । ঠিক আছে ! তুমি লেখাপড়া জানো ?

—আজ্ঞে, আমি লিপিকার । ইতিহাস ভালই জানি, কিন্তু ...

—তোমাকে আমি কাজ দিতে চাই ।

এই প্রস্তাব শোনা মাত্র আর্য যুবকটি মাটিতে নুয়ে শলোমনের পা স্পর্শ করতে গিয়ে বুঝল মানুষটির পা দু'খানি ফিতেয় ঢাকা পাদুকায় ঢাকা পড়েনি, পায়ের আকৃতি আর আঙুলগুলি অসুন্দর, অতিরিক্ত লম্বা । শোনা যায়, মহামহিম এই সারগনের পা সুন্দর নয় । কিন্তু মুখের সৌন্দর্য অপূর্ব ; চোখের কোনও তুলনা নেই, কিছুটা খাদে ঢোকানো এবং অত্যন্ত ভাবাচ্ছন্ন, স্ফটিক-কয়রা এই অক্ষি দিগন্তাভিসারী, দূরদর্শী । সম্রাট দাউদের সঙ্গে এই সৌন্দর্য-মদির দৃষ্টির তফাত অনেক । শলোমনের মাথার চুল দাউদের মতো সোনালি নয় ।

—আপনি রাজাধিপতি, মহা নৃপতি শুলায়মন, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু !

—আরে আরে গালিয়াৎ, এ কী করছ তুমি, আমার নোংরা পা, ছোঁবে না, মরুতাপে, বালিতে যাচ্ছেতাই অবস্থা, তা ছাড়া এ কোনও রাজদরবার নয়, এখানে এসব কেন ?

শোনো গালিয়াৎ ...

এবার ষাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ে গেল খেতা। বলল— শুলায়মনি চোখ, আমি যে দেখতে পাব, কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি নরদেবতা সারগন!

—নাহ্! কখনওই নরদেবতা বলবে না আমাকে। আমি মানুষ। আমি কখনও খোদার উপর খোদকারি করিনি। আমি ঈশ্বরের কাছে দীর্ঘ পরমায়ু চাইনি। আমি কাবুসের মতো মানুষের অমরত্ব নিয়ে ভাবি না। আমার স্পর্ধা কখনও পিরামিডের মতো আকাশছোঁয়া নয় গালিয়াৎ।

—আমি খেতা, হুজুর! গালিয়াৎ কথাটা আমি ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছি। ইতিহাসের ভূত চড়ে আছে আমার কাঁধে।

—আচ্ছা, বেশ বেশ। তুমি খেতা, তুমি গালিয়াৎ নও। ঠিক আছে, ওঠো এবার। তোমাকে আমি আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে বহাল করতে চাই। এরপর তোমাকে আর রঙের কাজ করতে হবে না। কিন্তু শোনো, খেতা নামটাও কেনানীরা ঠিক তত পছন্দ করে না, ওটি মিশ্রীয় লব্জো। তুমি জানো নিশ্চয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে বাবা নিশ্চয় খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। নইলে ছেলের এমন নাম দেবেন কেন? আমি যখন পেটে তখনই বাবা আমার নাম দেন খেতা। আমি আর্য কিনা জানি না, মিশ্রীয় নই বুঝি। আমরা কারিগর মহামতি। আমরা খেয়ে পরে বাঁচতে চাই। দেখুন, আমার চেহারাটাই এমন ... লজ্জা করে! তা বলে আমার কোনও রক্তমাংসের অহংকার নেই। আমার রক্ত এবং মাংস আমি চিনি না! চিনতে চাই না।

বলতে বলতে খেতার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। লক্ষ করলেন সম্রাট শলোমন। তারপর দাউদ-পুত্র নিজের গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন— তোমার হৃদয় যেন সত্য বলে খেতা! রক্তের নিয়ম, মাংসের অনুজ্ঞা, সবই খুব দুর্বোধ্য বৎস। মিশরে আমরা দাস ছিলাম, তুমি হয়তো নও, আমি ছিলাম, মানে আমার পূর্ব মাংসরক্ত ছিল একদিন, দাস। তাই না?

—আমি ঠিক বুঝলাম না। আমি ...

—আমিও বুঝি না সবখানি। আমি তো মোশি নই। আমি লেবিবংশ নই। আমি মরুভূমির বারো বংশের (বারোটি গোষ্ঠীর) কতটুকু, ঠিক কতটুকু আমি? আসলে আমি কে?

—আপনি সারগন, আপনি নবি-প্রতিমা, আপনি দিব্যতা স্বয়ং।

—আমি রাজা এবং নবি, তাই না, গালিয়াৎ? হা হা হা! আকাঙ্ক্ষা খুব দুর্মর! শোনো, আমি মিশরকে ভালবাসি, তুমি ভয় করো না। তোমার হৃদয় যেন সত্য বলে খেতা গালিয়াৎ। চলি এখন। এই যে আমার মিশ্রীয় শুভ্রাশ্ব, এ হল রামাসীস, এ কাবুস রাম, এ কিবতি রাম। এ খেতা-কৌমের জীবন! একে প্রশ্ন কর, এ আসলে কে? চলো রাম, আমরা যাই। আমি রামকে বলি, তুমি ক্ষুর ঠুকে বলে দিও কবে ভূমিকম্প। ব্যাস! তোমার সংকেত মূল্যবান। আত্মসংকেতের সমষ্টিই আসলে মানুষ।

সাদা অশ্ব তারপর গালিয়াতের চোখের সামনে থেকে এক লহমায় উধাও হয়ে গেল। খেতা তার চোখ দু'টিকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। অনেকক্ষণ সে ঝিমধরা হৃদয়ে উড়ে যাওয়া অশ্বের গতিপথ মরু-সরণির দিকে হতবাক হয়ে নিষ্পলক চেয়ে

রইল। কী যেন সব ঘটে গেল এই অনতি-স্পষ্ট উষার আলো-আঁধারির সন্ধি-সুষমায়। সম্রাট যে সম্রাটই সন্দেহ নেই। তবু আবির্ভাব যেন দেবদূতের মতো দৈব-লভ্য দৃশ্যের আঙিনায় ঘটে গেল।

দূরের পথ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে মায়ের দিকে চাইল খেতা। তার মনে হল, মানসিক চাপে মাকে কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছে, মা এতক্ষণ ঠকঠক করে কাঁপছিল। আনাথের চোখে নিষ্পলক ভয় আর ঘন বিস্ময়।

মায়ের কাছে এগিয়ে গেল খেতা। মা ভয়েই সন্তানের দু' হাত আঁকড়ে ধরে ডুকরে উঠল— তুই যে গালিয়াৎ, একথা বলতে গেলি কেন খোকা! এখন কী হবে!

—কিছুই হবে না মা! তুমি আগে দেখোই না, আমি কোনও ভুল করিনি। মিথ্যে বললে বরং খারাপ হত।

—তা-ও ভাল যে, তুই যে রাজার ছেলে সে কথা চেপে গেছিস!

—তা-ও কি বলতে আছে! এখন রঙের কারিগর আমরা, ও-কথা আর মানায় না। তা ছাড়া আস্কিলনের রাজাকে বধ করেছেন দাউদ, খামোকা সেই কথা বলে মরি আর কি! দ্যাখো মা, এই মরুভূমিতে সবাই যোদ্ধা, কেউ এক নরুন মাটি ছেড়ে কথা কয় না। আমি গালিয়াৎ, নিশ্চয়ই গালিয়াৎ। আমি তবু খেতা— যা হয় না, আমি আসলে তাই!

কোনও গালিয়াৎ কখনও খেতা হয় না। অর্থাৎ কোনও পলেস্টীয় কখনও হিটাইট বা হিত্তীয় নয়। গালিয়াৎরা ভূমধ্য-সমুদ্রের তীরবর্তী সাগর-জাতি আর্য। হিত্তীয়রা উত্তরের পার্বত্য জাতি। কিন্তু কেনানে হিত্তীয়রা অনেক পূর্ববর্তী জাতি। বনি-ইস্রায়েল নানাভাবে হিত্তীয়দের কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু ইতিহাসে কৃতজ্ঞতা স্পষ্ট করে স্বীকার করার নিয়ম নেই। খেতা অর্থাৎ হিত্তীয়দের কাছ থেকে নেওয়া মরুভূমির সভ্যতার দু'টি দান স্মরণযোগ্য। এক. অশ্ব। দুই. লোহা। উটের সভ্যতাকে অশ্ব-সভ্যতায় বদলে দিয়েছে হিত্তীয়রা। অবশ্য সেই কাজটাই শলোমনের যুগে গড়াপেটা হয়ে একটা স্পষ্ট আদল পেতে চাইছে।

কৃষ্ণঅশ্ব শামের পিঠে শায়িত তন্দ্রাচ্ছন্ন সম্রাট শলোমনকে ইতিহাস তাড়া করে ফেরে অবিরত। তিনি ইতিহাসকে পরীক্ষা করেছেন নানাভাবে। তারপর কিবতিদের আবিষ্কার, 'মানুষের হৃদয় চিন্তা করে এবং এই হৃদয়কে সত্যের পালক দিয়ে ওজন করা হবে'— এই চরম ও পরম কথাটিকে গ্রহণ করেছেন। কারণ তিনি মহাপ্রভুর কাছে 'জ্ঞান' ছাড়া কিছুই প্রার্থনা করেননি। তাঁর চোখে মানুষ হল, আত্মসংকেতের সমষ্টি, যে-সংকেত সত্যসম হৃদয় থেকে আসে। সত্য আর হৃদয়কে একাকার করার তপস্যা তাঁরই নিজস্ব কৌশল। আবার এই মানুষই চতুরতা-গৃহে বাস করেন, তাঁর হৃদয় গভীরভাবে সতর্ক।

তিনি ভালই জানেন, কোনও পলেস্টীয় কখনও হিটাইট নয়। কোনও গালিয়াৎ কখনও খেতা হয় না। তবু খেতাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে নিয়োগ করলেন। খেতা গালিয়াৎ হল রাজকর-পথকর সংগ্রাহক অর্ধমন্ত্রী স্বরূপ।

গালিয়াৎ আজ অবধি মাত্র একবারই শলোমনকে প্রকৃত চেহারায় দেখেছে। সম্রাটের সঙ্গে কোনও ছায়ামূর্তি ছিল না। হয়তো এ জীবনে আর কখনও আসল শুলায়মনকে দেখতে পাবে না। না পাওয়াই স্বাভাবিক। শোনা যায়, সাদা রাজপশু

(অশ্ব)-তে চড়ে শান্তি আর উৎসবের দিনে সম্রাট নবিবেশে সাধারণ মানুষের সামনে এসে দাঁড়ান। ইদানীং সন্দেহ করা হচ্ছে, নবিবেশধারী সম্রাটও নাকি আসল শলোমন নন। ওটাও নাকি ছায়ামূর্তি, অন্তত সেই অবিশ্বাস জাগতেই পারে মনে।

সাইমুম বেগে ধেয়ে আসছে ঘোড়াটা। কালো ঘোড়া। কালো ঘোড়ার আরোহী সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর। ইহা কুহকময়, আগ্রাসী। ইহার সামনে ক্ষমা নাই। সম্রাটের কতগুলি ছায়ামূর্তি মরুভূমিতে ছড়িয়ে রয়েছে, কেউই জানে না।

কেনানের উত্তরাঞ্চলের এই উত্তরদ্বার কারমেল তোরণ-শোভিত। সবচেয়ে উপযুক্ত সহস্র অশ্বারোহী সেনা এই অঞ্চল পাহারা দেয়। তারা নানা দিকে ছড়ানো। গিরিবর্ত্মের মুখেই একটি তোরণ বসানো। তারপর বিস্তৃত প্রস্তরমিশ্রিত মৃত্তিকা, দক্ষিণে ঢালু হয়েছে। এই মৃত্তিকার দক্ষিণে আরও একটি উচ্চতর তোরণ। দু'টি তোরণের মধ্যবর্তী স্থান ছাউনি-বেষ্টিত। দু'টি তোরণকেই লক্ষ্য রাখতে হয়। দু'জন করে সহকারী প্রত্যেক তোরণে কর্তব্যরত, তাদের সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যোদ্ধৃবেশে। তারা শুধু তোরণদ্বার-উন্মুক্ত করে দেয়। তার আগে পথিক, ব্যবসায়ী, ভিনদেশী— সকলকেই কর মিটিয়ে দিতে হয় দুই তোরণের কোনও একটির ছাপড়ার কর-গ্রহীতার কাছে। কাঠের তৈরি ঘরটায় ছোট ছিদ্র দিয়ে হাত গলিয়ে অর্থ দিতে হয়।

কিন্তু যে অশ্বারোহী মরুঝড় উড়িয়ে ছুটে আসছে, তার পোশাক দেখেই চেনা যায়, ইনি ছায়ামূর্তি-সারগন। বা ইনিই শলোমন। তোরণ-দ্বার উত্তোলনে বিলম্ব সহ্য করে না কৃষ্ণ অশ্ব। ছুটে আসা গতি রুদ্ধ হলে রক্ষা নেই। ওই অশ্ব দুই তোরণের মধ্যবর্তী মৃত্তিকা-সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব কৌণিক উচ্চ-সরণি দিয়ে ছুটে যাবে উপরে। এখানে পথের শুরুতে রয়েছে আরও একটি মাঝারি তোরণ-দ্বার। এই তোরণে একটি চারপায় খাড়া হয়ে রয়েছে, মানুষের স্কন্ধ-অবধি উচ্চতা। তার উপর যোদ্ধৃবেশে বসে রয়েছে খেতা গালিয়াৎ।

গালিয়াৎ এই দ্বারে একা নয় ঠিক। দু'জন সাহায্যকারী রয়েছে। খেতার হুকুমে তারা দ্বার খুলে দেবে। হুকুম না পেলে খুলবে না। তারা তো হুকুমের মূর্তি। নির্বাক।

দক্ষিণ-তোরণের ঢালে একটি মরু-অশ্বত্থ দাঁড়িয়ে, তার শেকড়ের ফাঁক দিয়ে একটি তীক্ষ্ণ ঝোরা নিচের দিকে বয়ে চলেছে। ইহা চরম বিস্ময়কর। জল কোথা থেকে আসছে কেউ বলতে পারে না। ওখানে একটি বড় এবং উচ্চ ধাতু ফলকে লেখা—

'পথচারী তৃষ্ণার্তকে জলদান শুধু কোনও ভিস্তিঅলার জীবিকা নয়। মরুমর্তে জল দান করা পবিত্র কাজ। কেবলমাত্র মানুষ নয়, তৃষ্ণার্ত কুকুর, উট, অশ্ব, মেষ, ছাগ, বৃষ এবং মৌমাছি, সকলকেই জল দাও, পিপাসার্ত শত্রুকেও জল দিও।— শলোমন।

ওখানে জলসত্র রয়েছে। জল ধরে ভিস্তি ভরে নিচ্ছে একটি সুন্দরী মেয়ে। ওর কাজ তৃষ্ণার্তকে জল দেওয়া। সন্দেহ করা হয়, মেয়েটি বেশ্যা। কিন্তু মেয়েটির কোনও খারাপ আচরণ দেখা যায় না। তবে বড্ড রসিকে, সৈন্যরা ওর সঙ্গে কত প্রকার রসালাপ করে। ও রাগ করে না।

পথের আর একদিকে, ঝোরার উল্টোদিকের পথের কিনারে আরও একটি চমৎকার ধাতু-ফলক। তাতে লেখা, 'মনে রেখো, এক দেহোপজীবিনী এই মরুমর্তে কূপ থেকে পায়ের জুতা দড়ি দ্বারা নামাইয়া দিয়া জল তুলিয়াছিল এবং একটি পিপাসার্ত সারমেয়কে জল দিয়া বাঁচাইয়া দেয়। ওই নারী উত্তর-নক্ষত্র ধ্রুবা জহুরা, এখানে দাঁড়াইলে পর্বত-শৃঙ্গে উহাকে দেখিতে পাইবে। মকপেলার মাথায় উহা সম্রাটকে আকাশ হইতে আলো দেয়, সম্রাটের দুর্গ ধ্রুবা জহুরার আলোয় উজ্জ্বল থাকে রাত্রিভর। ওই নক্ষত্রকে প্রণাম করিও।' বলেছেন, শলোমন। সম্রাট শেষ বাক্যটি বলেছেন— 'চাইলে এই মরুমর্তের আকাশে তুমিও নক্ষত্র হইতে পার।'

ইহা নবি-বাক্য, সম্রাট-বাক্য নহে। একজন সম্রাট এইরূপ বলতে পারেন না। ওই ভিস্তিউলি মেয়েটা অজ্ঞাত-নাম্নী, সৈন্যরা ওকে সারিন বলে ডাকে। আসলে ওকে মহামাতা সারি বলতে চায়। কিন্তু একটি দন্ত-ন লাগিয়ে একটু বিকৃত করে নিয়েছে, ভয়ে। কেননা সামান্য জলদাত্রী মহামাতা হতে পারে না। ও হল, সারিন ধ্রুবা জহুরা, সন্ধ্যা নামলে কী ভক্তিভরে মেয়েটা মকপেলার আকাশে স্থাপিত নক্ষত্রকে প্রথম প্রণাম জানায়, তা দেখে সৈন্যরা সবাই সেলাম জানায় অপার্থিব আকাশ-রমণীকে। গালিয়াৎ নিজেও প্রণাম না করে পারে না, কপালে হাত ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে— দাগোন, দাগোন! অর্থাৎ প্যালেস্টীয় দেবী ডাগন, এই দেবী কেনানীয় শস্যদেবীর অনুকরণ অথবা হতে পারে পূর্বদেশ মেসোপটেমিয়ার দেবী ইস্তারের নকল।

যাই হোক। কালো আগ্রাসী ঘোড়াকে ছুটে আসতে দেখে চিৎকার করে উঠল সারিন। সারগণ! সারগন! সর্বনাশ! খুলে দাও, খুলে দাও। বিলম্বে মৃত্যু, ভাইসব! খেতা, খেতা ঘুমিয়ে পড়লে নাকি!

আঁতকে উঠে গালিয়াৎ চারপায় থেকে নেমে পড়ল। সন্ত্রস্ত সবাই। এ যদি ছায়ামূর্তি হয়, তোরণদ্বার খোলাতে দেরি হলে, নির্ঘাৎ অস্ত্রাঘাত করে মেরে দেবে। একমাত্র সম্রাট শলোমন কখনও মরুভূমিতে রক্তপাত করেন না। এ-কথা খেতাকে কতদিন শুনিয়েছে সারিন।

—তুমি এই বিশ্বাস কোথা থেকে পেয়েছ সারিন! সম্রাট রক্তপাত করেন না!

—কী বলছ তুমি খেতা! তুমি অর্বমন্ত্রী! তুমি জানো না। সম্রাট একটি পিঁপড়েও মারেন না!

—শুনেছি।

—সৈন্যরা সবাই জানে। সারগন পিঁপড়ে, মৌমাছি, কমলা প্রজাপতি সবার ভাষা জানেন। সবার সঙ্গে কথা বলেন উনি। ওঁর কাছে তুমি কখনও অবিচার পাবে না। আমি নিজেই বলতে পারি তোমাকে, আমার বেলা কী করেছিলেন মহামতি সম্রাট! থাক অন্যদিন বলব।

দ্বার খুলে দিতে দিতে খেতা গালিয়াতের মনে পড়ল, শলোমনের বাবা সম্রাট দাউদ তাঁর পূর্ব-পুরুষ বীর গালিয়াৎ-কে কিভাবে হত্যা করেছিলেন। তখন দাউদ ছোকরা মাত্র, একজন মেষ-খেদানো বালক। একজন কবি-রাখাল, সামান্য বালক, বীণাবাদক গাইয়ে শুধুমাত্র ফিঙ্গা-গুলতি দিয়ে বীরকে সাবাড় করে দিল! তাদের শৌর্যের সর্বোন্নত পরাকাষ্ঠা-প্রতীক, বীর গালিয়াৎ। খেতা গালিয়াৎ নয়, সার্বভৌম-বীর গালিয়াৎ, যাঁর ঢাল বইবার জন্য দু'জন ঢালী দরকার হত! ঢাল নিয়ে সামনে এগিয়ে যেত ঢালীরা আর গালিয়াতের সর্বাঙ্গ ভারী বর্মে আবৃত, যার পোশাক গায়ে তুলে পরবার মতো সামর্থ্যও ছিল না সাধারণ সৈনিকের। কিন্তু ঘটনা অদ্ভুত!

ঠিক এই জায়গায়। সঠিক এই জায়গাটা ভুরুর মধ্যবর্তী এই স্থান, এখানে

গালিয়াতের, এই দুই ভুরুর মাঝখানে ফিঙ্গার পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল ছোকরা দাউদ। আশ্চর্য লক্ষ্য-ক্ষমতা। মানুষকে মেরে ফেলতে একটি পাথরই যথেষ্ট। সব গর্ব, সব অহংকার একটি পাথরের আঘাতই সহ্য করতে পারে না। বীর ধরাশায়ী হন।

গভীর মরু-গ্রীষ্মে পুড়ছে মরু-ধরিত্রী। দূর-দিগন্তে ধোঁয়ার মতো জল কাঁপছে। ওই তরঙ্গ মিথ্যা, মগজে শূন্যতা, বুদ্ধি বিকল হতে বসেছে। ওই দাউদ সম্রাট হওয়ার পর আস্কিলনের আর্য-রাজাকে তেড়ে হত্যা করেছিলেন। খেতার বাবার ঘাতক শলোমনের বাবা।

ঠিক এখানে ফিঙ্গার পাথর এসে লাগে। খেতা গালিয়াতের মনে হল, কপালের ভুরু-মধ্য-স্থান সিরসির করছে। আমরু এক অকথ্য ক্রোধ মিথ্যা জলতরঙ্গে কাঁপছে কেন ?

অশ্বের গতি দক্ষিণ-দ্বার পেরিয়ে উপরে ওঠার মুখে এই ঢালের তোরণে এসে শ্লথ হয়ে গেল। একটি ফিঙ্গাই তো দরকার এখন। খেতার কোমর-বন্ধনীর আড়ালে ফিঙ্গা লুক্কায়িত সেই শৈশব থেকে। কী সীমাহীন ক্রোধ জমা রয়েছে হৃদয়ে। সেই হৃদয় কি সত্য বলতে পারে ?

মরুমর্তে যুদ্ধ শেষ হয়েছে এই প্রথম, কিন্তু সুদীর্ঘ যুদ্ধকালের প্রতিক্রিয়া শেষ হয়নি। যুদ্ধের ধোঁয়া এখনও আকাশে লিপ্ত, এখনও জখমি মানুষরা বেঁচে রয়েছে। এখনও ঘা শুকোয়নি কারও। দাউদ কখনও ক্ষমার্হ নন, তাঁকে ক্ষমা করে দুর্বল। তাঁর কূট-কৌশলের চাপে পড়ে এবং অনৈতিক কলুষের আঘাতে রাজা শৌল পাগল হয়েছিলেন এবং পথ না পেয়ে আত্মহত্যা অবধি করেন। শৌলের সিংহাসন কায়দা করে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন দাউদ।

শলোমন সেই ধূর্ত কায়দাকারী দাউদের পুত্র। অধিকতর, ধূর্ত তিনি। ছায়ামূর্তি দিয়ে মানুষকে হত্যা করেন, নিজে করেন না। সারিন, তুমি বুঝবে না আমার গোপন হৃদয়! আমিও জানি সম্রাট মহানুভব, কিন্তু সর্বাংশে তিনি নবি নন। তাঁর কথা আমি নিজের কানে শুনেছি, অতি উপাদেয় সন্দেহ নাই। সারিন তুমি বুঝবে না, একই সঙ্গে একজন মানুষ রাজা এবং পয়গম্বর হতে পারেন না। অথচ মরুভূমিতে সেই চেষ্টাই চলেছে।

তবে আশ্চর্যের ঘটনা এটি যে, মহাজ্ঞানীও ভুল করেন এবং আমার মতো ছদ্ম খেতাকে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। আমার ভুরুস্থান সিরসির করছে কেন ? এ অদ্ভুত নিশ্চয়, ভুরুর মধ্যিখান ছলবল করছে, কেন এমনটি হচ্ছে, কেন ? আমি কেন একটি গোপন ফিঙ্গা সঙ্গে রেখেছি! ভাবতে ভাবতে খেতা গালিয়াৎ মন্থর অশ্বকে তোরণ-দ্বার খুলে দিল।

শামের শিরদাড়া চেতালো। তাতে আরামে মাথা রাখা যায়। কিন্তু এখন সম্রাটের মাথা এক পাশে কিছুটা কাত হয়ে গেছে। সারগন কি ঘুমন্ত ? খেতা বারবার বোঝার চেষ্টা করে সত্যিই এই ছদ্মনবি ঘুমন্ত কিনা। কিন্তু কোথায় গুলতি ছুঁড়বে গালিয়াৎ! ঝালর সরে গেছে, সম্রাটের ললাট ঘামে ভেজা এবং উজ্জ্বল। একটি বোজা চোখ দেখা যায়। দৃষ্টি দেখলে বোঝা যেত শুলায়মনি চোখ বটে কিনা!

আবার সিরসির করে ওঠে গালিয়াতের ললাট, দুই ভুরুর মধ্যভাগ। একটা ঘোর জিঘাংসা বুকের মধ্যে ডেকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে গালিয়াৎ একথাও ভাবে, শলোমন

তাকে বিশ্বাস করেছেন।

গালিয়াৎ বলেছিল— আমি আর্য কিনা জানি না, মিস্রীয় নই বুঝি। আমরা কারিগর মহামতি! আমরা খেয়ে পরে বাঁচতে চাই। ... আমার কোনও রক্তমাংসের অহংকার নেই। আমার রক্ত এবং মাংস আমি চিনি না। চিনতে চাই না।

সম্রাট খুশি হয়ে বলেছিলেন— তোমার হৃদয় যেন সত্য বলে খেতা!

গালিয়াতের কথার মধ্যে কোথাও যে ভান রয়েছে সম্রাট ধরতে পারেননি। নিজেকে গালিয়াৎ কিভাবে আড়াল করেছে শলোমন এতটুকু ধরতে পারেননি, এই কি জ্ঞানের পরিচয় ? মানুষ কি তার মাংস আর রক্তকে ভুলতে পারে! বাবাকে খেতা গালিয়াৎ কখনও চোখে দেখেনি, দেখেনি বীর গালিয়াৎকেও, অথচ তার কোমরে গোপনে গোঁজা রয়েছে ফিঙ্গা!

ফিঙ্গা তাকে কী করতে বলে ? ইতিহাসকে পিছনে টেনে নিয়ে যেতে বলে নাকি! গুলতিকে ছোঁড়ার আগে যেভাবে পিছনে টানা হয়! রক্তের শোধ নিতে বলে নাকি! এক দিকে একটি গোপন ফিঙ্গা, অন্য দিকে গোপন হৃদয়, কাকে সত্য বলবে খেতা গালিগাৎ ? ললাট সিরসির করছে, এ যেন অদ্ভুত ব্যাপার!

কৃষ্ণঅশ্ব শামের পিঠে শায়িত সারগন যত জ্ঞানীই হউন না কেন, জানেন না কর-সংগ্রাহক মন্ত্রী আসলে গালিয়াৎ, বীর গালিয়াৎ। কালো ঘোড়া ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে!

সম্রাট স্বপ্ন দেখছিলেন। স্বপ্নে কী দেখছিলেন তিনি ? এই মহাগ্রীষ্মে দিবাস্বপ্ন! কেন এমন হয় ? তিনি কি এই স্বপ্নে নিজেকে কোনও শিশুরূপে কল্পনা করেন ? শিশু আর পশু সমভাবে বধ্য এই মরুভূমিতে ; শিশু আর পশুবধ্য মরু। বিখ্যাত এক শিশুই তো ছিলেন মোশি, মোজেস!

ধীরে ধীরে উঠছে উপরের দিকে শাম। ইস্রোন-উপত্যকা সন্নিকটবর্তী। রাস্তার দু'পাশ বৃক্ষ-শোভিত। জলপাই, দেবদার অনেক। গায়ে ছায়া মেখে যাচ্ছে সম্রাটের। স্বপ্ন-নিমগ্ন সারগন। স্বপ্নটি বিচিত্র। একটি শিশুর সামনে এক পাশে একটি স্বর্ণপিণ্ড, অপর পাশে অঙ্গারকণা। শিশুটিকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। সোনা, না আগুন, কোনদিকে হাত বাড়িয়ে দেয় শিশুটি। শিশুটি যদি স্বর্ণখণ্ডটি হাত বাড়িয়ে চেপে ধরে, সে হবে দেশের সম্রাট ; যদি সে আগুনে হাত দেয়, তাহলে সে সাধারণ মাপেরই হয়ে দাঁড়াবে ভবিষ্যতে। স্বপ্নটি দেখতে দেখতে শলোমনের একটি হাত পুড়ে গেল।

ঠিক ডান হাতের মুঠোটা দগ্ধে গেছে! তীব্র দাহে আঙুলগুলি যেন ঝলসে গেছে। সম্রাটের ঘুম ভেঙে গেল একটি ডাক-হরিণের আর্তনাদে। এখন দিবালোক। রাত্রিতে ডেকেছিল ডাক-হরিণ। তাঁকে ছুটিয়ে মেরেছিল মরুভূমির প্রান্তরে, পর্বতে, পথে। কিন্তু তাঁর হাত পুড়ে গেল কেন ? স্বপ্নের তো একটা অর্থ থাকবে ? স্বপ্নের অর্থ না করে কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে ?

অশ্বের পিঠে উঠে বসেছেন সম্রাট। হাতটায় এখনও যথেষ্ট যন্ত্রণা। কী দেখলেন তিনি ? কেন দেখলেন ? তিনি তো মোশি নন। এই মরুভূমে শিশুবধ তো চিরাচরিত ঘটনা। সম্রাট শলোমনই এই ঘটনার ছেদ ঘটিয়েছেন। ইস্রোন-উপত্যকার সৌন্দর্যকে বিশিষ্ট করে তুলেছেন তিনি। এখানে তাঁর গোপন দুর্গ 'শৌল' (রাজা

শৌলের নামে) শোভনমান। ঠিক তারই প্রবেশদ্বারে একটি প্রকাণ্ড ধাতু-ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে, 'আব্রাহাম শিশুহত্যা নিষিদ্ধ করেছেন। এখানে শিশুদের পরীক্ষা করা হয় না।'

কথাটি লিখে রাখলেও সম্রাট শলোমন আব্রাহামকে সন্দেহ করেন। এবং আব্রাহামের জন্য অশ্রুপাত করেন। আব্রাহাম কী করেছেন এই মরুমর্তে ? কী তাঁর স্বপ্ন ছিল সেদিন ? তাঁর আলিফের কাহিনীটা কী ছিল সেই আদিতে ? কী দুর্মর ছিল অসীম আকাঙ্ক্ষা তাঁর।

মনে কর শলোমন ! মোশির কথাও মনে কর তুমি। আদম বললেন, আমি পশুবধ আর শিশুবধ দিয়ে আদিপুস্তক রচনা করেছি। আমিই অভিশপ্ত লোত, মোয়াব, অম্মোন, আমালেক, এষৌ তথা ইদম এবং ইশ্মায়েলকে রচনা করেছি।

ইতিহাসের যন্ত্রণা বইবার জন্য আদম শলোমনকে নির্বাচন করেছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি এবং সবচেয়ে দুঃখী সম্রাট তিনি। ক্রমবর্ধমান জ্ঞানই অধিকতর দুঃখের কারণ। একথা আদিপুস্তকে শলোমন-সংহিতায় লিপিবদ্ধ করিয়েছি। শলোমনের গান মধুর, কেননা তাহা সর্বাধিক দুঃখময়। ওই যে তাঁহার আঙুল পুড়িয়া গেল, এই জ্বালা আমিই তাহাকে দিয়াছি।

শিশু অবস্থায় শলোমনকে হত্যার চেষ্টা কেউ কি করেছিল ? তাহাকে দুঃখ দিলাম এইভাবে যে বৎসেবার গর্ভে সে কিভাবে উৎপন্ন হয় তাহা বস্তুত অপরিজ্ঞাত ; এই সন্দিগ্ধ মন জ্ঞানেরই লক্ষণ এবং ইহা নিরসনহীন যন্ত্রণার কারণ। আমি তাহাকে মোশির সম্মান দিই নাই, নবির জীবন তাহার নহে, কিন্তু হৃদয়ে নবির আকাঙ্ক্ষা দিয়াছি। নবির আকাঙ্ক্ষা আর রাজার কর্তব্য। এই দুইটি ভিন্ন পদ একত্র মেলে না। তাহাকে আমি মিলাইবার ভার দিলাম। তাহাকে আমি চতুর করিলাম, তাহাকে আমি কোমল করিলাম। তাহাকে ভোগী এবং ফকির করিলাম, তাহাকে তামসিক ও শুভ্র করিলাম, ধন দিয়া পূর্ণ এবং আসক্ত করিয়া দুঃখ দিলাম এবং হৃদয়কে সৎ করিলাম। তাহাকে সম্মান এবং অপমান সমান করিয়া মাপিয়া দিলাম।

একটি শিশু কিভাবে বিখ্যাত হয়ে ওঠে তা কেবল ইলোহিম রচিত ইতিহাসই বলতে পারে। শিশু মোশিকথা লোকে অন্যভাবেও উক্তি করে বলে। কী বলে লোকে ? রাজা কাবুস তাঁর স্বপ্ন-সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন একটি ক্ষুদ্রাকার সর্প অতি বৃহৎ সর্প এবং পশুদের মুখ হাঁ করে গিলে নিচ্ছে। গেলবার সময়, ক্ষুদ্র সর্প লেজ দ্বারা মৃত্তিকাকে আঘাত করতে করতে বৃহৎ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। কী ভয়ংকর স্বপ্ন।

স্বপ্নবিৎরা কাবুসের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে বলল, মিশরের মাতৃগর্ভগুলি তল্লাশ করা হোক, নারীগর্ভ সন্দেহজনক, সেখানে কাবুসের প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রূণাবস্থায় জাগ্রত। কে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী শিশু, যে কিনা মরুমর্তে এসে কাবুসকে ধ্বংস করে দেবে ? কার গর্ভে সে রয়েছে কেউ জানে না।

বৎসেবার গর্ভও কি সন্দেহজনক ছিল না ? এবং এ কথা ভাবাও কি পাপ ? তাহলে সে কথা ভাবতে বসেছেন কেন শলোমন !

বারবার শলোমন তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর নির্জন দুর্গ 'শৌল'-এর দিকে চেয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। এটি

পাহাড়ের গা কেটে বাবুইপাখির বাসার মতো উল্টো করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জাতীয় শৈলাবাস পৃথিবীর কোথাও নেই। মকপেলা গুহাটি এই দুর্গের সন্নিকটবর্তী। এখানে দাঁড়ালে সারি এবং আব্রাহামের সঙ্গে কথা বলা যায়।

ইতিহাসের সঙ্গে কথা না বলে এক দণ্ড চলতে পারেন না সম্রাট শলোমন। তিনি কিছুদিন থেকেই স্বপ্নের মধ্যে তার হাত পুড়ে যেতে দেখছেন। অথচ কাউকে সে কথা বলতেও পারছেন না। তিনি স্থির করেছেন, কোনও স্বপ্নবিৎকে ডাকবেন না। ওরা সত্য বলে না। বরং ওরা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এই স্বপ্নের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে স্বপ্নবিৎরা বলে বেড়াবে, শলোমনের পতন আসন্ন। নাথনন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সম্রাট শলোমনই পৃথিবীর প্রথম সম্রাট যিনি স্বপ্নবিৎদের তোয়াক্কা করেন না এবং তাদের মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ অনেক স্বপ্নবিদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, স্বপ্নবিচার করার ক্ষমতাকে অনিবার্য নবিক্ষমতা বলে প্রতিপন্ন করার এবং নবি-মর্যাদা দাবি করা। এরাই সম্রাটের পতনকে অনিবার্য করে তোলে।

দুর্গের উচ্চ কক্ষে উঠে শলোমন লোকচক্ষুর আড়াল থেকে তাঁর ভূখণ্ড নিরীক্ষণ করেন। তিনি আজ দেখতে চান নৈঋত-কোণে মেঘ জমল কিনা। ভূমধ্যসিন্ধু মেঘস্থান। আবার ঈশান-কোণেও মেঘ জমে। কিন্তু ঈশানের মেঘ মায়ামেঘের মতো ছলনাকারী। কারণ ওখান থেকেই অসুর-সৈন্যের উদয় হবে। মেঘের মতো সেই বিশাল বাহিনী কেনানকে আক্রমণ করবে। সম্রাট জানেন অসুরদের মধ্যে এক বৃহদংশের সৈনিকই হয় অম্মোনীয়, নয় মোয়াবীয় অথবা ইদোমীয় কিংবা অমালেকীয় এবং বা ইশ্মায়েলীয়— এরা ইতিহাস থেকে মুছে যায়নি। সম্রাট দাউদ এই প্রত্যেক জ্ঞাতীগোষ্ঠীকে বিদ্ধ করেছেন। দাউদ জ্ঞাতি-নিধন করতে সবচেয়ে উল্লাস বোধ করতেন। অসুরদের মধ্যে সর্বাধিক অংশ ইশ্মায়েল।

শলোমনকে যদি এই পিতৃদত্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হয়, তাহলে কী করতে হবে ? কিভাবে তিনি স্থির করবেন নির্বাচন এবং সংরক্ষণের নীতি ? সিংহাসন রক্ষার জন্য কোনও শিশু কি বধ্য ? তিনি কি অনুসন্ধান করবেন প্রত্যেকটি জ্ঞাতির রমণী-গর্ভ ? শত্রু কি মিশর থেকে উৎপন্ন হবে ! পলেস্টীয় সুর-আর্যরা কি আবার ক্ষমতা ফিরে পাবে ? গালিয়াৎকে কর-সংগ্রাহক মন্ত্রী করে শলোমন কি ভুল করেছেন ! রাত্রির ডাক-হরিণ কি মরীচিকা ?

২. উৎসর্গ

এল্ অর্থ আলিফ। আলিফ বা আলফা বর্ণমালার প্রথম ছবি বা অক্ষর। অক্ষর হইবার পূর্বে ছবিরূপে প্রথমাবস্থায় যাহাই থাক, পরে উহা একটি মানুষের মতো দাঁড়াইতে পারিয়াছে। একটি দণ্ডায়মান মানুষই হইল এল্। সময়ের টানে আলিফের মাথার পাগড়ি হয়তো বা খসিয়া গিয়াছে। হয়তো ষাঁড়ের মস্তক উড়িয়া গিয়াছে। এল্-কে পুরাতন ভাষায় ইলোহে ডাকিবার নিয়ম ছিল। ইলোহে বা ইলোহিম। এল্-ইলোহে বলিতে সদাপ্রভু ঈশ্বরকে বুঝিবে। মনে রাখিবে এল্-ইলোহে ইস্রায়েল। অর্থাৎ ইস্রায়েলের ঈশ্বর। কিন্তু এই ঈশ্বর মরুভূমিতে থাকিতেন বটে, তবে মরুভূমির কৃষ্ণক্ষেত্রে তাঁহাকে বালদেব বলিবার রীতি ছিল। মরুভূমির উষর লাল-অংশে

যাযাবর-গোষ্ঠীর মানুষরা এল্-ইলোহে বলিতে ষাঁড় না বুঝিয়া উট বুঝিলেও ক্ষতি নাই। তবে আদম বলিতেছেন এল্ একটি লাঠির মতো মরুমৃত্তিকায় পুঁতিয়া দাঁড়াইতে পারিত। যেমন পারিতেন মহাজাতির পিতা, সকল জাতি মিলিয়া যে জাতি, তাহার পিতা আব্রাহাম। কিন্তু জাতিদিগের আদিপিতা আব্রাহাম মরুতে দাঁড়াইতে চাহিয়া কী করিলেন, তাহা আদম নিম্নে বলিতেছেন। তিনি বলিতে চাহেন, এল্ না হইলে আল্লা হইত না। সদাপ্রভু জানেন নরই নারায়ণ। এই নরের অনেক দোষ-গুণ আছে। ইহারা মিসরের কাবুস হইলে দেবতার মতন ভোগী এবং মানুষ হইলেও অমরত্ব চাহে, অথচ মরিয়া যায়। এবং পিরামিড না বানাইয়া পারে না।

কিন্তু এল্-রূপে পশুপালক নরোত্তম অব্রাম কী করিলেন ? আইস, আমরা কাহিনী উদ্গাত করি। শলোমন মকপেলা গুহার নিকট উবু হইয়া দেখিলেন কৃষ্ণ পিপীলিকাগণ মুখে মুক্তো-কণিকাবৎ ডিম লইয়া গর্তে লুকাইয়া পড়িতেছে। ভূমধ্যসিন্ধু তবে ধোঁয়ায় ভরিয়া উঠিয়াছে। নৈঋত-কোণে ধোঁয়া মেঘ হইবে। বৃষ্টি আসিল বলিয়া। সারির সমাধি স্পর্শ করিয়া শলোমন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তুমি ইশ্মায়েলকে কোথায় রেখেছ সারি ? বল, মহামাতা জগজ্জননী, তুমি কাকে অভিশাপ দিলে ? কেন, তোমার পূজা করবে মানুষ ?

একটি পিপীলিকা মুখ হইতে ডিম নামাইয়া রাখিয়া কহিল—বংশরক্ষা সর্বাপেক্ষা উত্তম সারগন। আমরা ডিম কাহার বিচার করি না, সকল মুকুতাই আত্মজ ভাবিয়া থাকি। শুভ্রকণাগুলি বয়ে যাওয়াই নিয়ম, কেননা বৃষ্টি আসিতেছে। সকল জাতির পিতা পৃথিবীতে কেহ হয় নাই, তবু সেইরূপ আখ্যা চাহিয়াছে মানুষ, জাতির জনক কথাটির মধ্যে অর্ধাংশ মিথ্যা রহিয়াছে। তুমি সকল জাতির রাজা হইবে, তা হলে রক্ষা কর, ধ্বংস করিও না, ফেলিয়া দিও না শলোমন।

আকাশে উড়ছে ধুলো আর ছাই এবং সেই ভস্ম ধূলিরাশির ভিতর দিয়ে আগুন বইছে। মরুভূমির আকাশ যদি ইহ্বৎ, তা হলে পায়ের তলার মরুমর্ত কিভাবে বিদগ্ধ হচ্ছে, যে-বেচারি পুড়তে পুড়তে চলেছে সে-ও কি সবখানি বলতে পারে। কোথায় চলেছে মিস্রীয় (মিসরীয়) দাসী ইগার ? তার তলপেট উৎফুল্ল, কেননা সেখানে পুড়ছে তার জন্ম না-নেওয়া সন্তান। শুধু এই শাবকের জন্য তার গৃহপ্রেম ঘুচে গেল। তাঁর মরদ গোষ্ঠীপিতা অব্রামই কি তাঁকে তাড়িয়ে দেননি ! শুধু কি দাসী বলে এই হেনস্থা, সারির ঈর্ষা কি মরুপাবকের হুঙ্কার চেয়ে নিরীহ ?

পুত্রশাবকই বংশরক্ষা করে, ধনুর্ধর হয়। পুত্র গর্ভে থাকলে নারী তার কোখ বিচার করে বোঝে এ পিণ্ডটি স্ত্রী নয়, এ পুং। উদরে পিণ্ডের স্থানযাপন, ঘাই মারা এবং সক্রিয়তা দেখে এবং স্বপ্নে তার উদয় দেখে বোঝা যায়, এ আলবত ছেলে হবে।

কেন মুখ ফুটে বললাম এ ছেলেই নিশ্চয়। তখনই গ্রীষ্মের মরুজিহ্বা সারির চোখে চিরে গিয়ে লকলক করে উঠল ; ঈর্ষা মরুবৃশ্চিক অপেক্ষা জ্বালা দেয় মানুষকে—এই দাসীকে মারে, কাটে, তাড়ায়। ইগার চিন্তা করে এমত।

অথচ এই সারিই ইগারকে ঠেলে দিয়েছিলেন তাঁর স্বামীর বিছানায়, যাও শোওগে, আমি তোমার পেট থেকে পুত্র জন্মাব, এ হবে আমারই দাসীর জাতক এবং ক্রীতদাসীর সন্তান মনিবে বর্তায় এবং এভাবে যাযাবর তাম্বুধারীরা মরুতে কর্তৃত্ব রচনা করে, এ ছাড়া আর কী পথ, আর কিভাবে সুখী হব ; বর্ধিত হব ?

বৃদ্ধি, বৃদ্ধি, বৃদ্ধি। ক্রমাগত বৃদ্ধি, পশুদল আর গোষ্ঠী বিস্তারণ, মানুষ বাড়াও, পশু বাড়াও, তাম্বু বৃহৎ হোক, সংখ্যাতীত হোক। কিন্তু অব্রামপত্নী সারি গতবয়স্কা হলেন, তাঁর তলপেটে কিছুই উৎপন্ন করতে পারল না। এ ব্যর্থতা দুঃসহনীয় বটে, ব্যর্থতা প্রগাঢ় তখন হল যখন সারির স্ত্রীধর্ম ফুরিয়ে গেল। মনে হল, ঋতু চিরতরে রহিত হয়েছে। তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে দাসীকে স্বামীর অঙ্কে ঠেলে দিলেন।

এ পেট কি পুণ্যতোয়া নয়, এ কি কেবলই লোভার্ত। এলা বৃক্ষের শিকড়ে মাথা কুটলো দাসী ইগার। এলা এই মরুভূমির ঈশ্বর-বৃক্ষ। যেখানে বৃষদেব তথা বালদেবের প্রতিষ্ঠা সেখানেই এলা।

এল্ মানেই তো ঈশ্বর। এই গাছের শিকড়ে মাথা কুটেও ভয় গেল না মন থেকে। ইগারের অন্তর লোভে উতলা হয়েছে, এ আমার, এ অন্তর-পিণ্ড আমার, এ ছেলে আমার। এখনও যার মুখ দেখিনি, যার আদুল গা ছুঁইনি, যার লিঙ্গ-উষায় চুম্বন করিনি, সে আমারই। আমি দাসী হলেও, মিস্রীয় কিব্‌তি (মিসরের আদিবাসী) হলেও সুরূপা, আমি মার্জিত এবং অহংকারী।

ইগার গলাধাক্কা খেল, পিঠ বাঁকিয়ে মার খেল, কষ চেপে ধরলেন সারি। এই সারিই স্বামীকে বলেছিলেন, বিনয় করি, তুমি আমার দাসীতে গমন কর, কি জানি, হয়তো বা ইহার দ্বারা আমি পুত্রবতী হব।

আমি কি কর্ত্রীর জন্য তলপেট ভাড়া দিয়েছিলাম গোষ্ঠপিতার কাছে। গোষ্ঠী অধিপতির অনুগ্রহ কি শুধু নির্বিচার শাবককে ফলিয়ে তোলায়, আর কিছু নয় ? মরুভূমি অগ্নিস্রাব করে চলেছে। তাঁবু থেকে পালিয়ে এসেছে ইগার। কিন্তু কোথায় পালাবে, লুকাবে কোন গুহায় ?

এই মরুগ্রীষ্মে আর পথ মাড়াতে পারে না ইগার। এলা বৃক্ষ দেখলেই তার তলে বসে পড়ে। রাত্রির আকাশও ভয়াবহ। আকাশপথে যেন এক-একটি আগুনের ভুলি চলে যায়, উল্কাগুলি উটের গ্রীবা হয়ে উড়ে যায় পর্বতের দিগন্তে। মরুশৃগাল মরুঝড়ের গলায় হু-উ-উ করে কাঁদে। মরুনেকড়ের ধূর্ত ছায়া চলে যায় সমুখ দিয়ে, ইগারের তলপেটে দিনে রাতে তবু বৃদ্ধি বৃদ্ধি রবে স্ফীত হয়। তার লোভ, তার অহংকার তাকে তাড়ায়, তাড়িয়ে নিয়ে চলে সুর দেশের মরুসরণির কিনারা ধরে।

সুরের এই পথেই একটি শীতল মরুপ্রস্রবণযুক্ত কূপ পায় ইগার। এখানেই ধসে বসে যায় গর্ভিণী। মাথার উপর এলাগাছের ছায়াও পেয়েছে দাসী। এখানে বসেই সে সূর্যাস্ত দেখছিল। সন্ধ্যাও ঘন আঁধার ছড়াতে ছড়াতে দূর বিস্তীর্ণ প্রান্তর থেকে এগিয়ে আসছে। তখনই রাত্রির আকাশের মরুতারকার মতো কিছু যেন কূপের ওপারে ঝলমল করে উঠল। ইগার জানে এই মরুমর্তে সদাপ্রভুর দূতেরা ঘুরে বেড়ায়। তারা দেখতে মানুষেরই মতো। ইগারের মনে হল, এ ঠিক আবসিনার মতো, তার সঙ্গে নরদেবতা কাবুস (ফরৌন)-এর দেশ থেকে এসেছিল।

এই দাসটিকে কাবুস (ফরৌন বা ফারাও) অব্রামকে উপহার দিয়েছিলেন। উনি ছিলেন প্রথম কাবুস, যিনি অব্রামের সঙ্গে সুব্যবহার করেন, সারিকে সুন্দরী দেখেও ভোগ করেন না। অব্রাম সুন্দরী বউকে নিয়ে মিসরে কেনান থেকে নেমে গিয়ে ভয়ে ভয়ে ছিলেন, কাবুস বুঝি সারিকে গিলে খায়। কেনান (প্যালেস্টাইন)-এ তখন দুর্ভিক্ষে আবাদি বিনষ্ট, বেদুইন অব্রাম তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে খাদ্যের খোঁজে মরুমর্তের

গোলাঘর কাবুসের দেশে তাঁবু ফেললেন। প্রচার করলেন, সঙ্গের স্ত্রীলোকটি তাঁর ভগিনী। সারির রূপ অপরূপ। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে কাবুস অব্রামকে প্রসাদে থাকতে দিয়েছিলেন। নারীর রূপ কী বস্তু সদাপ্রভুই জানেন।

কাবুস সারিকে ভোগই করতেন, হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ল সারি অব্রামের পত্নী। তখন কাবুস নিজেকে সংবরণ করে ভদ্রভাবে অব্রামকে তিরস্কার করলেন স্ত্রীর পরিচয় গোপন রাখার জন্য। অবশ্য সারি বিয়ের আগে অব্রামের কাকাত কি জ্যাঠতুত বোনই তো ছিলেন। বোন সত্য, আবার বোন মিথ্যাও তো বটে! এই চালাকিটা কেন করতেন অব্রাম সদাপ্রভুই জানেন! অর্ধাংশ মিথ্যা এবং অর্ধাংশ সত্য প্রাণের দায়ে, অন্নের জন্য, ব্যবসার খাতিরে গোষ্ঠী অধিপতিকে কতই না বলতে হয়েছে! একাধিকবার বিভিন্ন সময়ে সারিকে বোন বলে চালিয়েছেন গোষ্ঠী-মোড়ল অব্রাম। অবশ্য মোড়ল আর হলেন কোথায়! ভাইপো লোটের সঙ্গেও পশুপালের থাকবার জায়গা নিয়ে ঝগড়া হল, দল ভাগ হয়ে গেল। মনোমালিন্যও হল।

কিন্তু সে যা হুওয়ার হয়েছে, কাবুসের কথাই তো মনে পড়ছে আবসিনাকে দেখে। কাবুস সংবরণ করলেন, দোস্তি হল অব্রামের সঙ্গে। ইগারকে দান করে দিলেন গাধা-গরু-ছাগল-মোষের সঙ্গে অব্রামকে। সারিই ফরৌনকে মুগ্ধ করে ওই সব আদায় করেছিলেন, নইলে একজন বেদেকে অত খাতির কেন করবেন নরদেবতা কাবুস! নরদেবতা কাবুস ভিনদেশীদের বেদে ছাড়া জ্ঞান করেন না। তাঁবুধারী হলে তো অতি অবশ্য বেদে অর্থাৎ বেদুইন।

ওটা আবসিনা হতে পারে, ঘোমর হতে পারে, তেহর হতে পারে। দাস নিশ্চয়। নয়তো এ কোনও দেবদূত, অমন পোশাক কোথায় পাবে দাসেরা! ঠিক কি দেখছে ইগার! ঝলমল করে নড়ে উঠল দুধসাদা লোকটা।

অত্যন্ত নরম গলায় বলল—তুমি কে গো মেয়ে! সারির দাসী ইগার? চল চল, স্বামীর তাঁবুতে ফিরে চল! সারির বশ্য হও, কর্ত্রীকে অমান্য করে সুখ নেইকো মিস্রিয়া।

ইগার লোকটির কথা শুনে ঝাপসা অনুভূতি আর মরুসন্ধ্যার ঘোরে বুঝল, কূপের ওপারে ফরিস্তা বসে রয়েছে। ফরিস্তারা মানুষের বিবেকের সুরে কথা বলে। ইগারের মাথার মধ্যে মরুভূমির আগুনে পোড়ানো কটু ধোঁয়া ঢুকে গিয়েছিল, তাতে তার বুদ্ধিবোধ কেমন ঘুলিয়ে গেছে। সে দাস আর ফরিস্তার তফাত করতে পারছে না।

দেবদূত আবার বলে উঠল—তাঁবুতে ফিরে গেলে তুমি বাঁচবে, তোমার পেটের পিণ্ডটাও বাঁচবে। নইলে এখানে একা একা কী করে বিয়োবে?

—স্বামী আমাকে নেবে না। কই একটা কোনও দাস কি দাসী আমাকে খুঁজতে এল না কেন? কতবার পিছনে ফিরে ফিরে দেখেছি, কেউ আসেনি। মন চাইলেও শরীর আর বইছে না। মনে হচ্ছে, এখানেই আমি প্রসব করে ফেলব। তুমি আমাকে সাহায্য কর ফরিস্তা!

দেবদূত বলল—তোমাকে তোমার মনিব কি ভালবাসেন না? নিশ্চয় বাসেন। তুমি তার উষ্ট্রীর চেয়ে দামি, কাবুসের দেওয়া উপহার। আমরা তোমার মনিবকে অব্রাম থেকে আব্রাহাম বানাব। গোষ্ঠীবাবা থেকে মহাজাতির আদি জনক বানাব। তাকে ক্ষুদ্র থেকে মহৎ করব। সমস্ত জাতির পিতা হবেন আব্রাহাম। চেষ্টা কর,

ওঠো!

—না, আমি আর পারব না। আমার শাবক ভিতর থেকে বাইরে আসবে বলে ধাক্কা দিচ্ছে, আমার কষ্ট হচ্ছে সদাপ্রভুর দূত। তুমি আমাকে সাহায্য কর!

—তবে তাই হোক। এই কূপটাই তবে সাক্ষী রইল। এর নাম বের-লহয়-রোয়ী। অর্থাৎ দর্শনা কূপ। এখানে আমি তোমাকে দেখা দিয়েছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে এবং প্রসব-মুহূর্তে, খুব বেদনার ভেতর; তোমার জিভ ঝুলে পড়েছিল। মরুভূমি তোমাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল, পায়ে দগদগে ফোস্কা পড়েছিল।

—উঁহু, মা গো! আমাকে সাহায্য কর এল্-ইলোহে, হে খোদা (সয়ম্ভু), চির-অমর ফরৌন! আমি মিস্রিয়া, আমি দাসী, নীল নদীর গমের শীর্ষ, আমি কেনানের নদী যর্দনের তৃণ।

—তোমার মা নেই মিস্রিয়া!

শরীর দগ্ধে ছিঁড়ে যাওয়ার এই তীব্র বেগের মধ্যেও হাসি পেয়ে গেল ইগারের। কী বলে ফরিস্তা! এক মরুখণ্ড থেকে অন্য মরুপ্রান্তে চলে যাওয়া কোনও গর্দভী কি উষ্ট্রীর কি মা থাকে!

ইগার দর্শনা কূপের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকা এলা গাছের তলে চিত হয়ে পড়ে গিয়েছে। তার মাথাটা কে যেন শিকড়ের উপর অত্যন্ত আয়েশহেতু হালকা ঠেলায় তুলে দিল। তখন তাম্বু থেকে পলাতকা লোভী ভীতা মিস্রিয়া দাসীটি মরুদিগন্তে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখল সন্ধ্যা-তমিস্রায় রক্তাম্বরী একটি অশ্বলাঙ্গুলবৎ ঋণ্ডিকা তারা উঠেছে। ধীরে ধীরে সেই তারকার রক্তরঙ কোমল হয়ে আসে।

দেবদূত ইগারকে প্রসব করাতে থাকে। জালিকা ঠেলে শিশু যখন মরুমর্তে তার মাথাটি প্রকাশ করে তখন ফরিস্তা তাঁর পবিত্র হাত দুটি ব্যবহার করে শিশুর সর্বাঙ্গ বাইরে টেনে নেয়। ইহা অদ্ভুত যে, ফরিস্তা মানুষীর প্রসব দেখেছে এবং প্রসবে অংশগ্রহণ করেছে।

প্রসব অন্তে দেবদূত ইগারকে বলল—তোমার বাচ্চাটি দামড়া বটে ইগার! এ নিশ্চয়ই তীরন্দাজ হবে, তার সমুখে ঢালী ইহার ঢাল বইবে, এর দ্বারা আমি মরুভূমির এক উত্তম জাতি নির্মাণ করব। আমি ইহার নাম দিলাম ইশ্মায়েল, ইহার অর্থ চাও নাকি ইগার?

ইগার উৎসুক দৃষ্টে চেয়ে দেখল দূর তারকার দিকে, ক্রমাগত তার মনিবের মুখটাই মনে পড়ছিল, এ দাসী দেবদূতের স্পর্শ অপেক্ষা মনিবের মুখ মনে করে যন্ত্রণার অধিক উপশম অনুভব করেছে, এ কথা এল্-ইলোহের আদিপুস্তক লেখে না। কিন্তু ইগার মনিব ছাড়া কাকেই বা বুঝত!

দেবদূত বলল—ইশ্মায়েল অর্থ ঈশ্বরের কান। কেননা সদাপ্রভু এর জন্মের আর্তনাদ এই মরুমর্তে শুনেছেন। এ পুত্র তোমার বনগর্দভস্বরূপ মনুষ্য। মাফ কর দাসী ইগার, পুত্রের হাত সকলের বিরুদ্ধে উত্থিত হবে এবং সকলের হাত তোমার পুত্রের বিরুদ্ধ হবে—একে আমি একা এই মরুতে লুকিয়ে রাখব, বর্ধিত করব। ভয় পেও না, তোমার গর্ভের লোভ, তোমার আত্মার আসক্তি জয়যুক্ত হোক। তুমি মনিবের তাঁবুতে ফিরে যাও।

এই সব কথা পেশ করে মরুভূমির ফরিস্তা মরুআকাশে নক্ষত্রের ডানা মেলে উধাও হয়ে গেল। দর্শনা কূপের সন্নিকট ভূমরুতে পড়ে রইল মা আর ছেলে। ইগার শরীরে ব্যথা যা পেয়েছে তদপেক্ষা অন্তরে কষ্টের ভাগ কম ছিল না। কিন্তু এখন একলা সুর-সরণিতে শিশুকে নিয়ে তার ভয় করতে লাগল।

ইগারের মনে হল, মরু-শৃগালই ইশ্মায়েলকে খেয়ে ফেলবে। হায়েনা এসে শিশুর পা চিবিয়ে দেবে। নেকড়ে এসে কোল থেকে টেনে নিয়ে যাবে। মরু-শকুনেরা ছোঁ মারবে। পথে যদি পলেস্টীয় ডাকাতরা নামে বর্শা চালিয়ে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলবে। তা ছাড়া এই কূপটার উপর বিশ্বাস রাখা যায় না, মরুঝড়ে এ বুঝি বুজে যেতেও পারে। কিন্তু একে অবিশ্বাস করা গোনাহ। কেননা এর নাম দর্শনা, এখানে ঈশ্বর এক দাসীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

সাতপাঁচ বিবিধ অনিষ্টের কথা ভেবে, লোভী ইগার মনিবের তাম্বুমণ্ডলীর দিকে এগিয়ে চলল। কত দূরে এসে পৌঁছেছিল বেচারি ইগার! সুর দেশের পথই বা কী করে খুঁজে পেয়েছিল সে! সে কি আর অত ভেবেচিন্তে পালিয়ে এসেছিল! মনিবের উপর তার কি অকথ্য অভিমান হয়নি!

সারি মনিবের চোখের উপরই ইগারকে মারত-ধরত, মুখে কুলুপ এঁটে থাকতেন গোষ্ঠীপিতা। এত প্রকাণ্ড বলবান মানুষ, যিনি কিনা বাবিলনের উর নগরী ছেড়ে এসেছেন নিম্রোদের অত্যাচারে, যাঁকে কর্মকার ইবলিস হাপরের অনির্বাণ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিল নিম্রোদকে, সেই আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েও যে অব্রাম বেঁচে রইলেন, যে-আগুন সদাপ্রভুর ইচ্ছায় শান্তিনিকেতন হয়ে গুলবাগিচায় আগলে রাখলো মোড়লকে, সেই তিনিই ইগারকে, গর্ভবতী ইগারকে অত্যাচারিত হতে দেখেও চুপ করে থাকেন?

অথচ আড়ালে দেখা হলে ইগারের গর্ভদেশে তিনিই কি গোপনে চুম্বন দেন না! এই ইশ্মায়েলকেই কি তিনি জন্মের আগেই চুম্বন করেননি? এই বনগর্দভ শিশুটাই কি তেনার সন্তান নয়। বনগর্দভ মনুষ্য মানে কী? বলশালী একগুঁয়ে এবং সরল? ইশ্মায়েলের হাত সবার বিরুদ্ধ হবে, ফরিস্তার কথা অদ্ভুত। মা ছাড়া তা হলে এই শিশুর আর কে রইল! অবশ্য মরুমর্তে শিশুর সঙ্গে মায়ের প্রেমই শ্রেষ্ঠতম, কারণ অন্য প্রেমগুলি হেরো পর্বতের সুর্মা ছাড়া কিছু নয়, মরুসূর্যে জ্বলে মাত্র, রাত্রি নামলে চোখের জলে ধুয়ে যায়।

ইগার নিজেকে প্রশ্ন করল—তুমি কেন এভাবে ফিরে চলেছ? কিসের তাড়না তোমার?

—আমার লালসা, আমার লোভ, আমার আকাঙ্ক্ষা। আমি পৃথিবীর সব চেয়ে ধনী দেশের মেয়ে, আমি দাসী হলেও রূপসী, আমি নির্বোধ নই, আমি কাবুসের হারেমে ছিলাম।

ইগারের অন্য একটি মন নিজেরই কথা শুনে হেসে ফেলল। বলল—জানি, জানি। শিশুতে পশুরও লালসা থাকে। গোষ্ঠীপিতাদের লোভ শুধু পুত্রে, কারণ তারা শত্রুর বিরুদ্ধে লাঠি ঘোরাতে পারে। অব্রাম নিশ্চয়ই লুব্ধ হবেন তোমার ছেলেকে দেখে। কারণ তিনি যখন জন্মস্থান উর ত্যাগ করে আসেন তখন থেকেই সদাপ্রভু তাঁকে নিরন্তর বলে চলেছেন, তোমার সম্মুখের বিশাল এই মরুমর্ত তোমারই হবে।

তুমি বিজয়ী হবে। তুমি বেদুইন, তাঁবু ফেলতে গেলেও তোমাকে গ্যাঁটের কসিতা (মুদ্রা) গুনে দিতে হয় কেনানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের; গ্রাম-মোড়লের সামনে মাথা নুইয়ে বলতে হয়, বিনয় করি মহাশয়, তাঁবু ফেলব, অনুগ্রহ করুন। তুমি তোমার তাঁবুস্থলীতে বড় জোর একটি এল্ বৃক্ষের চারা পুঁতে সদাপ্রভুর নামে বলিদান কর ক্ষুদ্র একটি মেষ। বলতে পার না, এই স্থান আমার হোক, এ বৃক্ষ আমারই।

সব যুগেই স্বপ্নের ভিতর দিয়ে মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্ন ছাড়া আদর্শ বা ঈশ্বর আসতে পারে না। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর বা জ্ঞানের নিয়ম মানুষের মাংসে গেঁথে যায়। অব্রামই সেই মানুষ যিনি প্রথম মরুবিশ্বে স্বপ্নের এই সদাচার উপলব্ধি করেন, স্বপ্নের আনাগোনায় তিনি তাঁর অস্তিত্বকে অর্থবান করেছিলেন। তিনি অপেক্ষা করতেন স্বপ্নের জন্য। স্বপ্নই তখন ধ্যানাশ্রয়ী, ধ্যানই তখন স্বপ্নের অন্তর্গত।

জীবনের চাপ থেকেই স্বপ্নদর্শী মানুষের চিত্তবৈকল্য ঘটে। তিনি সর্বদা ঘোরে থাকেন। বৃদ্ধি, বৃদ্ধি, বৃদ্ধি! কিন্তু কিভাবে! বলুন সদাপ্রভু কিভাবে! দাসী ইগারকে তুমি কোথায় লুকোলে হে করুণাঘন আকাশ-প্রতিভা ঈশ্বর!

ভাবতে ভাবতে সেদিন যর্দনের জলে সূর্যাস্ত হল। অব্রাম দেখলেন রাত্রির আকাশ ধূম্রকুটিল এবং উনানের মতো পুড়ছে, যেন এক-একটি চুলা সবেগে কোথায় ধাইছে, এই সব কি আদি উল্কাশ্রেণী! ভু এবং খ কি এমনই অজ্ঞাত, কুটিল, চঞ্চল এবং ধাবমান? ওই আকাশ থেকেই তো ধুলা, ক্ষার এবং শিলা ও অগ্নি নিপতিত হয়। মাটি কাঁপে, নগর বিনাশ করেন প্রভু। মানুষ মাটিতে পুঁতে গিয়ে গন্ধক-মূর্তি হয়ে অচির প্রাণীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে, প্রাণ যায়, প্রাণ থাকে না। মহাপ্লাবন হয়, নগর-গ্রাম তলায়, দুর্ভিক্ষ আর মারী একসঙ্গে আসে। ইঁদুরের লাল মুখে ধ্বংস বহন করেন এল্-ইলোহে।

কিন্তু অব্রাম আকাশে চলমান চুলাগুলি দেখতে দেখতে ভয়ে-ত্রাসে ঘুমিয়ে পড়লেন। ত্রাস সেকালে ঘুম আনত, ভয় আর লোভ আর জীবন-পিপাসা তাম্বুধারীকে শুষে নিয়ে স্বপ্নে প্রক্ষিপ্ত করত, স্বপ্নে নিয়ম আর পথ বাতলাতেন ঈশ্বর।

সদাপ্রভু অব্রামকে বললেন—আমি তোমাকে মিসরের নীল নদী থেকে মহানদী ফরাৎ অবধি সমস্ত ভু-চরাচর তোমাকেই দিলাম, দিলাম তোমার বংশের জন্য। কেনীয়, কনিষীয়, কদমনীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, রফায়ীয়, ইমোরীয়, কেনানীয়, গিগাশীয় এবং যিবুষীয় লোকদের দেশ তোমাকে দিলাম।

ভোরে জেগে উঠে অব্রাম দেখলেন, তিনি বেঁচে রয়েছেন, আকাশের রঙ শান্ত হয়েছে। তাঁবুর দোরে খুঁটা ধরে দাসী ইগার দাঁড়িয়ে, কোলে তার অব্রামের বংশ মচকা ফুলের মতো লাল।

একটি ছোট তাঁবুতে ঠাঁই হল ইগারের। মনিবের চোখে চোখ রেখে ইগার অব্রামের আকাঙ্ক্ষা দ্রব করে শুষে নিচ্ছিল। এই দৃষ্টি ঘন আর প্রণয়ে নিষিক্ত ছিল। অপরাধ এবং গর্ব এক হয়ে মিশে যাচ্ছিল আঠালো চাউনিতে।

কিন্তু আর বিশেষ সময় নিলেন না ঈশ্বর। স্বপ্নদর্শীকে ফের স্বপ্নে হানা দিলেন। বললেন—সারির যে স্ত্রীধর্ম আমি বয়সক্রমে নিঃশেষ করেছি তা আমি স্বল্পকালের জন্য ফিরিয়ে দেব এবং সেই ঋতুদৈবে ইসহাককে উৎপন্ন করব, তোমার এই ঔরসই তোমার বংশকে আখ্যাত করবে। দাসীপুত্র থেকেও এক জাতি উৎপন্ন করব, এই মাত্র।

ইগার কি জানত দেবদূতের ক্রীড়াভূমি আরবি মরু কী লীলায় আচ্ছন্ন করেছে তাকে আর মনুষ্য-মাংসে গেঁথে দিয়েছেন নিয়ম আর অভিপ্রায়। অব্রাম উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং দুর্জ্ঞেয়। ভাগ্যকে চওড়া করার জন্য তিনি মিসরে স্ত্রী সারিকে ভগিনী বলে চালিয়েছিলেন, স্ত্রী-রূপকে তিনি জাদুর মতন ব্যবহার করেছেন। অবস্থাগতিকে মানুষ স্ত্রী-রূপের ইন্দ্রজাল দেখিয়ে অন্যের হতে আশ্রয় আর সম্পদ দুইয়ে নেয়, বেদুইন মাত্রই কি এত সজাগ ?

তবু এই মনিবকেই স্বামীরূপে ভালবাসত ইগার। মনিবের বয়সের মাপে সে তো নিতান্তই বালিকা। এখনও তার স্ত্রীধর্ম নীল নদীর পলল-মৃত্তিকার মতো উর্বর। তার বাসনা শস্যদায়িনী দেবী ইস্তারের চেয়ে নিবিড়। ইস্তার আর ইগার শুনতে একই।

কেন অব্রামের কাছে ফিরে এসেছিল ইগার ? দেবদূতের আশ্বাস বুকে নিয়েই তো ফিরেছিল সে। কিন্তু সেই দেবদূতরাই অব্রামের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল এবং বলে গেল সারি গর্ভ ধরবেন। হলও তাই।

দেবদূতরা অব্রামকে বলল—আমরা তোমাকে আব্রাহাম বানাব, তুমি এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী-অধিপতি থেকে হয়ে উঠবে সমস্ত জাতির মহাপিতা, তুমিই হবে জগদ্‌পিতা আব্রাহাম। সারি হবে রানি (সারা)। সারা হবেন মহাজননী।

—আর দাসী ইগার, তার ভাগ্যের কথা বলুন মহাপ্রভু। আমি তাকে ঠিক কতটুকু ভালবাসব ?

—ইগার স্ত্রীর সমতুল্য হলেও দাসী মাত্র, তাকে তুমি প্রায় মাগনাই পেয়েছ, সারির রূপে মুগ্ধ হয়ে ফরৌন তাকে উপহার দিয়েছে, তোমার ভালবাসার জন্য সে জন্মায় নাই। তবু ইগারকেও আমি ফলবতী করব, দাসীপুত্রের বংশে বারো জন সারগন (মহারাজা) উৎপন্ন করব। তোমার চোখেরই সামনে আবাদ করবে ইশ্মায়েল। কিন্তু দাসীর প্রেম যাযাবরের পক্ষে বাড়তি বোঝা অব্রাম। দুঃখ করো না।

—ইশ্মায়েল আমারই মাংস।

—হ্যাঁ, আমি সেই মাংসে আমার নিয়ম চিহ্নিত করব। যেন সে মরুমর্তে হারিয়ে না যায়। তুমি সবুর কর।

—শুধু ভালবাসা পাবে বলে পলাতকা মিস্রিয়া আমার তাঁবুতে ছেলে কোলে করে ছুটে এসেছে মহাপ্রভু !

ঠিক এই সময় পাশের বৃহৎ তাঁবুতে সারির গর্ভ-প্রসবের নাদ শোনা গেল। ক্ষুদ্র এই তাঁবুতে এককোণে ইগার ইশ্মায়েলকে বুকে চেপে ধরে বড় অসহায় চোখে অব্রামের পায়চারি লক্ষ করছে। তাঁবুগুলির সামনের প্রাঙ্গণে অব্রাম কেমন বিচলিতভাবে এ দিক ও দিক করছেন। একবার এ তাঁবুতে ঢুকে পড়ছেন, একবার বড় তাঁবুতে ছুটে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন কী হল !

তারপর ইসহাক জন্মাল। এবং যেদিন এই পুত্র সারির স্তন্যপান ত্যাগ করল, সে দিনই মোড়ল অব্রামের সংসারে মচ্ছব বসল, খানাপিনার ধুম পড়ে গেল। অনেক ছাগ, মেষ, উট বলি হয়ে গেল। সারি দাসীপুত্রের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে দেখে ঠাণ্ডা সুরে বললেন—এই মুহূর্তেই ওই ছোঁড়াটাকে আর ওর মাকে বিদায় করা হোক।

দাসী ইগার ক্ষুদ্র তাঁবুটুকু পেয়ে ভেবেছিল, এ বুঝি স্থায়ী কিছু। তাঁবু পোঁতা যায়, আবার তার খুঁটা উপড়ে ফেলে গুটিয়ে ফেলাও যায়। তার পুত্রগর্বের স্থায়িত্ব তাঁবুর

চেয়েও পলকা। অথচ মরুবিশ্বের প্রাচীন দাসী ইগার বেদুইন-ধর্ম কিছুই বোঝেনি। মচ্ছবে সেও বিষণ্ণ চোখ মেলে অংশ নিয়েছিল, সে বাটনা বেটেছে, গমের রুটি পাকিয়েছে, খর্জুর কাঁদি থেকে খেজুর পাতে পাতে ভাগ করে বেঁটে দিয়েছে। তার ঘাগরায় হরিদ্রার দাগ, উড়নিতে সুরুয়া প্রলিপ্ত।

ইগার যেন কোন মেহমানের পাতে খানা দিচ্ছিল, এমনই সময়ে সারি এসে আচমকা পিছন থেকে তার চুলের পশ্চাৎ খামচে ধরলেন, কেশপাশ পাকড়ে ধরে টেনে আনলেন মহাভোজ থেকে অন্যত্র।

সারি বললেন—ঢের হয়েছে এবার বিদায় হও। তোর ছেলে আমাকে টিটকিরি দেয় দেখেছিস ! ভেবেছে তাঁবুঅলার সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে, অত সিধে নাকি ! তুই যদি মুল্লুকদারি করবি তো লাল মরুভুঁইতে তাঁবু বাঁধগে যা, এই কালো মাটিতে তেড়ে এসে আমার ছেলের হক পয়মাল করতে চাস ! এ আমি কিছুতেই হতে দেব না !

—তোমার বয়েস হয়েছে রানিদিদি, আমি তোমার সেবা করব, তোমার বাছাকে কোলে নেব, সংসার সামলে দেব তোমার, আমাকে বসত দাও রূপমতী, তাড়িয়ে দিও না। আমি কোনও হক চাইব না। আমি মিস্রিয়া বাঁদি বই তো না !

—তা হলে পালিয়ে গিয়েছিলি কেন মরুভূমিতে। এখন বলছিস কি না ফরিস্তা তোর সঙ্গে কথা বলেছে, ছেলের নাম বাতলে গেছে। কূপের নাম দর্শনা। দাসীর খুয়াব তো, বানিয়ে বললেও দোষ নেই। যা, চলে যা। ফরিস্তা পথেই বসে আছে, ভয় কিসের ! বলে সারি ফুঁসতে থাকলেন।

অব্রাম দেখলেন, ইগার মিথ্যা স্বপ্ন না বললেও দেবদূতের সব ইঙ্গিত বেচারি বোঝেনি। তার ঈশ্বর মরুভূমিতেই কোথাও অপেক্ষা করছেন। এই হেথায় তার আশ্রয় নেই। ওই উৎসবের মধ্যেই দাসী বিদায় করলেন স্বপ্নদর্শী অব্রাম। ইশ্মায়েলের মায়ের মাথায় চাপিয়ে দিলেন রুটি, মাংস, খর্জুর আর জলপূর্ণ কুপা। ইশ্মায়েল কথাই শেখেনি ভাল মতো, এই ক্ষুদ্র বালক, ক্ষুদ্র শিশুই সে, কাউকে টিটকিরি দিতে পারে। বুনো গাধাটা ভাষাই শেখেনি, ভাষার বক্রতা জানবে কোথা থেকে। যাই হোক, ইগারকে রাখতে পারলেন না অব্রাম।

যখন অব্রাম ইগারকে বিদায় দেবার জন্য জলভর্তি কুপা এবং খাদ্যাদি ইগারের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছেন তখন উৎসব উপলক্ষে সুসজ্জিতা দাসীর শরীর থেকে এক অতীব মাদকতাপূর্ণ সুগন্ধ ভেসে এল। মিস্রীয় আতর, মেয়েরা কখনও কখনও এমনই অক্ষয় আতর গোপন কাষ্ঠপেটিকায় লুকিয়ে সঙ্গে রেখে দেয়। অবশ্য এমনটি কেবল মিস্রীয় নারীই পারে, কারণ এমন আতরীয় সভ্যতা অন্যের জানা নেই। পূর্বদেশীয়রা আতরের এই জাতের সূক্ষ্ম ব্যবহার কখনও শেখেনি। শিকড়কে ঘষলে এই সুগন্ধ মহকে উঠত।

নীল নদী মিসরীয়দের জন্য সদাপ্রভুর দান, এই নদীতীরের নগরে বন্য আতর জন্মায়। আতরের এই বিশেষ গোপনীয়তার মধ্যে এবং ব্যবহারে নীল নদীর স্মৃতি মিশে থাকে। আতর অতি প্রাচীন দ্রব্য, সভ্যতার সকালবেলা এর আবিষ্কার। নরদেবতা কাবুসের দেশে মৃতদেহ মমি করার জন্য বৃক্ষলতাগুল্মাদির ভেষজ ব্যবহার ছিল, তখনই পুষ্প, বৃক্ষবল্কলশিকড়ের নির্যাস সম্বন্ধে মানুষের চৈতন্য অধিক উর্বর হয়। তার আগে থেকেই নির্যাসকে মানুষ চিনতে শেখে, সেই গন্ধকে বৃক্ষত্বক এবং

পুষ্প ও শিকড় থেকে আলাদা করে টেনে নিতে না শিখলেও, সুগন্ধি-শিকড়কে সঙ্গে রাখতে পছন্দ করত। একটি সৌরভময়ী বৃক্ষের ত্বক বা শিকড় ইগার সঙ্গে করে এনেছিল নীল নদীর বসতি থেকে, কাবুসের দেশ থেকে।

ইগার মরুভূমিতে নির্বাসিত হল, কিন্তু একটি শুষ্ক অথচ অক্ষয় বৃক্ষঘ্রাণ ছড়িয়ে রেখে গেল অব্রামের তাঁবুতে। যে দিন কাবুস ইগারকে উপহারস্বরূপ দিয়ে দেয়, সেদিনই প্রথম, ইগারকে কাছে পেয়ে, এই গন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অব্রামের। তাম্বুধারী পশুপালক বেদুইনের পক্ষে এই সুগন্ধি এক বিশেষ অভিজ্ঞতা।

কিছুতেই এই গন্ধকে মনের ভেতর থেকে তাড়াতে পারেন না অব্রাম। পাগলের মতো তিনি তাঁর সবচেয়ে বলবান উটের পিঠে ডেবে বসে মরুমর্তে ছুটে বেড়ালেন। উটের গলা শূন্যে আকুল আন্দোলন তুলে এল-ইলোহের পানে মুখ তুলল। আবার ছুটতে লাগল। সুরের পথ ধরে ছুটল আম্মাতাগিদে অব্রামের বিপুলকায় উট, যেন উন্মাদ চলেছে। শুষ্ক অথচ অক্ষয় বৃক্ষঘ্রাণ কী মদির, কী বাঙ্ময়, কী জাদুকরী, কী তীব্র!

দর্শনা কূপের এলাতলে এসে দাঁড়াল উট। ইগারের সজল চোখ দুটি এখানে কোথাও নেই।

গলা শুকিয়ে কাঠ। ইশ্মায়েল আর পারছে না। এতটুকু বাছা, একেবারে সরল বুনো গাধা। এই শৈশবেই যেন পলেস্টীয় ডাকাত। হাতে পায়ে প্রচণ্ড জোর, লাথি মারলে এখনই মরুমর্ত ডেবে যায়।

তারপর মা আর ছেলে কোথায় এল? দর্শনার পথ এ বার মাড়ায়নি তারা। ইগারের মতি বড়ই বিচিত্র। তাঁবু থেকে বিতাড়িত হয়ে পথে যেতে যেতে ভেবেছে, দর্শনায় গেলে মোড়ল যদি সত্যিই খোঁজ করে কখনও? তাই কি করে নাকি কেউ? আপন ঔরসের পুত্তলি পেয়েছে গোষ্ঠীবাবা, সঙ্গে রয়েছে রাজেন্দ্রানী সারা, তবে আর কিসের তাড়না। ইগার তবু ভেবেছে, যদি আসে।

বীরশিবা পৌঁছে ইগার দেখল, কোথায় দিব্যকূপ, এ তো অতীব নীরস স্থান। একটি খাটো ধূসর পাহাড় বর্ষার পানি না পেয়ে খড়ি উঠিয়েছে গায়ে। উপত্যকাটিও ঊষর, নেড়া। এরই নাম বীরশিবা অথবা বের-শেবা। বিশ্বাসই করা যায় না, এই স্থানটাই সেই স্থান, যেখানে গোষ্ঠীপিতা অব্রাম পলেস্তীয় সর্দার অভিমালিকের (অবিমেলক) সঙ্গে বিবাদ-নিষ্পত্তি করে সন্ধি করেন। শোনা যায়, এখানে একটি উষ্ণ-প্রস্রবণযুক্ত সুন্দর কূপ আবিষ্কার করেছিল অব্রামের গোপাল-লাঠিয়ালরা কিন্তু সেটি অভিমালিকের দাসেরা জবর-দখল করে নেয়, তাই নিয়ে অব্রামের কথা কাটাকাটি চলে সর্দারের সঙ্গে। মহৎ সর্দারটি কূপের দখল ছেড়ে দেয় শর্তবিশেষে। বেশ কিছুসংখ্যক গরুমেষ অভিকে উপঢৌকন দেন অব্রাম, তারপর বলেন—মহাশয় এই আমার বাঞ্ছা যে, আপনি এই সকল গ্রহণ করুন, আমার খোঁড়া কূপ আমার দখলে থাক, দখল আর কি, আমার নামটা মুছে যেন না যায়, নামটা আমি দিচ্ছি বের-শেবা, অর্থাৎ কি না কিরে-কসম হল, তাই এটি দিব্যের কূপ অভিধায় রইল।

স্বামীপ্রতিম মনিবকে কি কিছুতেই ভুলতে পারছে না দাসী ইগার! কেন সে টুঁড়তে টুঁড়তে এখানে এসে থামে? তার পোড়া পা কি অন্য স্থল দেখতে পায় না? মরু-যাযাবর অব্রাম তো সত্যিকার কোথাও কোনও দখল পাননি। একটুখানি নামের

জন্য প্রার্থনা করেছেন যেখানে, মিস্রিয়া দাসী যে সাধের খোকনকে নিয়ে সেখানেই পৌঁছবে মরু-ঈশ্বর কি তা জানতেন?

কিন্তু সেই দিব্যকূপ কোথায়, শুধু নামটাই বলে গেল, এই হেথা বলে চলে গেল পশুপাল খেদানো বালকেরা। এই শূন্য-প্রান্তরে রাত্রি নামল। মরুভূমির শীত ডাকাতেরও নাক কেটে দেয়। আগুন জ্বালাবার নাড়াপোয়াল কি খড়, হেথা কিছুই নেই। রাত্রি কি করে পোয়াবে ইগার?

যদি এখানে কূপটা সত্যিই থাকত, তা হলে উষ্ণ জলের আঁচে রাত্রির শীতকে কোনও মতে ঠেকিয়ে দিত তারা। একটি জ্বলজ্বলে বৃহৎ তারা ইশ্মায়েলের ঠিক মাথার উপর যেন নেমে এসেছে। তেষ্টায় চিৎকার করতে করতে মাটির উপর ভয়ানক দাপাচ্ছে, তার লাথির চোটে পায়ের তলার বালিবহুল পাথুরে মরু কিছুটা ডেবে যায় সহসা। বুনো গাধাটা যে সদাপ্রভুর কান, ওর চিৎকার কি এল্ শুনবেন না?

পায়ের কাছে ঝুঁকে নেমে ছোকরা অবাক হয়, কেমন গরম আর ভেজা। ইশ্মায়েল অতি উল্লাসে কোমর বেঁধে দাপাতে থাকে। তার পক্ষে আপাতত অল্প মেহনতেই কাজ হয়। উষ্ণ জলের দেখা মেলে। গর্ত মতন হয়েছে, তলে এক মরুবিস্ময় অপেক্ষা করে রয়েছে। জল-রুটি পেটে পড়বামাত্র দস্যি ছেলে কূপটাকে সারা রাতের চেষ্টায় আকাশের তলে উদোম করে দেয়, রাতভর মাথার উপরকার তারা নেবে না।

নৈঋতের ভূমধ্যসমুদ্রের কালো মেঘ খাড়া হয়ে ছুটে আসে শীতের শেষে গ্রীষ্মের পাহাড়ে। বর্ষা নামে। সবুজ হয়ে ওঠে বীরশিবার পাহাড়-উপত্যকা, প্রান্তর। ইশ্মায়েল একদিন প্রান্তরে হারিয়ে যাওয়া একটি গর্দভীকে দেখতে পায়, পাহাড়ের খাঁজে পড়ে আটকে পড়েছে। সেটিকে উদ্ধার করে সে। গর্দভী যমজ বাচ্চা প্রসব করে ইশ্মায়েলের জন্য। এই ঘটনা ঘটে বীরশিবায় বসতি গড়ার তিন বছরের মধ্যে। ইশ্মায়েলের গতর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে।

ওই পাহাড়ের খাঁজে আরও দুবার পশু পেয়েছে ইশ্মায়েল। তাদের পালাপোষা করছে মা ছেলে। এ ভাবে ধীরে ধীরে তারা সমৃদ্ধ হচ্ছে। পাহাড়ে লুকিয়ে থাকে ছোকরা। মা তো খুঁজে হয়রান। মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় বয়স বাড়ে পুত্রের। পাহাড়ের ওই খাঁজে একবার ইশ্মায়েল একটি দুর্ধর্ষ জীবকে দেখতে পেল।

কালো কুচকুচে গা। দারুণ গতর, চকচক করছে। লেজটার গোছ ঝলমল করছে। অতি কষ্টে ঘোড়ার বাচ্চাটাকে সামলে তুলে আনে ইশ্মায়েল। এটা পাগলা ঘোড়া। এটি বাচ্চা। কোনও হিব্রোনীয় পাহাড়ি লোকরা অশ্ব তাড়িয়ে এই উপত্যকা পেরিয়ে গেছে। ওই উত্তরের সুদূর পাহাড় পেরিয়ে হালিস নদীর উপত্যকায় চলে গেছে, একেবারে কৃষ্ণ সমুদ্রের কোলে। বাচ্চাটাকে ছেড়ে চলে গেছে, এই ভুলোটা মাথা দোলাতে-দোলাতে লাফাতে লাফাতে নিশ্চয়ই খাঁজে পড়ে গেছে।

মরুভূমি মানুষকে নদী দিয়েছে, কূপ দিয়েছে, উদ্যান-উপত্যকা দিয়েছে। এমন চমৎকার ঘোড়াও দিয়েছে। দ্রাক্ষা, খোবানি, ডুমুর, তমাল-খর্জুর কী নেই এখানে! খানিক দূরে পরান-প্রান্তর, মাটি কালো, পাহাড়ের বর্ষার ঝোরা জল গড়িয়ে পড়ে। অশ্বকে পোষ মানাতে পারলে কানে খোকা স্বর্ণকুণ্ডল পরবে, ধনুর্ধর হবে। ভাবে ইগার, স্বর্ণকুণ্ডলই হবে ইশ্মায়েলের তেজের চিহ্ন। মোড়ল তো উট খেদায়, অশ্ব চেনেই না।

বয়স যখন তেরো, কেবলই তেরোতে পড়েছে ইশ্মায়েল, ঠিক তখন মরুদিগন্তে দূরে একদিন একটি দীর্ঘকায় উট গলা তুলল। এই উট দেখলেই ইগারের মন আনচান করে। ক্ষুদ্র বালিঝড়ে দিগন্ত ঝাপসা। তবু এ দিকেই এগিয়ে আসছে উটের গ্রীবা। কখনও কি আসবে সেই মানুষটা, স্বপ্নদর্শী প্রায় বৃদ্ধ মনিব, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী দুর্জ্ঞেয় মানুষ-বিধাতার সমকক্ষ তাম্বুধারী, সেই মরুচারী যাযাবর।

সত্যিই উপস্থিত হলেন অব্রাম। চোখে তাঁর ব্যথিত তৃষ্ণা, ঘর্মাক্ত মুখে গভীর উদ্বেগ আর বিষণ্ণতা, কতকাল যেন তিনি ঘুমাতে পারেন না। কেমন যেন বিধ্বস্ত নমনীয়তা পবিত্র চোখে ছলছল করছে। মাথার পাগড়ি ধূলিধূসর, দাড়ি বালুকা-পীড়িত, গায়ের বস্ত্রখানি বালিরই রেতে মলিন। মনেই হয় না, ইনিই স্বপ্নদর্শী আব্রাহাম। স্বপ্নই তাঁকে মতবাদ দান করে, জাতিভাষা জোগায়, কীসের তাড়না শুধু, কিসের তাগিদে বীরশিবার এই পরিত্যক্ত দাসীকে খুঁজে ফেরা?

—তুমি ভাল আছ? মুখে কেন শুধুমাত্র এই সহজ কথাটি এসে পড়তে চাইছে। কেন ইগার বলতে পারছে না, আবার কেন, যাকে রাখতে পারনি, তাড়িয়ে দিয়েছ, তার কাছে কী চাও, কেন এসেছ? তোমার দেওয়া নামটাই খালি ছিল, এই কূপ বুজিয়ে দিয়েছিল কারা, দাসীপুত্র তাকে জাগিয়েছে, তবু কি এখান থেকেও তাড়িয়ে দিতে চাও আমাদের?

ভয় আর ভালবাসার এমন জোড়া আঘাত দাসী কখনও সহ্য করেনি। কে তাকে এমন করে মারছে!

মনিবকে কোলে আশ্রয় দিল ইগার, মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে সস্নেহে শুধাল—কী স্বপ্ন দেখে এমন করে ছুটে এসেছ তুমি?

—হ্যাঁ, ইগার! তোমার কাছে এ ভাবে রাত কাটবে, আমি সেই শিকড়ের গন্ধটা আবার পাব ভাবতে পারিনি। ভাবছিলাম, ইশ্মায়েল আমারই মাংসে। তাই না?

—তো? অবাক চোখে মনিবের মুখের কাছে তাড়ির গেলাস এগিয়ে আনে ইগার। দ্রাক্ষারসে মেশানো খর্জুর তাড়ি অত্যন্ত সুস্বাদু ঠেকে অব্রামের। তিনি দাসীর বিস্ময় নিবৃত্ত করেন চুম্বনযোগে এবং বলেন—দেখো ইগার, সদাপ্রভু বলেছেন, তিনি আমার মাংসে নিয়ম গাঁথবেন, যেমন ধর কাঁচি দিয়ে আমরা পশুর পিঠের লোম কেটে চিহ্ন দিই, এইগুলি আমার, তাই না, সেই রকম...

—সেই রকম কী?

—ব্যবস্থাটা হল, যাতে ইশ্মায়েল মরুভূমিতে হারিয়ে না যায়।

—বুঝলাম না!

—তুমি জেদ বা অবিশ্বাস করো না। কথা দাও, আমার উপর তোমার...

—বিশ্বাস করি গোষ্ঠীপ্রভু, তুমিই আমার সর্বস্ব।

—তা হলে কাল ভোরেই ছেলেকে নিয়ে যাই, ওর মাংসে সদাপ্রভুর অনুজ্ঞা চিহ্নিত হোক। কী বল?

—কিভাবে?

—তুমি চাও না, সে আমারই হোক।

—চাই! বলে কেমন অজানা আশঙ্কায় মুখে আঁচল চেপে কেঁদে ফেলল দাসী ইগার।

ইশ্মায়েলকে উটের পিঠে বসিয়ে উর্ধ্ববেগে ভোরে উটকে ছুটিয়ে দিলেন অব্রাম। তিনি নিজের এবং পুত্র ইশ্মায়েলের একই দিনে একই সঙ্গে লিঙ্গাগ্র-ত্বক ছেদন করলেন হাজাম দ্বারা।

লিঙ্গাগ্রের ক্ষত শুকিয়ে উঠতে না উঠতেই ইশ্মায়েল তার মায়ের কাছে বীরশিবা পালিয়ে এল, ওর চোখে স্বপ্ন সে কালো ঘোড়াকে তাঁবে এনে পিঠে চড়ে দিগন্তে উড়ে যাবে। কানে দুলবে স্বর্ণকুণ্ডল। বাপের মাংসচিহ্ন ছাড়া সে কীই বা পেয়েছে! সে যেন গুনতিতে পড়ে তাই এই ব্যবস্থা! কী জানি, বাবা হয়তো তাকে ভালও বাসেন।

ইগার বুঝেছিল মাংসের চিহ্নই যথেষ্ট, একটা কসিতাও বাপের থেকে পাবে না বেচারি ইস্মেল!

তবু কী বোকা দাসী ইগার, এই চিহ্নের জন্যও তার গর্ব হল। কিন্তু এক বছর ঘুরতে না ঘুরতে সশরীরে উপস্থিত অব্রাম তাঁর নির্বাসিতার কাছে। এ বার সঙ্গে এনেছেন কিছু পোষা দাস এবং তিনখানা গো-শকট। মরুস্থলী থেকে তাঁবুর কালো দেশে নিয়ে যাবেন ইগারকে। এই রকম সমাদর কেন?

মুখ খুলতে চাইছেন না জাতির জনক আব্রাহাম। তাঁর চাউনি কেমন মরু-কুয়াশার মতন দুর্বোধ্য এবং উদ্‌ভ্রান্ত; মানুষটা বুঝি পাগলই হয়ে গেছেন। শকটের মধ্যে চুপচাপ বসে রয়েছেন। এই গো-যানে ইগার ছাড়া অন্য কোনও প্রাণী নেই। একটি কাফেলা চলেছে এগিয়ে। সব শেষে চলেছে আব্রাহামের এই গাড়ি, যার চালক অবধি নেই। দলকে আপনা থেকেই অনুসরণ করছে তাঁবেদার গো-যুগল।

এই গাড়ির পিছনে সেই নিঃসঙ্গ কৃষ্ণ অশ্ব। দড়িতে বাঁধা গাড়ির সঙ্গে এবং অপূর্ব বাধ্য পশুটা।

—ইগার! বলে কেমন চাপা আর্তনাদ করে ডেকে উঠলেন আব্রাহাম। ইগার মাথা নিচু করে বসেছিল, মনিবের অদ্ভুত এই ডাকে সে আঁতকে উঠল। শকটের ছইয়ের পিছনে অশ্বের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছেন আগামী দিনের জাতির মহাত্মা। ঠোঁট দুটি তাঁর থরথর করে কাঁপছে।

মনিবের চোখে আর্ততৃষ্ণায় চেয়ে রইল ইগার। ঠোঁট কাঁপছে স্বপ্নদর্শী মানুষটির। কোনও প্রকারে পাগলের মতো উচ্চারণ করলেন—দখল!

—সদাপ্রভু তোমাকে অনেক দিয়েছেন, তোমার অনেক তাঁবু, অনেক পশু, দাসদাসী অনেক।

—কিন্তু দেশ! আমার দেশ চাই। সদাপ্রভু বলেছেন, এই সব আমার। এই ভূমরু, চরাচর, কতকাল ধরে বলে আসছেন। হিব্রোন (ইস্রোন)-এর এলোন বনে দেখা দিয়ে একবার বললেন, বলিদান কর আব্রাহাম। এই যতদূর দৃষ্টি কর, যত দূরে সূর্য যায়, সবই তোমার। উৎসর্গ কর তোমার প্রিয়তম জীবকে। তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে অব্রাম।

—তোমার অনেক আছে প্রভু!

—আমার প্রিয়তম কে, ইগার তুমি বলে দাও!

—তোমার প্রচুর পশু, অনেক সম্পদ হয়েছে মনিব।

—বলি দিয়েছি অনেক, শত শত। আত্মার শান্তি মেলেনি মিস্রিয়া। সদাপ্রভু আমাকে স্বপ্নে তাড়িয়ে ফিরছেন, দাও দাও, আরও দাও; ভেবে দেখ কে তোমার

প্রিয়তম।

—তোমার অফুরন্ত রয়েছে প্রিয়তম। বলে ফুঁপিয়ে উঠল ইগার। আকাশে সূর্য ঢলেছে।

পিছনে একা একা মাথা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসছে পাগল ঘোড়াটা।

—আমাকে তুমি প্রিয়তম বললে ইগার!

—সদাপ্রভু আমার হৃদয়কে সংযত করুন, আপনি ক্ষমা করুন, আমি লোভী, এই নির্জনতায় বেয়াদপি করলাম। নির্বাসনে থেকে আমি অন্তরে ক্ষুধার্ত হয়েছি গোষ্ঠীবাবা, আমি দাসী বই তো নই!

—আমার প্রিয়তম কে ইগার?

—আমি নই।

—ইশ্মায়েলকে আমার চাই ইগার। চাইতে গিয়ে আব্রাহামের গলা কেমন গাঢ় আর ফ্যাসফেসে হয়ে ভেঙে গেল।

—না, না, এ আমি কিছুতেই পারব না। আমাকে নামিয়ে দাও।

—সদাপ্রভু খাদ্য চান ইগার। আমি জানি, তোমার পুত্রই আমার প্রিয়তম।

—এ চিত্তভ্রম তোমার, তোমার স্বপ্ন এত নিষ্ঠুর হতে পারে না। আমি এই মাত্র জীবনে এই প্রথম তোমাকে প্রিয়তম বলে ডেকেছি, এই লোভকে ক্ষমা করে দাও। আবার বলছি, আমি দাসী, আমাকে মরুভূমে ফেলে দাও, ছেলেকে নামিয়ে দাও। বলে ডুকরে উঠল দাসী ইগার। অথচ সে গো-শকট থেকে নেমে পড়তেও পারল না।

তাঁবুমণ্ডলে পৌঁছে কাফেলা থামল। রাত্রির আকাশে লালমুখো নক্ষত্ররা উড়ে বেড়াতে থাকল। যেন এক-একটা উনুন চলে যেতে থাকল এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। দাসী ইগার তার সাধের পুত্রকে সকালবেলায় স্নান করালো, নতুন পোশাক পরালো।

বন্যগর্দভস্বরূপ মনুষ্য-বালক হাসতে হাসতে স্নান করল। নতুন পোশাকে অত্যন্ত খুশি হল। ইগার পুত্রের শরীরে লিপ্ত করে দিল তার গোপন ক্ষুদ্র কাষ্ঠপেটিকায় সুরক্ষিত শুষ্ক অথচ অক্ষয় বৃক্ষত্বকের নীল সুগন্ধি। এ এক আশ্চর্য গন্ধমদির সুপ্রভাত। ইগার পুত্রকে চুম্বন করে ছেড়ে দিল। এবং বলে দিল—বাবা যা বলবেন, তাই করবে।

বাবা অব্রাম পুত্র ইশ্মায়েলের স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন হোমকাষ্ঠ। নিজে হাতে নিলেন অগ্নি আর খড়্গ। ইগারের চোখ দু'টি মরু-শুকতারার মতো সিক্ত স্নিগ্ধতায় পবিত্র; অনিদ্রা-যাতনায় এবং পতিপ্রেমে উদ্ভাসিত; মনিবকেই সে স্বামী বলে জানে এবং জানে অব্রাম আজ আব্রাহাম হতে চলেছেন—মরু-অধিকারে সব দিতে হয়।

ইশ্মায়েল কেন খুশি তা সে নিজেও জানে না। একটু-আধটু বুঝতে পারছে মারি পর্বতে বাবা তাকে সদাপ্রভুর কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে বলিদান হবে। কী সে বলিদান, তা সে জানবে কী করে? কত পথ হাঁটতে হবে, কত দূর সেই পাহাড়, কত দূর উঁচু? বাবা তাকে নিয়ে সেখানে উঠবেন। বাবা কত দূর উঠতে চান। লম্বা মানুষরা কি শুধুই উপরে উঠে থাকেন? এই সমতলে কি বলিদান হত না।

পিছন পিছন পাগলের মতো ছুটে আসতে থাকে পুত্রবতী মিস্রিয়া রমণী ইগার। সে দেখল, সারা তার ছুটে যাওয়ার পাগলামি দেখে খিলখিল করে হেসে চলেছে। নিষ্ঠুর সেই আনন্দ ইগারকে ভেতর থেকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল। ইগার আর অগ্রসর হতে পারল না, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সারার হাসির উত্তরে অদম্য বেগে পাগলের মতো হেসে উঠল। তারপর মাটিতে পড়ে গেল।

ছেলেকে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে থাকলেন আব্রাহাম। ছেলে পরিশ্রান্ত হয়েছে, হোমকাষ্ঠ আর কাঁধে করে বইতে পারছে না। বললে—আমার তেষ্টা পেয়েছে বাবা। দেখ, আমি কেমন ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি। তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

—তা হচ্ছে খোকা! কিন্তু বলিদান যে করতেই হবে। নাও, জল খেয়ে দম নিয়ে আবার ওঠো!

—বলিদানের পশুটা কোথায় বাবা! কথা বলছ না কেন?

—সে ঠিক আসবে'ক্ষণ বাপু, এখন চলই না!

ঈশ্বরের নির্দিষ্ট স্থানে পুত্রকে নিয়ে পৌঁছনোর পর আব্রাহাম একটি পাষাণের দিকে দেখিয়ে কী যেন নির্দেশ করলেন। ইশ্মায়েল বুঝতে পারল না আঙুল তুলে বাবা তাকে কী বলতে চাইছেন। সরলচিত্ত বালক শুধালো—কী করব বাবা?

আব্রাহাম থরথর করে কাঁপছিলেন। তাঁর হাতের খড়্গ সূর্যালোকে চকচক করছিল। ভাবছিলেন, এই মরুমর্তে এক বালক তার হোমার্থ বলিদানের কাঠ নিজের কাঁধে করে বয়ে এনেছে, হাঁপিয়ে পড়েছে, পাহাড়ের খাড়াই ঠেলে উঠতে তার জিহ্বা ঝুলে পড়েছে, তবু সে কিছুই বলেনি বাবাকে। কোনও ওজর তোলেনি। জননী তাকে বলে দিয়েছে, বাবা যা বলবেন, তাই করবে।

আব্রাহাম বললেন—ওই পাথরের উপর শুয়ে পড়, তারপর গলাটা একটু বাইরে ঠেলে ঝুলিয়ে দাও, এটাই হোমের বেদী ইশ্মায়েল।

—আর পশুটা, বাবা?

—তুমিই তো সেই গর্দভ-মনুষ্য ইশ্মায়েল, সদাপ্রভুর দূত তোমার এই বিবরণ দিয়েছেন তোমার জন্য, তুমি ঠিক তাইই হয়েছ।

ইশ্মায়েলের মুখটা এই এতক্ষণে মুহূর্তের জন্য কেমন ম্লান হয়ে গেল। তারপরই এই আশ্চর্য বালক আকাশে চোখ তুলে চাইল। তার সুর্মা-অঙ্কিত চোখ দু'টি সামান্য ছলছল করে উঠল। ক্ষণিকের জন্য তার প্রাণে ভয়ও দেখা দিল। একবার সে ভাবল, ছুটে পালাবে নিচের দিকে, বুড়ো বাবা তাকে ধরতেই পারবেন না। কিন্তু মা? মা যে বলেছেন, বাবা যা বলবেন তাইই যেন করি। মায়ের অবাধ্য হলে সদাপ্রভু প্রাণে ব্যথা পান। তা ছাড়া আমি কি সবখানি ঠিক মানুষের মতো? আমার আর ঘোড়ায় চড়া হল না। নাই বা হল, ইসহাক তো রইল, হাট্টির ঘোড়া ঠিক ওর বশ মেনে যাবে। হালিস নদীর ঘোড়াটা তাঁবুর খুঁটায় বাঁধা রইল হে ঈশ্বর!

পাথুরে পাটাতনের কাছে এগিয়ে এল ইশ্মায়েল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে নিঃশব্দে হাসল, সেই হাসি জ্ঞানীরা হেসে থাকেন, তখন তাকে আর বনগর্দভ বলে মনে হল না। আব্রাহাম বালকের শরীর থেকে অক্ষয় বৃক্ষের সুঘ্রাণ পেলেন। স্নেহে আর প্রেমে তাঁর শরীর সিরসির করে উঠল।

তিনি চিৎকার করে উঠলেন—আমি পারব না ইশ্মায়েল। তুমি নও, তুমি নও!

পাষাণের উপর শান্ত মনে বসে পড়ল ইশ্মায়েল। তারপর বলল—তা হলে কে বাবা?

—ইসহাক। আইজাক, আমার প্রিয়। আমি এখনও স্থির করতে পারছি না ইলোহে!

—আমি তোমার কেউ নই বাবা!

—তুমিও প্রিয়। তুমি নেমে এসো। উৎসর্গের অনেক দাম ইশ্মায়েল, তোমার মাকে আমি নির্বাসন দিয়েছিলাম কেন জানো! তুমি বুঝবে না, মানুষের ইতিহাস কী কুটিল, কী দুর্বোধ্য!

—আমি শুয়ে পড়েছি বাবা। দেখো, আমি হাসছি।

—না, তুমি নও, হাসি যার নাম, সেইই ইসহাক, আমার প্রিয়তর, তোমাকে আমি ভালবাসিনি, তোমাদের ভালবাসিনি কখনও। দাসীপুত্র ইতিহাস হবে, এই খড়্গ তা সহ্য করে না প্রিয়তম।

বলতে বলতে আকাশ ভেদ করে কেঁদে উঠলেন অব্রাম, সেই মুহূর্ত আসন্ন যখন তিনি আব্রাহাম হয়ে উঠবেন। মনে মনে তিনি আব্রাহাম হয়ে উঠলেও, ঈশ্বর প্রকাশ্যে এখনও সেই উত্তরণ অনুমোদন করেননি। কাল আসন্ন, মরুমর্তে ঝড় বইছে। সেই বায়ুবিক্ষোভে ইতিহাসের দুর্বোধ-কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

চোখ বুঁজে জ্ঞানীপুত্র ইশ্মায়েল পাষাণে শায়িত এবং প্রস্তুত। পিতাকে আহ্বান করে বলল—তুমি চোখে পট্টি বেঁধে নাও আব্রাহাম।

আব্রাম চমকে উঠলেন, এ কার কণ্ঠস্বর! এ কী সদাপ্রভুর নির্দেশ? বুঝতে না পেরে উদ্‌ভ্রান্ত পিতা নিজের চোখে কাপড়ের পটি বাঁধলেন। তারপরই তাঁর মনে হল, আমি কি অন্ধ? কিসের অন্ধত্ব? কামনা আর আকাঙ্ক্ষা কি মানুষকে চোখে পর্দা টাঙিয়ে অন্ধ করে, আমি কি নিজেই এই অন্ধত্ব রচনা করিনি? সারি যে সারা (রানি) হতে চায়, অব্রামের উত্তরাধিকার পাবে তারই সন্তান, এই উত্তরাধিকার তার চাইই, মরুবিজয় চায়, ইতিহাস হতে চায় সারি। সারির প্রতি আসক্তি কি সেই অন্ধত্ব, আমি কী করছি নিজেই জানি না।

খড়্গ তুললেন মাথার উপর আব্রাহাম, তাঁর সর্বাঙ্গ কম্পমান হল এবং বিবশ হয়ে এল। বিড়বিড় করে বললেন, এই মরুতে এখনও আমি সাড়ে তিন হাত ভূমিই অধিকার করতে পারিনি, কেউ মরলে সমাধির জন্য মানুষের পায়ে পড়তে হবে, মাটি চেয়ে ফিরতে হবে মানুষের দ্বারে দ্বারে। সেই আমি পুত্রকে হত্যা করছি, কেন?

শেষ অবধি পারলেন না অব্রাম। খড়্গ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাটিতে নতজানু হয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে মহা আর্তনাদ করে উঠলেন—এই অধীনকে তুমি ক্ষমা করে দাও প্রভু। আমি আর একবার চেষ্টা করব, আর একটি বার! বলতে বলতে অব্রাম লক্ষ করলেন তিনি তাঁর অন্ধত্বকেও বুঝতে পারছেন না, দু'হাতে মুখ ঢেকেছেন কেন? তাঁর দৃষ্টিই তো কাপড়ে নিবদ্ধ, কাউকে, কিছুকে তিনি দেখছেন না।

তাঁর লজ্জা কিসের!

এমন সময় আকাশ-প্রতিভা মহাকাশ থেকে বললেন—তুমি চোখের আচ্ছাদন উন্মোচন কর আব্রাহাম। তোমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এই দেশসমূহ তোমাকে দিলাম। তুমি এখন ঝোপে আবদ্ধ একটি মেষকে দেখো, তাকেই হোমার্থ বলিদান দিয়ে তাঁবুতে ফিরে যাও।

চোখের কাপড় সরিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে পুত্র ইশ্মায়েলকে বুকে টেনে নিলেন আব্রাহাম

আর তখনই তাঁর হৃদয় অব্যক্ত কষ্টে মোচড় দিয়ে উঠল। তাঁর মনে হল আমি যার পুত্রকে কোল থেকে টেনে এনেছি এই ঐতিহাসিক পর্বতে সেই জননী দাসী ইগারকে কী বলব?

একেবারে ভেঙে পড়লেন আব্রাহাম, চিৎকার করে বলে উঠতে চাইলেন—আমি পারিনি ইগার, দেখো আমি পারিনি!

ধীরে ধীরে এই কথাই স্ফুট হয়ে উঠল মহাপিতার কণ্ঠে, তিনি অতঃপর পাগলের মতো করতে থাকলেন।

পিতার চোখের অশ্রু মুছিয়ে দিয়েই ইশ্মায়েল অব্রামের বাহুবন্ধনী ঠেলে বেরিয়ে এল, তারপর তীরবেগে পাহাড় ছেড়ে ছুটে যেতে লাগল।

তাম্বুস্থলীতে এসে মাকে সে খুঁজে পেল না। সে ভয়াবহ আর্তচিৎকারে মাকে ডেকে আকাশ মথিত করল।

কোথায় মা? কোথায় দাসী ইগার?

অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসল ইশ্মায়েল। অব্রাম আব্রাহাম হয়ে উটযোগে মরুদিগন্তে চাইলেন, 'আমি যে পারিনি ইগার, বিশ্বাস কর, আমি হত্যা করিনি মিস্রিয়া', এই কথাটুকু বলার ছিল যে তাঁর।

কিন্তু তামাম আদিপুস্তক খুঁজলাম আমরা। কোথাও আর ইগারকে তালাশ করা গেল না। মরুতে নির্বাসিতাকে মরুভূমিই তবে কোথাও লুকিয়ে ফেলল!

এসো, আমরা অশ্বারোহী ইশ্মায়েলের স্বর্ণকুণ্ডলের ছটায় তাকে খুঁজি।

মুখ থেকে নামিয়ে রাখা মুক্তোকণার ডিমটা ফের মুখে তুলে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল ক্ষুদ্রতনু কৃষ্ণ পিপীলিকা। শলোমন অপেক্ষা করছিলেন, কখন সব আত্মকণা মুখে করে মাটি ও প্রস্তর ছিদ্রের অন্তরালে অন্তর্ধান করে সকল কৃষ্ণ বিন্দুগুলি। তিনি চান না, একটি কণাকেও উপেক্ষা করে কেউ; কেউ যেন ভুল না করে, যাও যাও, দেরি ক'রো না। ফেলে চলে যেও না কাউকে। বলেছ, সকল মুকুতাই তোমাদের আত্মজ। মানুষ সন্তানদের সোনা বলে ডাকে, তোমরা মুকুতা বলে ডাকো। আশ্চর্য হই, তোমাদের কালো গা থেকে এত শুভ্র ডিম কী করে প্রকাশ পায়! কী আলো, কী আলো! এত শান্ত, স্থির সাদা বিন্দু! দলে দলে সবাই চলে গেল অবশেষে এবং তখনই আকাশ গুমরে উঠল। চড়াত করে বিদ্যুৎ চলে গেল ঝিকিয়ে, প্রিমি প্রিমি করে মেঘ ছেয়ে গেল মহাশূন্যে। ঝাপসা হয়ে নেমে এল বৃষ্টি।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সারগন চেয়ে দেখলেন, এক অশ্বারোহী বৃষ্টির ভিতর দিয়ে দ্রুতবেগে এদিকে ছুটে আসছে। অবিকল তিনিই যেন তাঁর নিজের দিকে ছুটে আসছেন।

৩. নূতন ইশ্মায়েল

বৃষ্টির সাদা পোশাক পরে নিয়েছিলেন সম্রাট শলোমন। শলোমনের যোদ্ধবেশ দু'জনেরই—হাবিল এবং কাবিল। তাদের দু'টি ঘোড়াই কালো। কে হাবিল আর কে কাবিল সম্রাট জানেন না। তিনি শুধু জানেন, এরা দু'টি তাঁর ছায়ামূর্তি এবং আজ্ঞাবহ, এরা তাঁর দেহরক্ষীও বটে। সামনে এসে ঘোড়া ধরে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি, প্রথম জনকে সম্রাট স্বভাবত হাবিল বলেই ডাকবেন। আশ্চর্য হয়ে সম্রাট শুধালেন—কী হয়েছে!

বিস্ময়বদ্ধ প্রশ্ন করেই সম্রাট চমকে উঠলেন। সম্মুখের ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে দেওয়া মৃতদেহ। একদিকে মাথা এবং অন্যদিকে পা দু'খানি ঝুলে রয়েছে। লম্বালম্বি নয়, আড়াআড়ি দু'পাশে। শোয়ানো।

হাবিল বলল—জেরিকোর শ্রমিক হুজুর! আপনি চলে আসার পরই কারখানার জলাধার থেকে কল দিয়ে পুড়িয়ে তুলে পথে ফেলে দেওয়া হল। আপনি লক্ষ করেননি।

এরপর পিছনের ঘোড়ার দিকে চাইলেন সম্রাট। কাবিল রাশ ধরে রয়েছে। ঘোড়ার পিঠে শেকল জড়ানো বন্দী একজন। শলোমন সহজেই বুঝতে পারলেন, ওই লোকটিই ঘাতক।

মৃত, পোড়া, অত্যন্ত করুণ আর বীভৎস শরীরটার দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। খোসা খোসা, ছাইছাই, লাল-পোড়া, ছাই-পোড়া, জমাট বেঁধে যাওয়া, বিগলিত বর্জ্য-পদার্থ-কণায় বিদ্ধ গুটি-বসন্তের মতো জ্বালাময় দেহ। কী করেছিল শ্রমিকটা?

—বল, হাবিল-কাবিল, কী অপরাধ?

প্রথম ছায়ামূর্তি জবাব দিল—শ্রমিকটা অম্মোন মহানুভব!

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি বলল— ঘাতক একজন হেত। হিত্তীয়, মহারাজ!

—কী হয়েছিল?

—আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, উরিয় হত্যার বদলা নিশ্চয়ই। মাঝে মাঝেই এই সব হচ্ছে!

—কেন? এই জিজ্ঞাসা গলার খাদে উচ্চারণ করলেন শলোমন। তারপর আরোহী ঘাতকের ঘোড়ার কাছে ধীরে ধীরে আরও সরে এলেন। হিত্তীয় ঘাতকের চোখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা কী হল তাঁর মনে, চোয়াল শক্ত করলেন সম্রাট, তারপর আরোহীর গায়ে জড়ানো শেকল ধরে আচমকা টান দিলেন নিচের দিকে, অপ্রস্তুত লোকটা কাঠের মূর্তির মতো কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে চাপা ভীত একটা দুর্বোধ্য আর্তনাদ করে উঠল।

—তুমি কেন ওভাবে হত্যা করলে অম্মোনকে? বল, কেন করলে? চুপ করে থেকো না। কাজে ফাঁকি দিয়েছিল? কিসের শত্রুতা তোমাদের?

—আমি ঘৃণা করি, নিশ্চয় করি।

—কেন?

—জানি না। আপনি আমাকে মেরে ফেলুন। ওকে দেখেই ঘৃণা জন্মায়, শরীর সিরসির করে। ও রাজার তল্পিবাহক, খুনি, বিশ্বাসঘাতক, ওকে ঘৃণা না করলে আমরা

বাঁচব না। ও অপবিত্র! হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওর মাংসে ঈশ্বর নেই। আমি বলছি, ওদের আপনি লাল মরুতে ফিরিয়ে দিন। ওরা কেন এখানে রয়েছে, আমাদের মধ্যে কেন আসে ওরা? ও পিছন থেকে মানুষকে মারে! এই অম্মোনকে আপনি বিশ্বাস করেন?

—চুপ কর হেত!

—আমি ইফ্রোন। এই উপত্যকা আমাদের। আমরা সম্মান চাই, মানুষের মতো বাঁচতে চাই। অনেক দিয়েছি আমরা। স্ত্রী, কন্যা, সৈন্য, সভ্যতা—সব দিয়েছি, তার বদলে কী পেলাম আমরা?

—চুপ করবে তুমি?

—মহামানব উরিয়ের পবিত্রতার নামে শপথ করি মহামতি। আমি মিথ্যা বলব না। আমাদের স্ত্রীলোকদিগের দিকে কোনও অম্মোনের সামান্য কু-ইঙ্গিত আমরা সহ্য করব না। অনেক সয়েছি। ইতিহাসে প্রমাণ আছে, আমাদের নিয়ম সহজ, আমাদের আচার নরম, আমরা ভদ্র। মানুষকে উত্যক্ত করা, কথায় কথায় কতল করা, যে-কোনও কারণে খড়্গ তোলা, আমাদের স্বভাব নয়। ওই অম্মোন আমার বোনের শ্লীলতাহানি করেছে আর বলেছে, খড়্গ দেখিয়ে, এই দিয়ে হাত্তিদের কাত করে দেবে; ওটা জারজ; ওরা, কন্যাকে ধর্ষণ করে ওরা। মহারাজা দাউদের জয় হোক। বলেই হিত্তীয় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মাটিতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেল, তারপর শরীরটা কেমন নিস্পন্দ হয়ে গেল। লোকটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এসেছে। লোকটা কি বিষ পান করেছে?

ইফ্রোন উপত্যকায় বৃষ্টির মধ্যে পড়ে রয়েছে দু'টি মৃতদেহ। সম্রাট তাঁর ছায়ামূর্তিদের মৃত দেহ দু'টিকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেননি। তুমুল বৃষ্টির ভিতর দিয়ে সন্ধ্যা নামছে মরুভূমিতে।

বৃষ্টিতে ঝাপসা মরুদিগন্ত। সম্রাটের দুর্গ শৌলগৃহ বৃষ্টির ঝাপটায়, বাতাসে স্থির। শলোমন গবাক্ষ দিয়ে চেয়ে রয়েছেন মৃত দেহ দুটির দিকে। সবই এত ঝাপসা, সবই ছায়া যেন। মানুষ কত সহজে মরে যায়। এদের কারও কি অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা ছিল না?

মরুভূমিতে যারা কখনও মাথা তুলতে পারেনি, অম্মোন তাদেরই একজন। এদের কখনও মনুষ বিশ্বাস করেনি। লোতপুত্র অম্মোন; হায় ঘৃণিত। যেন অভিশাপের খড়্গ তারই কাঁধে নেমে আসে বারবার। ওকে ছুঁলেও কি পাপ হয় মানুষের! ও কেন হিত্তীয় কন্যাকে স্পর্শ করতে গেল!

সম্রাট লক্ষ করলেন, ঝাপসা বৃষ্টিধার থেকে বৃষ্টির কণিকার অবয়ব মনুষ্যবৎ দেহ ধরে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। একটি মেয়ে। এখানে মেয়েটা এল কী করে? গালিয়াতের তোরণ ভেদ করল কিভাবে মেয়েটা? বৃষ্টির তোড়ে ভূমণ্ডল অপ্রকৃতিস্থ, সবই যেন উল্টেপাল্টে গেছে। তোরণদ্বার গলে বৃষ্টির আড়ালে আড়ালে চলে এসেছে মেয়েটা। কিন্তু এখানে তার কী কাজ?

পোড়া দেহটার কাছে প্রথমে ছুটে এল যুবতী। নতুন যুবতী, কেবলই কৈশোর তার পরিপক্ক হয়েছে। মৃতদেহ স্পর্শ করে আকাশে মুখ তুলল। সবখানি বোঝা না গেলেও সম্রাট বুঝলেন, ওই যুবতী বৃষ্টির মধ্যে কেঁদে চলেছে। এবার পোড়া দেহের উপর আরও ঝুঁকে যেন মুখ নামিয়ে দিল, হ্যাঁ পোড়া দেহের কানে কানে কথা বলে

চলেছে। কিছুক্ষণ পোড়া দেহের সঙ্গে মিশে রইল যুবতী। তারপর ছুটে গেল অন্য মৃতদেহের কাছে। স্পর্শ করল হিত্তীয়কে। কান্না কি উচ্চকিত হয়ে উঠছে! মাটিতে এখন মাথা কুটছে মেয়েটা। দুটি দেহই মেয়েটার আপন ছিল। দু'জনের কারওই মৃত্যু চায়নি সে। অথচ এই মেয়েটাই সেই হেতু, যা দুটি হৃদয়কে চিরকালের মতো থামিয়ে দিল।

এই মেয়েটার অপমান করেছিল অম্মোন? এইই কি অপমানের ছবি! এই বৃষ্টিময় অশ্রু কার চোখে রাখবেন শলোমন! তিনি যে একাধারে অম্মোন এবং হেত— তিনিই ঘাতক, তিনিই খড়গ-বিচ্ছিন্ন। কিন্তু মরুভূমি এ-কথা বুঝবে না।

সন্ধ্যার পরও বৃষ্টি ঝরিয়া শেষ হইল না। যুবতীকে আর দেখা গেল না, বৃষ্টির আঁধারে সে লুপ্ত হইয়া গেল। বৃষ্টি থামিলে শৌলশীর্ষে ধ্রুবা-জহুরা জাগ্রত হইলেন। তিনি বৃষ্টির অবগুণ্ঠন হইতে পর্দা মুছিয়া দিয়া আনন বাহির করিলেন। ইহা সন্ধ্যা-তারকা, চাঁদের মতো আলো দিতে না পারলেও, ইহা দাপাইয়া ঝলসিয়া উঠে। তাহার মাংস খসিয়া পড়িবে বলিয়া ভয় হয়। কিন্তু খসে না, কেবল দাপায়।

শলোমন শৌলগৃহ ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে শৌলশীর্ষে চাইলেন। ধ্রুবা-জহুরার দাপানি লক্ষ করলেন কিছুক্ষণ। সেই ঊর্ধ্ব-বিকশিত আলো উপত্যকাকে মিষ্ট করে তুলেছে। সব স্পষ্টতা পায় না, কিন্তু কিছু তো প্রত্যক্ষ করায় এবং স্নিগ্ধ করে তোলে। খানিকটা নিচে নেমে আসেন সম্রাট। মৃতদেহ দুটি কোথায়?

চমকে উঠলেন সম্রাট। বিষম আশ্চর্য ঘটনা। পোড়া দেহখানি একা পড়ে রয়েছে। হিত্তীয় দেহখানি উধাও, যুবতীও নাই। সঙ্গে সঙ্গে শলোমন সাদা ঘোড়া বার করে পিঠে চেপে বসলেন। ধ্রুবা-জহুরার দীপ্তির মধ্যে রামাসিস ছুটে চলল।

উত্তর দিকে কিছুক্ষণ ছুটে যাওয়ার পর মনে হল, ওরা নিশ্চয়ই এতখানি পথ অতিক্রম করতে পারেনি। তা হলে গেল কোথায়? উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন শলোমন। কোথায় গেল তারা? কোথায় লুকিয়ে পড়ল? সারা রাত অনুসন্ধান চালালেন তিনি। তাঁর ছায়ামূর্তিরাও নিশ্চয়ই পথে নেমে গিয়েছে। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখায় শলোমনকে। ছায়ামূর্তির হাতে পড়লে ওদের আর রক্ষা নেই। কিছুতেই ওরা বাঁচতে পারবে না।

সূর্যোদয়ের তখনও দেরি, সমুদ্রের দিকটা ফর্সা হয়ে আসছে। শলোমন উত্তরের এলোন বনের কাছে আবার ফিরে এসেছেন। একটি দেবদারু গাছের আড়ালে ওদের পাওয়া গেল। সম্রাটকে দেখে কঠিন দৃষ্টিতে ভয়ে নির্বাক চেয়ে রইল ওরা। শলোমন সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেননি, পাছে এরা ভয় পায়।

সম্রাট বললেন— বৃষ্টি আর সন্ধ্যার অন্ধকার তোমাদের সহায় ছিল জানি। কিন্তু আমি তো খুঁজে মরছি তোমাদের! ওহে ছোকরা, উঠে এসো। সূর্য ওঠার আগেই তোমাকে পালাতে হবে। ইফ্রোনের পুরনো নাম অর্বপুর। অর্বপুরের প্রাচীন সর্দারের হাত থেকে তোমার পূর্ব-পুরুষ কোনও হিত্তীয় এই অঞ্চল কেড়ে নিয়ে বসতি গড়েছিল। মনে রেখো তোমার মহাপিতা ইফ্রোন আব্রাহামকে যে সমাধির জন্য মৃত্তিকা বেচেছিলেন, তা-ও হিসেব ধরলে অর্বপুরের সর্দারের মাটি। কিন্তু ইতিহাস সেই সর্দারকে মনে রাখেনি। তোমরা সভ্যতা, অশ্ব এবং লৌহের অহংকার কর, ঠিকই কর, কিন্তু মাটির অহংকার মানায় না। যাও, চলে যাও। রাম তোমাকে নিয়ে যাবে।

দ্রুত। সূর্য ওঠার আগেই তোমাকে চলে যেতে হবে।

সম্রাট যে তাঁকে হত্যা করলেন না, বরং পালিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়া দিচ্ছেন, এই ঘটনা ঘাতক হিত্তীয় জিম্মু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, তার মনে হল, সম্রাট তাকে ঠাট্টা করছেন। তবু সে ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল। এবং এগিয়েও এল সম্মুখে কিছুটা। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লেন সম্রাট এবং রামকে এগিয়ে দিলেন ছোকরার দিকে।

—ঘোড়া আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

—প্রাচীন অর্বপুর। একটি ক্ষুদ্র আশ্রয়-নগরী। সমস্ত উপত্যকা-অঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী ভূভাগ এখন আর অর্বপুর নয়। এখন আধুনিক নাম ইফ্রোন। তুমি যাচ্ছ অর্বপুর, এখন যেটা শুধু একটা ছোট শহর। এই আশ্রয়-নগরীতে যে কেউ যেতে পারে না। প্রবেশদ্বারেই সশস্ত্র প্রহরী অস্ত্র দিয়ে পলাতকের মাথা ফেলে দেয়। রাম তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে, তোমার বিপদের আশঙ্কা নেই।

—আমাকে রক্ষা করছেন কেন? এই প্রাণ নিয়ে আমি কী করব? আমার বোন আমাকে জোর করে এখানে এনে ফেলেছে।

—আমি জানি, তুমি বাঁচতে চাও। এ-ও জানি অম্মোনকে হত্যা করে মনে তোমার কোনও অনুশোচনা নেই। এটাকে তুমি পবিত্র কাজ মনে করেছ। তবু তুমি বেঁচে থেকে বোঝার চেষ্টা কর, প্রাণ অতিশয় মূল্যবান এবং তোমারও একটি হৃদয় আছে; ওই হৃদয় নিশ্চয় একদিন চিন্তা করতে শিখবে। মানুষের হৃদয় লৌহরথ অপেক্ষা তেজস্বী। মহাপিতা লোত আমাকে ক্ষমা করুন!

বলে সম্রাট আকাশের দিকে দু হাত তুলে অসহায় ভঙ্গিতে চেয়ে থাকতে থাকতে দু চোখ সজল করে তুললেন। তিনি জানেন, তাঁর এই চোখের জলকে মানুষ বিশ্বাস করে না। ভাবে, এই অশ্রুও কোনও কৌশল। তাঁর দুর্গ শৌলগৃহ কি আসলে কোনও চতুরতা-গৃহ!

এ বার ঘাতক হিত্তীয় আর্তনাদ করে উঠল—বিশ্বাস করুন মহান সারগন আমি অম্মোনকে মেরে ফেলতে চাইনি! কিন্তু কী হল জানি না, কেন যে খুন চেপে গেল মাথায়! আমি জানি না কিছু!

দাদার এ কথা শোনামাত্র যুবতী বোনটি এ বার ফুঁপিয়ে উঠল শব্দ করে। সেই কান্না শুনে সম্রাট প্রার্থনারত দু হাত নামিয়ে নিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে চাইলেন। রাম হিত্তীয় ঘাতককে পিঠে করে নিয়ে অর্বপুরের দিকে মরুঘূর্ণির মতো উড়ে গেল।

—তোমার নাম কী মেয়ে? প্রশ্ন করলেন সম্রাট শলোমন।

মেয়েটি কান্না থামাতে থামাতে উত্তর দিল—রিদি। রিদি হিব্রোন।

—এখন তুমি কোথায় যাবে?

—জানি না। আমার কোনও পথ নেই। অথচ দাসী হাগারের মতো আমি এই মরুভূমিতে কোথাও হারিয়ে যেতেও পারব না।

সম্রাট চরম বিস্মিত হয়ে বললেন—তোমার ইশ্মায়েল কোথায়?

—সূর্য-মন্দিরে রেখেছিলাম, কোথায় চলে গেছে। ছেলে আমার ফরমাশ খাটত দাসীদের।

—সূর্য-মন্দির?

—আজ্ঞে। পাপের জায়গা। অম্মোন আমাকে ওখান থেকে ঘরে এনে তুলেছিল। আগে যখন পতিত হয়ে সূর্য-মন্দিরে যাই, দাদা একদিনও খোঁজ করেনি। পরে যখন আমার অম্রাম তাঁবুস্থলীতে এনে ঘর দিল, দাদা ছুটে এসে বলল, নচ্ছার মেয়ে! তুই এ কী করলি!

—কী করলে তুমি ?

—বিশ্বাস করুন, আমার ইশ্মেল কোনও সৈনিকের অবৈধ-পিণ্ড ছিল না, অম্মোনের ঔরস ছিল প্রভু। কিন্তু তা-ও যে সমাজের চোখে ঘেন্নার মাল মহামতি! আমি অশুচি হয়েছি।

বলে কাঁদতে কাঁদতে পথেরই উপর বসে পড়ল রিদি। দু হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগল। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শলোমন। মেয়েটিকে কী বলবেন, ভেবে পেলেন না দণ্ড কতক। যেন তাঁর ধী-ঘড়ি কোনও সঙ্কেত দিচ্ছিল না তাঁকে। এ যে বেশ্যা সারিনের চেয়েও ভাগ্যহত। আমেনোফিসের পবিত্র সূর্য-মন্দিরগুলি এখন যৌন-কলুষে পরিপূর্ণ। নাম মন্দির হলেও, অধিকাংশই বেশ্যাখানা। পুরুতরা শস্তায় দাসীবেশ্যা কেনাবেচা করে। তা ছাড়া সৈন্যরা ওই মন্দিরে কাম চরিতার্থ করতে যায়। সৈন্যবাহিনী পুষতে হলে মন্দিরগুলিকে দাসীবেশ্যায় ভরে রাখতে হবে। যুদ্ধ আর আক্রমণকারী কাম ছাড়া কি সাম্রাজ্য টেঁকে না ?

যুদ্ধে পুরুষ ক্ষয় অনিবার্য, নারীসংখ্যা এখন পুরুষের অনুপাতে অনেক বেশি। সম্রাট দাউদ ওই মন্দিরগুলিকে নারীদাসীবেশ্যায় ভরে রেখে গেছেন, রেখে গেছেন বৃহদাকার হারেমসমূহ।

রিদির মুখটা যেন কার মতো! শলোমনের হৃদশক্তি স্মৃতিপূর্ণ এবং স্মৃতিরা সহজে ক্ষয় হতে চায় না। কার মতো মুখটা! মনে করতে কষ্ট হচ্ছিল বটে। খানিক বাদেই সম্রাট চমকে উঠলেন। এ যে গলিয়াতের ভগিনী আনাথের মতো দেখতে! কিন্তু তিনি আনাথকে মনে রাখলেন কী করে! এমন তো হওয়ার কথা নয়। স্মৃতির এই চাতুর্য দেখে নিজেকেই মনে মনে তিরস্কার করলেন সম্রাট।

হঠাৎ রিদিকে বললেন—তবু সেই দাদাকে তুমি বাঁচালে রিদি! তুমি সামান্য হয়েও সামান্য নও, তোমাকে আমি এখন কোথায় রাখব!

—আপনার অনুগ্রহে দাদা জীবন পেল! কিন্তু আমার যে সর্বস্ব চলে গেল মহানুভব!

—হ্যাঁ। আমি তোমার জন্য কী করতে পারি ?

—আমার প্রাণই যথেষ্ট। সৌভাগ্য আমার, এখনও বেঁচে রয়েছি। আপনাকে চোখে দেখলাম, এর চেয়ে আর কিছুই মহৎ নয়।

—তুমি তো বেশ কথা বলতে পার। শোনো, তোমাকে আমি হারেমে রাখতে পারি। যাবে ? সেখানে খাওয়া পরার খানিকটা সুখ আছে। তবে...

—বলুন!

—তবে তেমন পুরুষ-সংস্পর্শ পাবে না! ওটা পুরনো হারেম। বৃদ্ধ রাজারা যেখানে যায়। যাবে তুমি ? বুড়ো রাজারা খুব বিকৃত হৃদয়ের, ওরা কাউকে ভালবাসতে পারে না। তা ছাড়া অনেকের যৌনব্যাধি রয়েছে। এবং ওরা নারীর

সমকাম উপভোগ করে। এই সব মেনে নিতে পারলে খেতে পাবে যা হোক, ভালই পাবে!

—আমি অম্মোনকে ভালবাসতাম হুজুর! বলে রিদি এ বার ফেটে কেঁদে উঠল। সেই কান্নার আঘাত যেন সম্রাট শলোমনকে অশ্বক্ষুরের আঘাত করে উঠল। তিনি কি হতভাগ্য সর্বস্বান্ত যুবতীর সঙ্গে হৃদয় নিয়ে খেলা করছেন মাত্র! তিনি কী করে মুখে উচ্চারণ করছেন এই সব ?

কাঁদতে কাঁদতে আপন মনে এক সময় থামল রিদি। বসনের প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছল বারবার। বৃষ্টিভেজা কাপড় গায়েই শুকিয়েছে, তার বৃষ্টিভেজা চেহারা মরু-পারাবতের মতো বিমর্ষ।

হঠাৎ রিদি মুখে ঝলমলে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল—আমি যাব সম্রাট। পেট বড় বালাই। তা ছাড়া একটি যুবতীর পক্ষে আর একটি যুবতীকে ভালবাসা কী এমন কঠিন! অম্মোনের ছোঁয়ায় অশুচি মেয়েকে হারেমের মেয়েই বুঝতে পারবে। আমি যাব!

শত দুঃখের মধ্যেও মেয়েটি হাসছে কেমন করে! শলোমন বেশ কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রিদি হিব্রোনের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কোনও অম্মোনের সঙ্গে কোনও নারীর যৌন-সংসর্গ ঘটলে সেই নারী সংসারের চোখে অশুচি হয়ে পড়ে। একটি বেশ্যাও এই অশুচিতাকে ভয় পায়। নইলে এই মেয়েটি সূর্যমন্দিরেই ফিরে যেতে পারত। মরুভূমিতে যৌনতা কী অমোঘ! এখানে মানুষ লিঙ্গাগ্র ছেদন করে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা লিখে রাখে।

এই সব কথা হৃদয় দিয়ে চিন্তা করতে করতে সম্রাট শলোমন রিদির মুখে চেয়ে রইলেন এবং অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর শ্লথসুরে বলে উঠলেন—আমরা এখন রামের জন্য অপেক্ষা করব। ও ফিরলে পর...বলে সারগন প্রথমে উত্তরের দিকে চাইলেন, এখনও রামকে ফিরতে দেখা যাচ্ছে না। ঘাড় ফেরালেন দক্ষিণের কৌণিক উচ্চতার মরু-সরণির দিকে, ওই পথেই ইফ্রোন-উপত্যকা ; এখন ঢালে নেমে আসছে কারা যেন! বোধহয় একদল লোক।

হ্যাঁ, ঠিকই। একদল লোকই বটে। তাদের সম্মুখে একটি খচ্চরকে দেখা যাচ্ছে। খচ্চরের পিঠে কী যেন চাপানো হয়েছে। লোকগুলির মুখে কোনও কথা নেই। ওরা আরও এগিয়ে আসতে লাগল।

শলোমন চাইলেন ফের উত্তরের দিকে। লিবানন পাহাড়ের যে পথটি কারমেল গিরিবর্ত্মে ঢুকেছে, সেই পথ বেরিয়ে এসেছে সম্মুখে। ঠিক সেই পথেই কোমল আঁধার হালকা হয়ে মিশে থাকা এই প্রত্যুষে অদ্ভুত এক দৃশ্য জেগে উঠেছে। আলো ভাসিত একটি চমৎকার শিবিকা গুনগুন করতে করতে এ দিকে এগিয়ে আসছে। লিবাননের রাজার উপহার এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত মূল্যবান মরুকাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত শিবিকা। এই শিবিকাটি আট বেহারা কাঁধে করে বয়ে আনছে।

দক্ষিণের উচ্চ মরু-সরণি থেকে নেমে আসছে খচ্চরপৃষ্ঠে অম্মোনের মৃতদেহ। নিশ্চয়ই ছায়ামূর্তিরা পোড়া দেহটাকে অম্মোনীয়দের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। হাবিল-কাবিলকে সম্রাট বলেছিলেন—মৃতদেহ এখনই উপত্যকা থেকে সরিয়ে দিও না। সৎকারের জন্য অম্মোনীয়রা এই দেহ চাইতে পারে। আপাতত থাক। এই

মৃত্যুকে গোপন করতে চাই না, কারণ এই দুর্ঘটনা গোপনে ঘটেনি। মৃত অম্মোন বৃষ্টিতে ভিজছে, ভিজতে দাও।

লিবাননের কাঠ প্রসিদ্ধ। সেই কাঠের শিবিকা আলোকময়, এই শিবিকায় চড়ে কী করা যায় ? আর্য রক্ত-মিশ্রিত ফরৌন-রাজকন্যাকে বিবাহ করা যায়। বৃষ্টিস্নাত মরু-প্রত্যুষ। ঠিক এখন আনাথের মুখটাই কেন মনে পড়ছে ! একদিকে অম্মোনের মৃতদেহ, অন্য প্রান্তে ঝিমঝিম করছে ধেয়ে আসা শিবিকা।

অশ্বেতর প্রাণীটিকে দেখে এ বার সজোরে ফুঁপিয়ে উঠল ছিন্ন-বসনা রিদি হিব্রোন। শলোমন সচকিত হয়ে উঠলেন। স্বগতোক্তির মতো করে বললেন—ভাল হয়, যদি কোনও সেনাটেনা এই পথে এসে পড়ে ! [ছায়া-সারগনরা কোথায় ! এটুকু মনে মনে বললেন শলোমন।]

ফোঁপানির মধ্যেও সম্রাটের উচ্চারিত উক্তি কানে গেল রিদির। সে শিউরে উঠে বলল—না, না, সম্রাট, মহাপ্রভু ! কোনও সেনার হাতে আমাকে দেবেন না। দোহাই আপনার !

—কেন ?

—ওরা অসহ্য। আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে। আমি আর হারেমে পৌঁছতে পারব না।

—তা কেন। তুমি নিশ্চয়ই যাবে সেখানে।

—প্রভু, ওরা ভোগ করে মেয়েমানুষকে পথে ফেলে দেয়। মেরেও ফেলে দেয়। ধর্ষণ আর খুন কিতাবের দুইটা মলাট আজ্ঞে ! মাঝখানে রাজাবাহাদুরের লেখা কেচ্ছা হুজুর ! মরুভূমি খুলা বহি। রাজারা আপনার লোক লাগিয়ে নিজের নামে সুসমাচার লিখিয়ে নেয়, মিছা কথা সুন্দর করে সত্য করে—অম্মোন আমাকে বলেছে। আমাকে বাঁচান নরদেবতা সারগন।

—ঠিক আছে। তুমি কবুল কর, যা ঘটল কোথাও বলবে না। ওই শিবিকা তোমাকে হারেমে নিয়ে যাবে দাউদ-নগরের সীমান্ত বৈথেল-ভূমে। তোমাকে বিবাহ-বেশ দেওয়া হবে। মাটির ইটের রোদ-পোড়া দ্বিতল হারেম। কিছুটা অস্বাস্থ্যকর হলেও, খাদ্যের ব্যবস্থা মাঝারি-উত্তম। তোমাকে রাঙিয়ে সুগন্ধিত করা হবে। তুমি কেঁদো না।

রিদির মুখটা আবার চাপা আনন্দে ভরে উঠল। অম্মোন-বাহিনী আরও এগিয়ে এল। এগিয়ে এল শিবিকা। অম্মোনীয়রা কালো পোশাক পরেছে, মূক এবং অধোমুখ। তারা সংখ্যায় সামান্য। কিন্তু দেখতে দেখতে অন্যান্য জাতির লোক এসে জড়ো হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে চকিতে গালিয়াতের মুখটা একবার ভেসে উঠল আর দেখা গেল সারিনকে। সম্রাট লক্ষ করলেন, জনবাহিনীর মধ্যে একটিও হিত্তীয় নেই। না, একজন রয়েছে বটে, করিন। একে সম্রাট চিনতে পারলেন না।

মরুভূমিতে এ এক আশ্চর্য জন-উদ্যোগ আর ভিড় লক্ষ করছিলেন শলোমন। ভিড় ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। কোনও অম্মোনের এই জাতীয় মৃত্যু কি উপভোগ করে মানুষ ? নাকি এই মৃত্যুশোক তাদের বিচলিতও করেছে ? কিংবা তারা ঘাতক হিত্তীয়ের কী হল জানতে উৎসুক ?

সারিন সম্রাটের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। ঠিক এই সময় কোথা থেকে উড়ে এল

তীব্র বেগযুক্ত পাথর আর তা এসে লাগল শলোমনের কপালের এক পাশে। মানুষরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সম্রাট ক্ষিপ্র হাতে কপালের ওই অংশটা চেপে ধরলেন। মুহূর্তে তাঁর হাত রক্তে ভিজে গেল। শলোমন বুঝলেন, কেউ তাঁর দিকে ফিঙ্গা ছুঁড়েছে। কপালটা হাত দিয়ে চেপে ধরেই ডান পাশে ঘুরে দেখলেন অশ্ব রামাসিস অর্বপুর থেকে ফিরে এসে তাঁর পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল। খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল শিবিকা। কপাল চেপে ধরেই শলোমন সারিনকে বললেন—তুমি রিদিকে যথাবিহিত পুরনো হারেমে পৌঁছে দিও। বলেই সম্রাট চকিতে লাফিয়ে উঠে পড়লেন রামের পিঠে। অত্যন্ত উঁচু রাজপশুর পিঠে বসে সাদা উড়নি চেপে ধরা কপালে হাত রেখে তিনি দেখলেন, জনবাহিনীর দক্ষিণ-অংশে অশ্বারোহী ছায়ামূর্তি একজনকে গ্রেফতার করার জন্য লাফিয়ে পড়েছে।

দক্ষিণের তৃতীয় তোরণে পৌঁছে শলোমন দেখলেন, গালিয়াৎ কখন মুহূর্তে তাঁর কর্তব্য-কাজে ফিরে এসে চারপায়ে উপবেশিত। তোরণদ্বার খুলে দিল। ঝড়ের বেগে রাম ছুটে গেল মরু-উপত্যকা ইব্রোনের শৌলবাসের দিকে। শৌলগৃহে ঢুকে শলোমন একা একাই দাওয়াই নিলেন কপালে, এ দুর্গ নির্জন, এখানে তিনি কোনও পত্নীকেও রাখেন না। মোশির সীনয় পাহাড়ের ধ্যান এবং একাকিত্ব এই দুর্গে আরোপ করেছেন রাজচক্রবর্তী শলোমন।

কপালে হেকিমি দাওয়াই লিপ্ত ফেটি বেঁধে নিয়েছেন সম্রাট। তিনি তাঁর নিজের জন্য কখনও রাজবৈদ্যের চিকিৎসা বা পরামর্শ নেন না। তিনি নিজেই সুচিকিৎসক। তিনি কুষ্ঠ সারাতে পারেন। পারা রোগের ঔষধ দেন। মরুভূমিতে এই দুটি রোগকে মানুষ সবচেয়ে ভয় এবং ঘৃণা করে। মহামারী বীভৎস ব্যাধি হলেও তা মহাআতঙ্ক বিশেষ, কিন্তু তাতে ঘৃণা জাগে না।

সম্রাট আহত ঠিক, কিন্তু তিনি বিষম বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবছিলেন, কে এভাবে ফিঙ্গা ছুঁড়ল ? অবধারিতভাবে এ নিশ্চয়ই কোনও অম্মোন নয়। কোনও হিত্তীয় কি ছদ্মবেশে ছিল ? সবটাই কষ্টকল্পনা হতে পারে। শৌলগৃহের অভ্যন্তরে যাকে ধরে আনা হল, সে তো একজন পাগল। মরুগ্রীষ্মের তাপে, ধোঁয়ায়, দারিদ্র্যে এবং জ্বেনের তাড়সে অনেকে উন্মাদ হয়ে যায়। লোকে অবশ্য বিশ্বাস করে, শলোমন সহস্র সহস্র জ্বেন পুষে রেখেছেন। এই পাগল কেন তাঁর দিকে ফিঙ্গা ছুঁড়ে মারল।

—ভালই করেছ হাবিল যে, পাগলটাকে অসি দিয়ে ছিন্ন করে দাওনি।

—হুজুর, এই দেখুন ফিঙ্গাটা। এর চামড়ার মুঠিতে কী সব ছবি-নকশা-অক্ষর ! খুবই অদ্ভুত। কোনও লিপিকারকে ডাকতে হবে ? ঐতিহাসিক নাথন-পুত্র রাজমন্ত্রীকে ডাকব কি মহাজ্ঞানী, প্রভু ?

বলে হাবিল ফিঙ্গাটা সম্রাটের হাতে তুলে দিল। মনোযোগ দিয়ে ফিঙ্গার মুঠির চামড়া পরীক্ষা করে দেখলেন কিছুক্ষণ, সম্রাট। তারপর কিছুক্ষণ পাগলের মুখপানে চেয়ে রইলেন।

—পাগলটা বোবাও মহানুভব !

—ওর মুখেও তুমি আঘাত করেছ !

—প্রথমে বুঝতে পারিনি, উন্মাদটা কথা বলতে পারে না ! কথা আদায় করার জন্য...ক্ষমা করুন সারগন, গুপ্তচররা অনেক সময় মূকাভিনয় করে। আঘাত করে

বুঝেছি, হয়তো বোবা ! আপনি পরীক্ষা করুন ওকে ।

—ধন্যবাদ হাবিল ! তুমি ওকে হত্যা করনি । হত্যা করে ফেললে, আমার বলার কিছু ছিল না । তুমি ছায়া হলেও সারগনের হৃদয় তোমাকে ঘিরে আছে, তুমি এসো এখন । বলেই সম্রাট ফিঙ্গাঅলার দিকে চাইলেন ।

ছায়ামূর্তি চলে যাচ্ছিল, পিছন থেকে ডেকে উঠলেন শলোমন— শোনো, কাবিল ! লিপিকার খেতা গালিয়াৎকে পাঠিয়ে দাও । ছবি এবং অক্ষরের রূপান্বয় এবং রূপান্তর সম্বন্ধে তার বিদ্যাকে পরখ করা যেতে পারে । কেন ডাকছি, বলার আবশ্যকতা নেই ।

—না । আপনার সর্বস্ব গোপন করা এবং সময় বিশেষে উন্মোচন করা আমার কাজ । আমরা জানি, কাকে কী বলতে হয় । বলি কি, গালিয়াৎ যোগ্য সন্দেহ নাই । তবু ওর ক্ষমতা এবং হৃদয় পরীক্ষা করলে ভাল হয় । বৃষ্টির সময় ওই পাগলটাকে আটকে রেখেছিল গালিয়াৎ তোরণদ্বারে ।

—ঠিক আছে । ঘটনার ভিতর দিয়েই ওকে পরীক্ষা করা হবে । সারিনকে শিবিকাসহ পাঠাবে আর মরুমিছিলকে অনুসরণ করবে । যাও ।

গালিয়াৎ শৌলগৃহে এই প্রথম ঢুকল, আগে এর অভ্যন্তর কখনও দেখেনি । কেমন একটা বাসন্তী আলো অমরাবতীর মতো বিভাসিত করে রেখেছে দুর্গের ভিতর-বিভাগকে । গালিয়াৎ বুঝতে পারছে না, কেন তাকে এ ভাবে ডাকা হল !

গালিয়াৎ প্রবেশ করবামাত্র ফিঙ্গাটিকে মেঝেয় ছুঁড়ে দিলেন সম্রাট । সেটি মেঝেয় পিছলে এসে গালিয়াতের পায়ের কাছে পড়ল । শলোমন বললেন—আমি কেন আহত হয়েছি, বলতে পার ? ফিঙ্গাটা পরীক্ষা করে বল, ফিঙ্গাটা কার ? সন্দেহ করা হচ্ছে, এই বোবা পাগলটা ওটি ছুঁড়েছিল । এই পাগলকে কে বা কারা পাঠিয়েছে ? কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন রয়েছে ফিঙ্গার মুঠিতে, দেখে নাও ।

ভয়ে ভয়ে গালিয়াৎ ফিঙ্গাটা পায়ের কাছ থেকে উঠিয়ে নেয় হাতে । হাতে নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সে একবার মাত্র মুঠিটার দিকে চেয়ে দেখে নিল, তারপর বলল—বৃষ্টির সময় রিদি হিব্রোনের পিছু পিছু এই পাগলটা উপরে উঠে আসতে চাইলে, একে আমি ঠেকিয়ে রেখেছিলাম । রিদি কাঁদতে কাঁদতে উপরে চলে যায়, কখন চলে যায় চোখের পলকে, সেনারা ওকে দেখেও দেখে না, তা ছাড়া বৃষ্টিতে সবই ঝাপসা ছিল হুজুর !

—রিদির প্রসঙ্গ থাক । তুমি তো লিপিকার, বল এ কি সত্যিই পাগল ? এর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, বোবাটা কারও ইঙ্গিতে এ কাজ করেছে । তুমি পুরনো অক্ষর কি চিনতে পার ?

—আজ্ঞে, সামান্য সামান্য । এখানে পুরনো আলিফ আর একটি কূপের সাংকেতিক অক্ষর রয়েছে মহানুভব । হ্যাঁ, জিমেল আছে, একটা অনার্য উট, মনে হয় উটের তখন কুঁজ ছিল না, এটা ষণ্ডও হতে পারে । তা ছাড়া এটি সন্ধি-ফিঙ্গা, এ দিয়ে মানুষ বধ করা নিয়ম নয় ।

—কী নিয়ম ? সন্ধি-ফিঙ্গা বলছ কেন ?

—এই কূপটা বীরশিবা হতে বাধ্য ।

—কেন ?

—দিব্যের কূপ হলে এই চিহ্ন স্বাভাবিক । মরুভূমির অক্ষরমালাকে মরুচিহ্ন দিয়ে

বুঝতে হবে । কূপটা আজ্ঞে স্পষ্ট । আপনি কোনও ঐতিহাসিককে দিয়ে পরীক্ষা করুন । আমার যা বিদ্যে, তাতে সবটুকু কুলোবে না, হুজুর !

এবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন শলোমন । 'সন্ধি-ফিঙ্গা' কথাটি শ্রুতিতে কিছু অভিনব ঠেকলেও তিনি গালিয়াৎকে মনে মনে সমর্থন করলেন । কারণ ফিঙ্গা জিনিসটা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রতীক । ফিঙ্গা দিয়েই প্রথম ইস্রায়েলিরা তাদের সাম্রাজ্য পেয়েছে সম্রাট দাউদের মারফত । অবশ্য সন্ধি জিনিসটা যুদ্ধেরই মতো পুরনো ব্যাপার । যদিও এর সম্মানজনক উদাহরণ হিটাইট সাহিত্যেই পাওয়া যায় ।

—ঠিক আছে, তোমার বিদ্যাই আপাতত যথেষ্ট মনে হচ্ছে খেতা গালিয়াৎ ।

—লোকটা অমালেক হুজুর !

—হয়তো তাইই । মরুভূমির ফিঙ্গা বিচিত্র সংকেতধর্মী, আমার ধারণা এ সম্বন্ধে বিশদ নয় । তবে আমি মনে করি, কোনও সন্ধি-ফিঙ্গাও যুদ্ধে এবং জিঘাংসায় ব্যবহার করে মানুষ । শুধু পাখিটাখি মারে না । এ দিয়ে যা হওয়ার তাইই হয়েছে ।

—এটি অমালেকি কৌশল মহাজ্ঞানী সারগন ।

—তা হতে পারে । আবার এই ফিঙ্গা একজন আর্যও ব্যবহার করতে পারে । তাই না ? বলে সম্রাট গালিয়াতের মুখটা নিবিড়ভাবে লক্ষ করেন । কী ছায়া ভাসে ? কোনও ছায়া ?

—বীরশিবা (বের-শেবা) সন্ধিস্থান, দিব্যস্থান মহাজ্ঞানী রাজচক্রবর্তী । পুস্তকে এই কূপের ছবিটাই অঙ্কিত হয় । পলেস্তীয় সর্দারের সঙ্গে জাতির জনক আব্রাহামের বিবাদ এখানেই মিটেছিল । এখানেই ইশ্মায়েল জন্মেছিলেন । অভিমালিক আর ইব্রাহিম । অবিমেলক আর অব্রাম, আজ্ঞে !

—হ্যাঁ ।

—অমালেক এই কূপের দিব্য মানে । যদ্দুর জানি, ওদের ফিঙ্গাতেই...

—আর্য ফিঙ্গার সবকিছু আমার জানা নেই ।

—অমালেক...

—থাক । তুমি এসো এখন । তোমাকে কী করতে হবে, যথা সময়ে নির্দেশ পাবে । এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার আর কথা হবে না ।

—এই কূপের পাশে ঈশ্বর-বৃক্ষ এলা, এভাবেই শিক্ষক আমাদের বলতেন ।

—তাহলে এই উন্মাদ রাজরক্ত ঝরালো কেন গালিয়াৎ ? আমার মৃত্যুই তো কাম্য ছিল ওর । ছিল না ? একটি তথাকথিত সন্ধি-ফিঙ্গা যথেষ্ট জটিল এবং কুটিল প্রসঙ্গ । তোমার ইতিহাসবোধ খুব তীব্র খেতা গালিয়াৎ । আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি এসো এখন ।

খেতা গালিয়াৎ তোরণদ্বারে তার চারপায়ের কাছে ফিরে এল । চারপায়ে উঠে বসেই লক্ষ করল, একটি চমৎকার শিবিকা ইফ্রোন অভিমুখে চলেছে । আট বেহারা চলেছে কাঁধে করে । সম্মুখে সম্মুখে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে সারিন । দ্বার খুলে দিল গালিয়াৎ ।

অম্মোনদের মরুমিছিল নিঃশব্দ । এতক্ষণে হিত্তীয়রাও মূক-মিছিল বার করেছে । কারণ তারাও আর চুপ করে রইল না । এই বিদ্বেষ কি ইতিহাসে কখনও শেষ হয় না ? শেষ কিভাবে হবে ? বোবা উন্মাদটি যে আসলে বোবা নয়, উন্মাদও নয়, একথা

কি শলোমন বুঝতে পেরেছেন ? গালিয়াতের নিজেরই সন্দেহ উন্মাদটি বোবা নয় এবং বোবা লোকটি উন্মাদ নয়। বৃষ্টির মধ্যে লোকটি তোরণের চারপায়ের কাছে এসে গালিয়াৎকে গোপনে কোমরে বাঁধা ওই ফিঙ্গাটি দেখিয়েছিল এবং নিঃশব্দে কেমন ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসেছিল। কোনও কথাই বলতে চায়নি।

আদম বললেন, একদিকে শিবিকা চলেছে দাউদ-নগর-সীমান্তবর্তী বৈথেলধামে, অন্যদিকে বোবা-উন্মাদকে চড়ানো হয়েছে একটি উটে, উট চলেছে মরুদিগন্তে পাহাড়ের আড়ালে বধ্যভূমির খাদে। এই উটকে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়েছে গালিয়াতের উপর। বোবা-উন্মাদকে পাহাড়ের উচ্চতা থেকে গড়িয়ে ফেলে দিতে হবে এবং তা দেবে গালিয়াৎ। এক অশ্বারোহী চোঙা ফুঁকে মরুভূমিতে দ্রুতবেগে সেকথা প্রচার করে গেল ভোরের দিকেই। অম্মোন-হত্যার ঘটনা থেকে মানুষের দৃষ্টি সারগন-হত্যার অপচেষ্টার দিকে ঘুরে গেল।

আদম বললেন, তার আগে লক্ষ কর, উপরের সরণি থেকে নিচের দিকে রিদিকে নিয়ে নেমে আসছে শিবিকা। বিয়ের কনে বেশে সুসজ্জিতা, সুগন্ধিতা রিদি হিব্রোন। শিবিকার ভিতরে দুই নারী চলেছে হারেমে। সারিন আর রিদি। সারিন রিদিকে রেখে আসবে। মরুক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কয়িন আর আনাথ প্রত্যুষ থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা পতিপত্নী।

রিদি হিব্রোন মরু-আকাশ মথিত করে আর্তনাদ করে উঠল—হায় অব্রাম ! হায় ইশ্মেল ! কোথায় চলেছি মরুভূমির মা ইগার ! কোথায় লুকালে তুমি জননী !

সেই কান্না থামতে না থামতে চারপায়ের কাছে অশ্বারোহী ছায়া-সারগন এসে গালিয়াতের কাঁধ বরাবর দাঁড়িয়ে পড়ল। চাপা গলায় বলল—আমি তোমাকে অনুসরণ করব খেতা গালিয়াৎ। তুমি সম্রাটের অনুগত, আশা করি, উট খালিই ফিরে আসবে। উটের নবি সালেহের উট যেমন ফিরে এসেছিল। তোমার বোন আনাথ তোমাকে কিছু বলতে চায়। ওই দ্যাখ, ও এসেছে, তোমার জন্য খাবার বয়ে এনেছে, পিঠেপুলি। হা হা।

ছায়া-সারগনের কণ্ঠস্বর অবিকল শলোমনের মতো। অশ্বপৃষ্ঠে বসার ভঙ্গিমায় প্রকৃত সারগনের সঙ্গে কোনও পার্থক্যই নেই। গালিয়াতের মনে হল, শলোমনই তাকে অনুসরণ করছেন। এই ঘটনা শুরু হল সন্ধ্যার কিছু আগে, আকাশে দিনের বেলাতেই চাঁদ দেখা যাচ্ছে।

আনাথের চোখে জল টলটল করছে। আনাথ গালিয়াৎকে কোনও কথা উচ্চারণ করে বলতে পারল না। কেবলই কেঁদে যেতে থাকল। মেয়েটা এভাবে কাঁদছে কেন ! খাবারের পুঁটুলিটা আনাথ এগিয়ে দিল তার দাদার দিকে গালিয়াৎ লক্ষ করল, আনাথের সঙ্গে এসেছে তার স্বামী কয়িন হিব্রোন, বৎসর দুই হল ওদের বিয়ে হয়েছে। এই পাহাড়ি অঞ্চলের তলার দিকে কয়িন আনাথকে নিয়ে একটি কুটিরে বাস করে। এই বিয়েতে মা মিন্দা গালিয়াতের মত ছিল না।

বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে আনাথ কয়িন নামের ওই হিত্তীয়র গলায় বরমাল্য দিয়েছে। দেখা গেল, কয়িনের চোখেও জল। কয়িন চারপায়ের ধাপ ভেঙে উপরে উঠে এসে গালিয়াতের কানে কানে বলল—উটে করে যেতে যেতেই খেয়ে নিও। নইলে, পরে আর খেতে পারবে না। অবশ্যই খেও। ইফার বাজারে যদি যাও, আমার

সঙ্গে দেখা হবে। সঙ্গে একটা আতস কাচ রেখো।...

ফিশফিশ করে বলা একথা শুনে গালিয়াৎ অবাক হল। কয়িন একজন ব্যবসায়ী। স্বামীর সঙ্গে আনাথ তামার আতরদান এবং গোলাপপাশ তৈরি করে এবং মেষ পোষে। কয়িন আতরদান এবং গোলাপপাশের সঙ্গে খচ্চরের পিঠে পশম চাপিয়ে নিয়ে ইফার বাজারে বেচতে যায়। ওরা অত্যন্ত গরিব। দেখতে গেলে, রাজদুহিতা-রাজমাংস আনাথ একজন সামান্য ব্যক্তিকে বিয়ে করেছে। তাছাড়া গালিয়াতের সন্দেহ হয়, কয়িন একজন অসুর, নামের পদবি ভাড়িয়ে আনাথকে বিয়ে করেছে, কয়িন ফরাৎ নদীর ওইদিকে ছিল, কী করত আনাথকেও ভেঙে বলেনি। মোটকথা, কয়িনের আত্মপরিচয় সন্দেহজনক।

উটের পিছনে বসেছে বোবা-উন্মাদ। সামনে রশি ধরে গালিয়াৎ। এই উটকে অনুসরণ করছে একটি বাদামি অশ্ব। গালিয়াৎ বুঝতে পারছিল, বোবা-উন্মাদটির পরিচয় বোঝার উপায় নেই বলেই সম্রাট তাকে বধ্যগহ্বরে ফেলে দিয়ে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। মৃত্যু ভয়ে বোবা যদি কথা বলে ওঠে, তাই কি ছায়া-সারগন পিছু পিছু এগিয়ে আসছে !

বেশ কিছুদূর আসার পর পুঁটুলিটা খুলে ফেলল গালিয়াৎ। তারপর বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, দুইখানি অক্ষর-অঙ্কিত গমদানা। তাতে লেখা রয়েছে—'এই নবিই আমাদের বিয়ে দিয়েছেন। এঁকে হত্যা করো না। পাহাড়ে আত্মগোপনের জায়গা আছে, ওঁকে পালাতে দিও।'

আতস কাচের তলায় অঙ্কিত অক্ষরমালা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কয়িন আতরদান ও গোলাপপাশ ছবিবর্ণে অঙ্কিত করে। বর্ণছবির সূক্ষ্মতা ওরই আঙুলের শিল্প। খুব ত্বরিতে এ-কাজ সে করতে পারে। গমদানায় বর্ণছবি আঁকতে পারে, হয়তো এই চারুত্ব আনাথকে মুগ্ধ করে থাকবে। গালিয়াতের ভুরুর মধ্যভাগ সিরসির করে উঠল।

গম দানা দু'টি স্বাভাবিক অপেক্ষা স্থূল। মুখে পুরে বেশ চমৎকার ভঙ্গিমায় গিলে নেয় গালিয়াৎ। তার শরীরের মধ্যে বজ্র-বিদ্যুৎবৎ চাঞ্চল্য ঢুকে যায়। গিলে ফেলার পর মনে হল, এই বোবা নবিটি কিছুতেই আর্য নয়, আর্য সেজেছেন। গালিয়াতের মনে হল, হয় ইনি অম্মোন, নয় মোয়াব, অথবা ইস্রায়েল কিংবা...

মনে হচ্ছে, কয়িন এবং আনাথ সমবেতভাবে যা ভেবেছে, তাতে কোথাও খাদ রয়েছে। আর্য এবং আদিবাসীরা কখনও নবি হয় না। তারা ওঝা হতে পারে, বীর হতে পারে। তারা নরদেবতা নয়, তারা দেবতার পূজা করে।

শলোমনের হৃদয় অত্যন্ত সতর্ক। তিনি গালিয়াৎকেই হয়তো পরীক্ষা করছেন। নইলে বোবা-উন্মাদকে পাহাড় থেকে খাদে গড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করলেন কেন ? সারা মরুভূমিতে তা প্রচার করাও হল। এই তথাকথিত বোবা নবির হাতেই শলোমনের মৃত্যু হতে পারত। যে-কাজ গালিয়াৎ করবে বলে মনে মনে ভেবে চলেছে, সেই কাজের অর্ধেকটা এই নবিই করে দিয়েছে, তবু লোকটাকে বাঁচাতে ইচ্ছে করছে না কেন ? তাছাড়া একে বাঁচানো সহজ নয়।

পরক্ষণেই গালিয়াতের মনে হল, এই বোবাটি হয়তো বাস্তবিক নবি। সে হয়তো শলোমনের পতনকে ত্বরান্বিত করবে। শলোমনের সমস্ত প্রতিজ্ঞাকে স্তব্ধ কর দেবে। একে মেরে ফেলা কিছুতেই ঠিক হবে না। এ হয়তো শলোমনের জ্ঞাতি-শত্রু, জানা

দরকার আসলে লোকটা সত্যিই কে ? এর মাংসের পরিচয় কী ? শলোমনের অনেক জ্ঞাতিশত্রুর চেহারায় আর্যত্বের ছাপ থাকে, থাকে হিত্তীয় আদল, তাই দেখে আজ আর কিছুই নির্ধারণ করা যায় না ।

গালিয়াৎ বোনের দেওয়া খাবার মুখে তুলতে গিয়ে থেমে গেল । পিছনে ফিরে চাইল । তারপর কী মনে করে প্রথমে বোবা লোকটিকে খাদ্যের ভাগটুকু এগিয়ে দিল । বলল—নাও ।

লোকটি প্রস্তুত হয়েছিল । লোভার্ত হাত এগিয়ে দিয়ে খাবারের টুকরো ধরতে গিয়ে কেমন থরথর করে কাঁপতে লাগল । গালিয়াৎ বুঝতে পারছিল, লোকটা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত । মুখের ভিতর থেকে জিভ বেরিয়ে পড়েছে । জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নেওয়ার চেষ্টা করছে । হাত বাড়িয়ে কোনক্রমে ধরল রুটির টুকরো । মুখে ঢোকাতে গিয়ে পারল না । খাবার তার কোলের উপর পড়ে গেল ।

তারপর কোল থেকে তুলে নিয়ে ফের মুখে ঢোকানোর চেষ্টা করল লোকটা । দ্বিতীয় দফাতেও ব্যর্থ হল সে । ক্ষুধার্ত অথচ খাদ্য গলায় নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে ।

গালিয়াৎ লক্ষ করল, যোদ্ধৃবেশ সারগন হয়তো এই ঘটনা লক্ষ করছেন । এই ছায়ামূর্তি শলোমন নিজে হলেও বিস্ময়ের কিছু নেই । লোকটা কি পাহাড়ে পৌঁছনোর আগেই মারা পড়বে ?

দ্রুত তৎপরতায় বোবা লোকটির মুখে স্বহস্তে গালিয়াৎ খাবার গুঁজড়ে দিল । তারপরই মনে হল, সারগন এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন । বোবা নবির প্রতি গালিয়াতের এই অনুগ্রহ কি সমীচীন ?

সম্মুখে জোড়া পাহাড়, মধ্যবর্তী উপত্যকাভূমি বৃক্ষপুষ্পশোভিত, একটি ঝর্না মরে পড়ে আছে । ঝর্নার শুকনো খাতের দিকে চাইলে বুকের ভেতরটা হাহাকারে ভরে যায় । জোড়া পাহাড়ের কোনও একটাতে উঠে যেতে হবে । উটটাই জানে কোথায় যেতে হয় । এই পাহাড় মানুষকে গিলে নেয় । অদ্ভুত ।

উট পাহাড়ে উঠতে লাগল । এক স্থানে এসে দেখা গেল, পাহাড়ের এখানে শেষ রেখা, তারপর শূন্যতা এবং নীচে অতল গহ্বর । এখান থেকে মানুষকে ধাক্কা দিয়ে তলায় ফেলে দিলেই কর্তব্য শেষ ।

উট এবার সম্মুখের পা ভেঙে কোমর বসিয়ে দিল । নবিকে নামানো হল, উটের পিঠ থেকে । মৃত্যুর একটি নীল ছায়া পড়েছে লোকটার মুখে, ঠোঁট দু'টি সুর্মার মতো নীলচে কালো হয়ে উঠেছে ।

এখানে একটি স্তম্ভ-ফলকে লেখা রয়েছে—'সরক্ত, সপ্রাণ, সচল ও নিশ্চল প্রাণীদের পরিত্রাণ করেন যিনি তিনিই নবি । বীজকে যিনি সংরক্ষণ করেন তিনিই নবি । নবির সর্বোত্তম সংজ্ঞা দেওয়া গেল । কিন্তু সংজ্ঞার দ্বারা সব কথা বলা হল না । এক একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্বন্ধে গভীর পূর্বাভাস উপস্থিত করেন এবং পরিত্রাণ ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে যথাবিহিত ও যোগ্যতম ব্যবস্থা যিনি গ্রহণ করেন তিনিই একমাত্র নবি । তবে মনে রাখতে হবে, মোসি বা মোজেস বা মুশা সেই পরিত্রাতা নবি যিনি এই মরুভূমিতে প্রথম রক্তপাত করেন, একজন মিশ্রীয় গাড়োয়ানকে আঘাত করে হত্যা করেন এবং বালিতে পুঁতে রাখেন । তারপর পালিয়ে যান ।'

কথাগুলি পাঠ করতে করতে কেমন শিউরে উঠল গালিয়াৎ । সম্রাট দাউদ, যাঁকে আজকাল মানুষ নবি আখ্যা দিতে শুরু করেছে, তিনিও গালিয়াৎ-বধ দ্বারা জীবন শুরু করেছিলেন । মানুষের তাবৎ পবিত্র গ্রন্থ শোণিত-লিপ্ত ।

ভাবতে ভাবতে খেতা গালিয়াতের হৃদয় এক আঁধার-আবরণ খসিয়ে হঠাৎ বলে উঠল—বুঝতে পেরেছি । সম্মুখের এই ক্ষুদ্র নবিটি শলোমনের ললাট ছিন্ন করে রুধির বইয়েছেন, এইভাবেই তাঁর অভিযান শুরু হল । এই দিব্যদর্শীকে প্রণাম করা উচিত । কিন্তু...

প্রণাম করার জন্য অগ্রসর হতে পারল না গালিয়াৎ । ছায়ামূর্তিটি এখন আর একা নয় । দেখা যাচ্ছে, অন্তত একশত ছায়া-সারগন অশ্বপৃষ্ঠে ধেয়ে এসেছে জোড়া পাহাড়ের পথে, তারা ঘিরে ফেলেছে চারপাশ । কাউকে দেখে বোঝার উপায় নেই, এদের মধ্যে কে প্রকৃত সারগন ।

অন্তত শতেক সারগন-ছায়া গালিয়াৎ এবং ঘাতক বিদ্রোহীকে ঘিরে ধরেছে । দুই শত চক্ষু তাদের দেখছে । ভাবা যায় না এ কোন দৃশ্য রচনা করলেন শলোমন !

নীচে থেকে ছায়ামূর্তির কোনও একজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তুমি কি প্রস্তুত গালিয়াৎ ? তুমি বলেছ, তুমি তোমার রক্তমাংসের পরিচয় জানতে চাও না । তোমার হৃদয় যেন সত্য বলে । ঘাতককে জিজ্ঞাসা কর, তার নাম কী, সে কোন জাতির লোক । তাকে নগ্ন করে জেনে নাও, লিঙ্গাগ্র-চ্ছদ ছিন্ন কিনা, তার গোপন-অঙ্গে কী অনুজ্ঞা রেখেছেন সদাপ্রভু ? প্রশ্ন কর, প্রশ্ন কর গালিয়াৎ !

উচ্চনাদ বিশিষ্ট সেই কণ্ঠস্বর পাহাড়ে এসে ধাক্কা খেল । এ যেন মরুভূমির ধূমল অগ্নির কণ্ঠস্বর ফাঁপা নলের ভিতর দিয়ে আসছে । গালিয়াৎ অনেকক্ষণ কেমন বিমূঢ় হয়ে রইল, তারপর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্ষুদ্র নবিকে নগ্ন করে দিল । দেখল, বিদ্রোহীর লিঙ্গাগ্র বোজা ।

একজন ছায়া-সারগন পাহাড়ের তল থেকে অশ্বপৃষ্ঠে ধেয়ে এল । হাতের চাবুক বাতাসে ভাসিয়ে শূন্যে আছড়াতে আছড়াতে ছুটে এল । তারপর নগ্ন লোকটার চারপাশে ঘোড়াকে ঘোরালো । বাতাস চাবকাতে থাকল । কিন্তু নগ্ন মানুষটিকে কোনও আঘাত করল না । চাবুক পাথুরে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল—তুমি এর সদ্ব্যবহার কর গালিয়াৎ এবং কথা বার করতে না পারলে নীচে ফেলে দাও উন্মাদটাকে ।

বলেই অশ্বারোহী ছায়া-সারগন দ্রুত নিচে ফিরে গেল । নগ্ন লোকটাকে চাবকাতে চাবকাতে কেঁদে ফেলল খেতা গালিয়াৎ । মার খেতে খেতে লোকটা গোঙাতে থাকে একটু একটু করে, কিন্তু কথা কিছুই ফুটে ওঠে না তার মুখে । এ তবে বোবা অমালেক, এ তবে নির্বাক অম্মোন, ভাবাহীন মোয়াব, বধির ইদোম, ভাবাশূন্য গর্দভমনুষ্য ইশ্মায়েল । না, এ ইশ্মায়েল নয়, কারণ এর লিঙ্গাগ্রচ্ছদ ছিন্ন করা হয়নি । এ তবে কে ?

আব্রাহাম নিজের এবং সন্তানের লিঙ্গাগ্রত্বক ছিন্ন করে ঈশ্বর-অনুজ্ঞায় স্বজাতিকে মরুভূমিতে আলাদা করে নিয়েও পুত্র ইশ্মায়েলকে সেই মরুতেই নির্বাসিত করেন । পুত্র ইসহাকই ওই চিহ্নকে সার্থক করেন মনে হতে পারে, তা-ও সর্বাংশে সত্য নয় । ইসহাকের দুই যমজ-পুত্র ছিল । দণ্ড কতক আগে যে জন্মেছিলেন, তাঁর নাম এবৌ বা

ইদোম। দ্বিতীয় পুত্র যাকোব বা ইয়াকুব। এই যাকোবই ইস্রায়েল। এক্ষেত্রে যাকোব চালাক। ইদোম বোকা। ইদোমও মরুতে নির্বাসিত হন, ইনি বঞ্চিত এবং প্রবঞ্চিত। এই ইদোমের পুত্র ইলিফস। ইলিফসের পুত্র অমালেক। অতএব অমালেক হচ্ছেন ইদোমের নাতি।

বিদ্রোহবশত এই অমালেকীয়রা লিঙ্গাগ্রত্বক ছিন্ন করার নীতি উত্তমরূপে পালন করত না। কেউ ঈশ্বর-অনুজ্ঞা মাংসে চিহ্নিত করত, কেউ করত না। লোতের সন্তান মোয়াব বা অম্মোনরা অবশ্যই করত না। কারণ আব্রাহামের ঈশ্বর-অনুজ্ঞা লোতের পালন করার কথা নয়। অতএব এই নগ্ন বোবা-উন্মাদটি অমালেক হতে পারে, না-ও পারে, ইশ্মায়েল অবশ্যই নয়। কারণ ইশ্মায়েলীয়রা লিঙ্গাগ্রত্বক ছিন্ন করবে। এ তবে অম্মোনীয়, মোয়াবীয় অথবা অমালেকীয়। কে তুমি নগ্ন নবি ? কথা কও !

বলে আবার চাবুক মারে গালিয়াৎ। মার খেয়ে খেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে লোকটা। সমস্ত শরীর ছড়ে যায়, রক্ত পড়তে থাকে। কথা তবু ফুটে তো উঠল না। তখন প্রায় পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল গালিয়াৎ—এ আলবাৎ বোবা, এ নির্ঘাৎ উন্মাদ। এ বধির। এ মূঢ় মূক, একে ছেড়ে দিন মহানুভব মহাসারগন শুলায়মন !

—ছেড়ে দাও !

এক জলদ-গম্ভীর মরু-মেঘাম্বর যেন আর্ত-ব্যাকুলতায় কথা বলে উঠল। হাতের চাবুক থেমে গেল গালিয়াতের। পাহাড়ের তলদেশ থেকে উঠে এসেছে সুগম্ভীর নির্দেশ। গালিয়াৎ চেয়ে দেখল সেই শুভ্র অশ্বের বেগনি পোশাক পরিহিত নবি-সদৃশ আরোহীকে। অশ্বের কোমরে শোভিত কাঞ্চন-বেড়-মালিকা। উহার মরকতগুলি জ্বলিতেছে। ইনি প্রকৃত সারগন, বুঝা যায়।

—ছেড়ে দাও, নেমো এসো গালিয়াৎ! সেই সাদা ঘোড়ার আরোহী আবার বলে উঠলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র এবং উচ্চ হইলেও নিবিড় মমতা-মাখা। নির্দেশ দিবামাত্র, অতঃপর আশ্চর্য মোজেজার মতো তিনি অদৃশ্য হইলেন, মুহূর্তে উড়িয়া গেলেন। গালিয়াৎ হস্ত হইতে কশা ফেলিয়া দিয়া নিচে নামিতে লাগিল। শত ছায়া-সারগন চলিয়া গেল।

নগ্ন নবি জোড়া পাহাড়ে রহিয়া গেল। তারপর কী হইল দ্রুত জানিবার উপায় নাই। আশ্চর্য হতে হয়, শলোমন বোবা-উন্মাদকে হত্যা করতে দিলেন না। তবে মাঝে মাঝে অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যেত, জোড়া পাহাড়ের তলদেশে শতেক ছায়া-সারগনের সমাবেশ। তারা কি পাগল লোকটাকে নজরদারি করে ? নিশ্চয়ই করে। গালিয়াতের মনে হল, লোকটা কি তাহলে এখনও বেঁচে রয়েছে ? হয়তো আছে। মনে হল, উন্মাদটিকে সে কি একদিন খুঁজে দেখতে পারে না ?

রাত্রি গভীর হয়েছিল। ধ্রুবা-জহুরা শৌলগৃহের মাথার উপর থেকে অনেকখানি পূর্ব-দিগন্তে সরে গেছে। জলসত্রের জলদাত্রী সারিন ওর কুটিরে ফিরে গেছে অনেকক্ষণ। গালিয়াতের সঙ্গে আজ হাজারবিধ গল্প করেছে মেয়েটা। বলছিল, অফ্রার সূর্যমন্দিরে থাকার সময় তার দিনগুলি কেমন ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্পটি হল তার সন্তানকে ঘিরে। বাচ্চার জন্মের একুশ দিনের মাথায় ঘটনাটি ঘটেছিল।

অপর এক বেশ্যা দিব্যার বাচ্চা মরেছে শীতের কাপড়ে। তারপর থেকেই দিব্যার মাথাটা একেবারে গেছে। পাগলি দিব্যার কিন্তু কুনজর এসে পড়ল সারিনের বাচ্চার উপর। সারিন ঘুমিয়েছিল, কোলের কাছে ত্যানা জড়ানো ঘুমন্ত শিশু। উন্মাদিনীর লোভ ছিল অত্যন্ত বক্র। পাগলি করলে কি, ঘুমন্ত শিশুকে সারিনের কোলের কাছ থেকে এক রাতে উঠিয়ে নিয়ে চুপিচুপি সূর্য মন্দির থেকে ভেগে পড়ার চেষ্টা করল। ধরাও পড়ল মন্দিরের প্রহরী-পুরুত-দালালের হাতে। কিন্তু দিব্যার গলার জোর ছিল ভয়ানক, মাগি বলে কি ওই বাচ্চা ওরই বিয়োনো। এমনই খর গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল যে, মন্দিরের প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে ফেলল, এ বাচ্চা দিব্যারই নাড়ীছেঁড়া ধন। কেউ তো আর খেয়াল রাখত না, একই কামরায় থাকা দুই বেশ্যা কে কখন গর্ভ ধরেছে আর বিইয়েছে। আগে যে বাচ্চাটা মরে গেছে, সেটি তাহলে সারিনের বাচ্চা। এইভাবে সবই ওলোট-পালট হয়ে যেতে বসেছে দেখে সারিন সবার পায়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—ওগো, এ যে আমারই খোকা, তোমরা বোঝ না !

তা কে কার কথা শোনে ! সবাই মজা দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ভারি শোরগোলও হচ্ছিল। একজন মাতব্বর এসে থামালে সকলকে। সারিন লক্ষ করল, তার পক্ষেও লোক কিছু রয়েছে বটে, তবে দিব্যার সমর্থকই বেশি। আশ্চর্য হতে হয়, বুড়ি মাসি বাজিরা, যে কিনা আসল ঘটনা আগাগোড়া জানত, যে প্রসব পর্যন্ত করিয়েছিল নিজে হাতে, সে দিব্যার পক্ষ নিয়ে বসল। কেন ? কেননা, বাজিরা কিছুদিন যাবত চাইছিল সারিন মন্দিরের ঘর যাতে ছেড়ে দিয়ে পালায়, ওই ঘরে মাসি নতুন মেয়ে এনে ঢোকাবে, নতুন মেয়েটা মাসির ভাইঝি।

বাজিরা যখন বলছে বাচ্চা দিব্যারই, তখন তা যে সারগনের ঘোড়ার ভাষা, তাতে সন্দেহ কি, মাতব্বর দমে গেল, মাতব্বরের চেষ্টা ছিল বাচ্চাকে সারিনের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার। হল না। দিব্যা সগর্বে বুক ফুলিয়ে বাচ্চাকে বুকের দুধ দিতে থাকল সবার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রমাণ হয়ে গেল, বাচ্চা ওরই। সারিনের দু'টি চোখ মরীচিকার বাষ্পে ভরে গেল।

—তারপর কী হল ? আশ্চর্য-বিস্ময়ে শুধালো গালিয়াৎ।

সারিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—বল তো কী হল তারপর ? একটা রূপাজীবার কোল শূন্য হয়ে গেলে আর কী থাকে ! কিসের জোরে বাঁচব আমি ! আর্যবীজ ধরেছিলাম আমি গভ্ভে। সবই মিছে হয়ে গেল হায় ইলোহিম। কোথায় যাব, কী করে চলবে আমার !

—তারপর কী হল, বলই না !

—আমিও মিস্রিয়া দাসী ! ইগারের সন্তানের জন্য মমতা মনে পড়ে গেল। মনে জোর এল। মাতব্বরের পায়ে পড়ে গিয়ে বললাম, দয়াবান একটা কথা কই, এ বাছাটি কার শুলায়মানের সামনে গিয়ে বিচার হোক, আমি বিচার চাই।

বাজিরা দাসী গলা বাজিয়ে বলল—বেশ তো। সাক্ষীসবুদ নিয়ে চল, যাই। শুলায়মন তো আর সাক্ষীসবুদ বাদে পেটগড়া বিচার করেন না, আমি নিজ হাতে ওই পিণ্ড পয়দা করিয়েছি, এই দু'হাত সাক্ষী আমার ! দেখি সারগনের বিচার, দেখিই না, কী করেন রাজচক্রবর্তী।

বিচার করতে শলোমনের দণ্ড কতক সময়ের বেশি লাগল না, তিনি দুই মায়ের দাবি শুনলেন, সাক্ষীদের কথা মন দিয়ে শুনলেনই না, বাজিরা বকবক করে গেল আপন মনে।

শলোমন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বাজিরাকে বললেন—একটা কাজ করা যাক মাসিমা। দাবি যখন দু'জনেরই, তলোয়ার দিয়ে দু'ভাগ করে শিশুর কাটা দেহের একভাগ দিব্যাকে আর অন্যভাগ সারিনকে দিয়ে দিই। দাবি সমান, ভাগও সমান। কী বলেন কর্তামা, আপনি কী বলেন? ওগো দিব্যা, তুমি তো নিশ্চয়ই খুশি! আর তুমি, সারিন। তুমিও? কই জল্লাদ, কোথায়, ডাকো তাকে!

গালিয়াৎ বলল—এ ঘটনা তো আমি শুনেছি সারিন! তুমিই সেই মা? তুমি সম্রাটের সামনে কাঁদতে কাঁদতে আকুল হয়ে বলেছিলে··· বাজিরা আর দিব্যা না, বাজিরা দিব্যাকে চোখ ঠেরে সম্রাটের বিচারে রাজি হতে বলল, তাই না? কী পাজি-মা ওই দিব্যা, বাজিরার অন্তঃকরণ কী কুটিল, কী হিংসার আগুন জ্বালে আমাদের হৃদয় সারিন! তুমি বললে, দোহাই সারগন, মহানুভব! দয়া করে দিব্যাকেই দিয়ে দিন শিশুকে, আমার চাই না, আমি চাই না, এ হতে পারে না। আমি মা নই, কেউ নই আমি!

—হ্যাঁ, গালিয়াৎ। শুলায়মনের শিশুপ্রেম জগদ্বিখ্যাত। তুমিই বল, শুলায়মনের বিচার কী হতে পারে। তিনিই আমার বাছাকে আমার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনিই নাঙা নবিকে রক্ষা করেছেন! তিনিই রিদি হিব্রোনকে আশ্রয় দিয়েছেন।

—ওই পাহাড় কি কারও আশ্রয় হতে পারে সারিন!

—পারে না?

—কী খাবে? কীভাবে থাকবে লোকটা?

—আছে তো ভালই।

—তুমি কী করে জানলে? সারিন, বল আমাকে।

চাঁদের স্পষ্ট আলোয় সারিনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল নিমেষে। সত্যিই তো সে কী করে জানল? পাথরের স্তূপে বসেছিল সারিন। উঠে দাঁড়িয়ে বলল— আমি আর কী করে জানব। ছায়া-সারগনরা পাহাড়ের ওখানে ঘুরে বেড়ায় কেন? বোঝো. নাঙা নবি ওখানে না থাকলে চৌকি কিসের?

—আছে তো বটেই, কিন্তু ভালই আছে কী করে জানলে? বল, আমি কখনও এ কথা অন্যের সামনে প্রকাশ করব না, প্রতিজ্ঞা করছি সারিন। দাগনের শপথ রইল।

—দ্যাখ অর্ধমন্ত্রী! আমার বাছাকে আমারই কোলে ফিরিয়ে দিয়েছে শলোমনের বিচার। তাঁর জ্ঞানের জন্যই আমরা বেঁচে রয়েছি। তোমার আগ্রহ খুব খারাপ দেখছি। মনে রেখো, তোমার ওপর শতেক সারগনী দৃষ্টি রয়েছে, তুমি সরল নও, তোমার হৃদয়কে ওজন করবেন শুলায়মন। তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না।

এইভাবে কথা শেষ করেই সারিন মুহূর্তমাত্র দেরি না করে জলসত্র ছেড়ে আপন কুটিরে রাত্রিবাসের জন্য ফিরে চলে গেছে। তোরণস্থান, সৈন্য-ছাপরা, গালিয়াতের রাত্রিবাসের অভিজাত তাঁবু— সবই মধ্যরাত্রির স্তব্ধতায় নিমগ্ন। ধ্রুবাজহুরা আর চন্দ্রিমা আকাশের বুকে জাগ্রত। এখন সুদীর্ঘ এক প্রহর পথচারী ভিনদেশি বণিক বা সৈন্যদের পথচলা বন্ধ, তোরণদ্বার খোলা হবে না, কর নেওয়া হবে না।

এক দেড় প্রহর বিশ্রাম ও নিদ্রাকাল। এই সময়ের জন্য গালিয়াতের বদলি একজন চারপায়ে বসে রাত্রি জাগে। আসলে রাত্রি জাগার নাম করে লোকটা ঘুমিয়েই পড়ে, অন্তত ঢুলুনি দেয় বসে বসে।

গালিয়াৎ তার অভিজাত তাঁবুর কাছে এসে ভিতরে ঢোকার মুখে নিজের অশ্বটিকে দেখে নেয়। চাঁদটা অস্ত যাচ্ছে, দিগন্তের তলায়। কেমন আবছায়া ছড়াচ্ছে মরুভূমিতে। গাছপালার ছায়া দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। অশ্বের রশি খুলে দিল সে। ঘোড়াটাকে গায়ে স্পর্শ দিয়ে চাপা গলায় বলল— নেমে যা।

শিক্ষিত অশ্ব। বাদামি রং। অর্ধমন্ত্রী হয়েও গালিয়াৎ এখনও কৃষ্ণ অশ্ব পায়নি। তুষার-ধবল অগ্নিশুভ্র অশ্ব শলোমান ছাড়া আর কেউ চড়েন নাকি! রাজারা উৎসবের দিনে সাদা ঘোড়ায় চড়তে পান, তা-ও রথের সঙ্গে জুড়ে। সাদা ঘোড়ায় চড়ে, এমন কি অতি কৃষ্ণ অশ্বে চড়ে কেউ যদি ঘোরে, তাকে গ্রেফতার করা হয়— কারণ সে বিদেশি না হয়ে যায় না। বাদামি ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যরা। অভিজাতরা।

ডুবুডুবু চাঁদ, মরুচ্ছায়া ছড়ানো উৎরাই। তাঁবু ছেড়ে অশ্বের অন্বেষণে বেরিয়ে এল গালিয়াৎ। সে জেনেছে, তার উপর শতেক সারগনী দৃষ্টি ছড়ানো। অনেক দূর নিচে নেমে এসে সে তার বাদামি ঘোড়াটাকে পেয়েই লাফিয়ে ওঠে পিঠে। চ, জোড়া পাহাড়!

ঘোড়াকে তাড়িয়ে অনে লম্বা মরুঝড়ের তাড়ায়। উঠে পড়ে পাহাড়ে। চন্দ্র অস্তে নেবে। একটা আভা তখনও লুপ্ত হয়নি। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে, গুহায় চোখ দিয়ে খোঁজে লোকটাকে। পেয়েও যায়। গালিয়াৎ হেঁকে ওঠে— বেরিয়ে এসো মোশিহা!

—তু তু মি। কেন? বলে নগ্ন মানুষটা অবাক হয়।

—আমি গালিয়াৎ, ছবি-অক্ষর আঁকা গমের গন্দারি-দানা গিলেছি আমি, তোমাকে প্রণাম করি। এসো, তোমাকে বাঁচতে হবে।

—আ-আ-আ-আমি। আমি...

—তুমি কে?

—ধর, আ-আ-মার নাম, ন-ন-নবি, বা-বা-বা...

—বল।

—বালাক। বা-বা-বা—

—বল।

—বা, ই...ই...গ্...লো...লো...ন।

—ইগ্লোন?

—হ্যাঁ।

—বেশ, তুমি বালাক।

—আমি অমা...

—অমালেক?

—হ্যাঁ।

—বেশ, অমালেক। তারপর?

—অম্মো...অম্মোন।

—বেশ।

—আমিই লো-লো-লো...

—লোত ? তুমিই তবে ইশ্মায়েল ?

—না। ওটি মরুকুত্তা। উহাকে দরকার নাই। উহা গর্দভ। উহা বোকা উট। তবু দরকার আছে।

—তুমিই মোয়াব ?

—হ্যাঁ।

—তুমি নবি ?

—আ...আ...আ...আমি নাথন।

—আসলে তুমি কে ? বল, নইলে তোমাকে আমি উদ্ধার করব না।

—আমি স্বপ্নবিৎ। জানতাম তু-তু-তু-মি আসবে। আসবেই।

—তুমি ফিঙ্গাটা কোথায় পেলে ?

—কোথায় পাব ! ওটি তৈয়ারি করা।

—মানে ?

—হেঁ-হেঁ-হেঁ ! মিন্দা বলেছে, তোমার কোমরে একটা ফিঙ্গা লুকনো আছে। কেমন কিনা।

এবার চমকে উঠল গালিয়াৎ। এমন দুর্জ্ঞেয় লোক কখনও দেখেনি খেতা গালিয়াৎ। সহস্র পীড়নেও যার মুখ দিয়ে কথা বার করা যায়নি, ক্ষুধাতৃষ্ণায় যাকে জব্দ করা যায়নি, শত ছায়া-সারগনের কালিকা-উপস্থিতি যাকে বিচলিত করতে পারেনি, সেকি সামান্য মানুষ ! এই লোক মরুভূমির অযুত ক্ষোভ আর বঞ্চনার প্রতিমূর্তি ; একে সমীহ না করে পারা যায় না। ইনিই রাজরক্ত ঝরিয়েছেন মরুমর্তে অবলীলায়।

—তুমি তো ঠিক তোতলা নও মোশিহা !

—কিছুটা।

—তোমার ভাবের জন্য বক্তা দরকার। যেমন ছিলেন মোশির জন্য হারন। মোশির বক্তব্য হারন মানুষকে বলে শোনাতেন।

—তুমি হবে ?

—কী ?

—আমার বক্তা ?

—আঁ ! বলে গালিয়াৎ কিছুক্ষণ থ হয়ে রইল। তার পর মনে মনে ভাবতে লাগল, এই দুর্জ্ঞেয় সুজটিল মোশিহাকে এখান থেকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়। নাঙ্গা মানুষটাকে এই কাপড়খানা কে দিয়েছে ?

—কে দিয়েছে এই তহোবন্ধ (লুঙ্গি জাতীয়) বসন ?

—একটা মেয়ে। ওইই খাবার দিয়ে যায়। তুমি আসার ঢের আগেই ও এসেছিল। ফর্সা, থুতনিতে তিল আছে। কপালের ডানপাশে সামান্য কাটা মতন। সুন্দরী।

ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে গেল ব্যাপারটা। এ নির্ঘাৎ সারিন। নিশ্চয়ই তবে শলোমনের নির্দেশ মাফিক সারিন খাদ্যবস্ত্র সরবরাহ করেছে। লোকটির মাথার চুল সোনালি, দাড়িও সোনালি এবং কোঁকড়ানো। গায়ের রঙ তামাটে।

লোকটাকে সঙ্গে করে পাহাড়ের পিছনের দিকে নেমে এল গালিয়াৎ। ঠিক উল্টো

দিকে। পাহাড়ের পিছনে নলখাগড়ার বন এবং লবণাক্ত জলাশয়। মৃত নির্জনতা ছড়ানো। চাঁদের মরা আলো অতিশয় ক্ষীণ হয়ে ছায়া ফেলেছে। গালিয়াৎ বুঝতে পারল, এ দিকে কোনও প্রহরী নেই।

—এই রকমই কো-কো-কোনও বন আর জলাশয় পেরিয়েছিল ওরা। বলে উঠল সেই মোশিহা।

—কারা ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বোবা-অর্ধনগ্ন দুর্জ্ঞেয় লোকটা বলল— তো-তো-তো-তোতলা মুশা তেনার দলবল নিয়ে মিশর থেকে বার হয়ে এলেন। দিন মেঘাচ্ছন্ন, রাত্রির আকাশ ভয়াবহ আগুনে পুড়ছে। মিশরে মহামারী চলেছে। কেমন কিনা ? মুশা চর পাঠিয়ে জেনেছিলেন, স-স-স-সমুদ্র-কূলে প-প-পথ সোজা আর ছো-ছো-ছোটও বটে। অ-অ-অল্পে পৌঁছনো যাবে কেনানে। কিন্তু সেই পথে গেলেন না তিনি। কারণ...

—কারণ কী ইব্রিয়া ?

—ইব্রিয়া ?

—হ্যাঁ, তোমার একটা নাম তো লাগবে। ইব্রিয়া ইয়াহুদ তোমার নাম। তুমি নাম তো বললে না, আমি দিলাম সুতরাং। কী নাম ? ইব্রিয়া। পছন্দ হয় ?

—অ্যাঁ। হয়। হয় বইকি মহার্ঘ বীর গালিয়াৎ। শোনো, স-স-সমুদ্র-কূলের সিধা পথ সাগর-জাতি আর্যরা, তোমার পূ-পূ-পূর্ব-পু-পু-পুরুষরা দখল করে রেখেছিল। তাই মুশা অন্য পথ ধরলেন। মুশার মাংস চিরকালই আর্য-পলেস্টীয়দের ভয় পেয়েছে।

—জানি।

—পথটা ছিল এই রকম জলভর্তি নলের বন। মুশার দল কখনও লাল দরিয়া পার হয়নি। ওটা গুজব।

—কোন্‌টা গুজব ?

—ওই যে লাল দরিয়া পার হল ইস্রায়েলগোষ্ঠী, ওটি মোজেজা (যাদু) বলা হয়, আষার আঘাত দিয়ে দু-দু-দু ভাগ করলেন লাল দরিয়া— কে করলেন ? মহানবি মুশা। হুঁহ্‌।

—কেন ? তাঁর কি সেই ক্ষমতা ছিল না ?

—যাঁর এত ক্ষমতা, সেই লোক স-স-সমুদ্র-পথ এড়িয়ে যান কেন ? স-স-সমুদ্র দু' ভাগ করে চলে যান তিনি, পথ শুকনো খটখটে। মুশার দল চলে গেল, তার পরই দু' ভাগ হয়ে সরে যাওয়া লাল দ-দ-দ-দরিয়ার জল জু-জু-জুড়ে গেল সমান হয়ে ? পিছন থেকে তাড়া করে আসা কাবুসের রথ, সৈন্যবাহিনী ডুবল এসে সেই জলে। দ্যাখ, এই লাঠিটা, এটাই আষা, গালিয়াৎ !

ইব্রিয়া হাতের লাঠিটা দেখালো গালিয়াৎকে। গালিয়াৎ চমকে উঠে কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল।

—তুমি বলছ, মুশার দল এই রকমই একটা জলা-বন পার হয়ে মরুভূমিতে ঢুকে পড়ে ?

—হ্যাঁ। আমরাও তাইই করব গালিয়াৎ। চারিদিকে সৈন্য মোতায়েন আছে। চ-চ-চল।

নলের বন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সেদিকে চেয়ে দেখে গালিয়াতের গা কেমন ছমছম করে উঠল। ইব্রিয়ার লাঠিটার দিকে বার বার চেয়ে চেয়ে দেখছিল সে।

ইব্রিয়া সহসা বলে উঠল— আমার জেদ ; এর চেয়ে বড় মোজেজা কিছু নেই খেতা ! আমি স্বপ্নদ্রষ্টা মহাপুরুষ।

—আজ্ঞে !

যত সময় যাচ্ছিল ইব্রিয়া ততই গালিয়াতের চোখে দুর্বোধ্য আর রহস্যময় হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, লোকটার হাতের লাঠিটা হয়তো সত্যিই আষা, জাদুলাঠি। এই লাঠির ইশারায় সম্মুখে বাস্তবিক পথ তৈরি হবে।

ইব্রিয়া ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বনের মধ্যে এবং আর্তনাদ করে উঠল— পথ হো !

পথ হল। গালিয়াৎ অন্ধকারে পথ ঠাহর করতে পারে। বিশেষ করে তার ঘোড়া নলের জলভুক্ত কিনারা ধরে ইব্রিয়া আর গালিয়াৎকে পিঠে করে চলতে শুরু করে। গালিয়াতের মনে হল, ভগবান এল্ তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। ইব্রিয়ার আষার আঘাতেই এই পথ তৈরি হয়েছে।

—মুশার দল, খোদার খাস বান্দা ইসরায়েলেরা মরুভূমিতে চল্লিশ বৎসর ঘুরে মরেছে। এবং জ্ঞাতিহত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। তুমি খুব সহজ করে বোঝার চেষ্টা কর গালিয়াৎ।

—হ্যাঁ।

—পলেস্টীয় আর্যরা উত্তমরূপে সশস্ত্র, উপকূলভাগ তাদেরই কব্জায়। অতএব মরুভূমির প্রথম খুনি নবি মুশা বিচার করে দেখলেন, কোথায় রয়েছে লোতের সন্তানরা, মোয়াব-অম্মোন কোথায় সুখে বাস করছে, চল সেদিকে যাত্রা করা যাক। খুঁজে দ্যাখ কোথায় ইদোম-পুত্ররা। খুঁজে দ্যাখো লোতের নাতি অমালেক কোথায় নগর গড়েছে। এরা জ্ঞাতি, এরা তাদের কেনানে পৌঁছনোর পথ দেখিয়ে দেবে। যদি না দেয়, তবে আর্য অপেক্ষা অনেক দুর্বল জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে বি-বি-বিদ্ধ করতে হবে।

—জানি ইব্রিয়া, এ সবই আমাদের জানা।

—অমালেক, বীর অমালেক ! লোতের স-স-সব অপমান সে একা বহন করেছে। মোয়াব মুশাকে পথ ছেড়ে দেয়নি। অন্যায়-রণে প্রাণ দিয়েছে অমালেক। অমালেক যদি আর্যদের সাহায্য নিত, মুশা তাহলে কখনওই কেনানে তার দখল কায়েম করতে পারত না। ত-ত-ত-তবে এ কথা ঠিক, আর্যরা অমালেককে সাহায্য করত কিনা জানা নেই। তুমি কী মনে কর ?

—আমি সন্দেহ করি ইব্রিয়া, তুমি অমালেক নও তো ?

—আ-আ-আ—আমি কে, তা আমি বলব না। কেননা, তার আবশ্যকতাই নেই। তো-তো-তোমাকে এইটুকুই শুধু বলতে পারি, আমি যে নবি, সংশয় রেখো না। আমি বঞ্চিতের বন্ধু, আমি রাজা বানাই। আমি স্বপ্নে একটি শিশুর মুখ দেখেছি, এই মরুভূমিতে আমি তাকে খুঁজছি।

—আমার কাছে একটি গোপন ফিঙ্গা আছে ইব্রিয়া। আমার দুই ভুরুর মধ্যস্থান সিরসির করে।

—এই সিরসিরানি কবে থামবে আমি জানি।

—কবে ?

—আমাদের রাজা চাই গালিয়াৎ। উপকূলের পরাজিত, বিধ্বস্ত রাজার হাঁটু আর উরু ভেঙে পড়েছে। চাই নবীন রক্তের শিশু, একটা ন-ন-ন-নতুন বীজ। অন্যায়-রণে এই মরুভূমিতে যাদের ব্যবহার এবং হত্যা করা হয়েছে, আমি তাদের ছায়া ; মানুষ নই।

—কে তুমি ?

—আমি ছায়া। ছায়ামূর্তি, স্বয়ং জাদু, আমি নরদেবতা কাবুস। আমিই মহামারী, পশুর মড়ক, এবং ভূমিকম্প ঘটাই। আমি আকাশে নুনবৃষ্টি করি, অনাবৃষ্টি, প্লাবন আমার দান। আমিই নিম্রোদ। আগুন আমার ভাই এবং শ্যালক।

খেতা গালিয়াৎ এবার শিউরে উঠে পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে অশ্বপৃষ্ঠের লোকটাকে দেখে নিয়ে বলে— কী ভয়ংকর তুমি ইব্রিয়া।

—হ্যাঁ, আমি ভয়ংকর ! যে বিষাক্ত মশক নিম্রোদের নাকের ফুটো দিয়ে মাথার ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল এবং নিম্রোদের মগজ খেয়ে ফেলেছিল আমি সেই ক্ষুদ্র-ভয়ংকর প্রাণী গালিয়াৎ ! আমিই কুষ্ঠ এবং পা-পা-পা-পারা রোগ।

—আহ্, চুপ কর ইব্রিয়া ! আর সহ্য করতে পারছি না ! বলেই গালিয়াৎ লক্ষ করে তার কানের লতা চাটছে লোকটা এবং তাকে পিছন থেকে বিশ্রীভাবে আলিঙ্গন করেছে। এই নবি কি সমকামী ?

ঠিক এই সময় অশ্বের সম্মুখের পা হড়কে যায়। নলের জলায় পড়ে যায় ঘোড়াটা। নুন জল, পচা জল, বিষাক্ত পোকা-মাকড়-সাপে ভরা জলা। লোকটা কিন্তু জলে পড়ে গিয়ে হাসতে লাগল।

—চুপ কর ইব্রিয়া আর হেসো না। এবার কিভাবে উদ্ধার হবে তাই ভাবো। তুমি কি পাগল ?

—যে-লোক রাজরক্ত মাটিতে ঝরিয়েছে, তার কি মাথার ঠিক থাকে গালিয়াৎ ? মুশা কি সুস্থ ছিল কখনও ? অব্রামের চেয়ে ধূর্ত আর স্বার্থপর কে ছিল সংসারে ! আমি ওদের তুলনায় অনেক পবিত্র খেতা ! আমি পারতপক্ষে নারী-সংসর্গ করি না।

—কী কর তাহলে ?

—যে কিশোরদের এখনও দাড়িগোঁফ গজায়নি, আমি তাদের ভালবাসি।

—আশ্চর্য !

—কারণ, এই মরুভূমিতে তারাই একমাত্র পবিত্র প্রাণী। আর পবিত্র আর্য-বিধবা। চল, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব তোমাকে। আমার ওপর ভ-ভ-ভ-ভরসা রাখো। বলে ইব্রিয়া জলের উপর সজোরে তার হাতের লাঠিটাকে আছড়াতে শুরু করে।

চাঁদ ডুবে গেছে। ধ্রুবা-জহুরার আলো পড়েছে জলে। কেমন রহস্যময় জলার ছবি। বিষাক্ত সাপ সরসর করে গা-ঘেঁষে চলে যাচ্ছে। ওরা অশ্বের লেজ ধরে উপরে ওঠার চেষ্টা করে। পারে না। জলার এই অংশের খাঁড়ি পিছল। ঘোড়ার পা হড়কে জলেই নেমে আসছে।

—কই তোমার মোজেজা ইব্রিয়া ? দেখাও, দেখাও।

—সামান্য জলা খেতা ! মরুভূমিতে চল্লিশ বছর ঘুরে মরার চেয়ে কি ক-ক-কঠিন ? জলের ভিতর দিয়েই ওরা ঘোড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। খাঁড়ি আরও উচ্চ হতে

থাকে। কিছুক্ষণ চলার পর ওরা বুঝতে পারে, এ জলা কোনও লবণাক্ত হ্রদ এবং নদীর সঙ্গে যুক্ত। ক্রমশ জল প্রসারিত হচ্ছে। জল গভীর হচ্ছে। ওরা ডুবে যাচ্ছে।

—তুমি নিজেকে কাবুস বলে পরিচয় দিয়েছ ইব্রিয়া। মুশার অভিশাপ আমাদের গ্রাস করছে। আমরা আর বাঁচব না।

—পাগল!

—তুমি নবি নও, তোমার আকাঙ্ক্ষা সত্য নয় ইব্রিয়া!

—আমার মৃত্যু হ-হ-হতে পা-পা-পারে না খেতা। আমি অমালেক, আমি লো-লো-লো-লোত। আমি কখনও দাসী ইগার আর রূপসী সারির ঈর্ষা ভোগ করিনি। আ-আ-আমি নিজের বউয়ের রূপ দেখিয়ে পশু আর খা-খা-খাদ্য আর দা-দা-দাসী জোয়াড় ক-ক-করিনি। আমি মিশরের নিরীহ গা-গা-গায়েড়ানকে মেরে ফেলে গিলিয়দ অঞ্চলে গিয়ে ইশ্মায়েলীয় যাজক রুয়েলের কন্যাদের সঙ্গে যৌনক্রীড়া করিনি, এই প্রেমকে ঘৃণা করি; সিফোরাকে শাদি করে সীনয় পা-পা-পাহাড়ে খোদা-দর্শন করিনি। আমি মানুষ মেরে আশ্রয়-নগরে পালিয়েও বসে থাকিনি। আ-আ-আমি পবিত্র।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

—শলোমান? তাই না? স্বয়ং সুবিবেচনা, স্বয়ং ধর্ম, নারীগর্ভ ছাড়াই যে উৎপন্ন হওয়ার যোগ্যতা রাখে, কী বল? বল না, বল?

—আমি তাঁকে পবিত্রই দেখেছি।

—ভুল দেখেছ! যে এতটাই জ্ঞানী, জ্ঞান ছা-ছা-ছাড়া যার কিছুই দরকার করে না, তার এত ছা-ছা-ছায়ামূর্তি কেন? পরমায়ুর লোভ, বোঝো তুমি! এই এখন যেমন তুমি প্রাণের জন্য কাঁদছ, তুমি কোন ছায়ার আড়ালে লু-লু-লুকাবে এখন? পারবে না। শলোমন আর নোহ আলাদা নয়। এরা জীব আর বীজকে বে-বে-বে-বেছে নিয়ে বাঁ-বাঁ-বাঁ...

—বাঁচায়?

—হ্যাঁ। কেউ জানে না। আমি দেখেছি গা-গা-গাছের আড়াল থেকে— রিদি হিব্রোনের দাদা জিম্মুকে শলোমান সাদা ঘোড়ায় চড়িয়ে অর্বপুর পাঠিয়ে দিল। আশ্রয়-নগরে কেন পাঠালো হিত্তীয়কে? অম্মোনের বিচার হল নাকি ভাই?

—তুমি কি কাঁদছ ইব্রিয়া? খুব অবাক হয়ে গেল খেতা গালিয়াৎ। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এই মানুষটা একজন অম্মোনের জন্য অশ্রুপাত করছে। এ লোকের হয়তো মৃত্যুভয় বলে কোনও বস্তু অন্তরে নেই।

ইব্রিয়া বলল— শোনো গালিয়াৎ। এই ম-ম-মরুতে প্রত্যেক মানুষই সৈনিক। প্রত্যেকের কোমরে গোঁজা ফি-ফি-ফিঙ্গা, আমরা দেখতে পাই না। আমি অম্মোন, আমি উরিয়কে হত্যা করেছি। দাউদের পাপ আমাকে বইতে হল। কেন? কেন বইতে হল, খেতা!

জলের উপর দাঁড়িয়ে সত্যিই ইব্রিয়া কাঁদছিল। গালিয়াতের মনে হল, এ লোক শুধু কোনও স্বপ্ন-গণৎকার নয়, এ পয়গম্বর। একে বাঁচাতেই হবে। গালিয়াৎ ঘোড়ার পুচ্ছ সজোরে আঁকড়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল। ঘোড়া এবার তাদের নিয়ে পিছনে

ফিরছে। ঘোড়ার লেজ ধরে রাখা অসম্ভব, লাগাম এবং পিঠের জিন আঁকড়ে ধরেছে ওরা। কিছুদূর এসে ঘোড়া লাফ দিল ডাঙার দিকে। আব্রাহামের মতো ভয়ংকর এক আর্তনাদ করে উঠল ইব্রিয়া। এমন ভয়ংকর স্বর কখনও শোনেনি খেতা গালিয়াৎ। ধুবা-জহুরার মাংস দপদপ করে খসে পড়তে চাইছে যেন। এ যেন অভিশপ্ত লোতের গলা। তার অস্থি আর মাংস ইলোহে কী অনুজ্ঞায় বানালেন কেউ জানে না। অভিশপ্ত সোর পাহাড় ওইদিকে দেখা যায় অত্যন্ত অস্পষ্ট।

আবার ডাঙায় উঠে এল ঘোড়া। কিন্তু ঘোড়া তিন তিনবার জলে পড়ে গেল ফের। ইব্রিয়ার কান্নাভরা সুতীব্র আর্তনাদে ডাঙায় লাফিয়ে উঠল ঘোড়া। এভাবে ওরা পেরিয়ে এল জলা, নলের বন। পথ পেল তারপর। তখনই ওরা শুনতে পেল আশ্চর্য সংগীত।

ইব্রিয়া বলে উঠল— ভোর হয়ে আসছে খেতা। ভোরের গান গায় কারা? অমালেককে হত্যা করল মুশা। মুশার নির্দেশে জশুয়া মেরেছে অমালেককে। সেই যুদ্ধ কী মর্মান্তিক! অমালেককে পরাজিত করার সাধ্য কার ছিল! কারও ছিল না। মুশা এই ল-ল-লড়াই উপভোগ করেছে, জানো? শুধু জ্ঞাতিত্বের দুর্বলতায় লোতের নাতি মরেছে। হাতে একটি সাদা পায়রা তুলে ধরে দেখালেন মহামতি মোশি, অমালেক ভাবল, শান্তিপ্রস্তাব দিচ্ছেন মোশি। ওই পায়রার দিকে চে-চে-চেয়ে দেখে অস্ত্র নামিয়ে ফেলেছে অমা-লে-লে-লেক। তখনই বর্শা ছুঁড়ে বধ করা হল তাকে।

—শুনেছি ইব্রিয়া। এইভাবে জিতে মোশির কী উল্লাস! মোশি আর হারনের বোন মরিয়ম গান বেঁধে গাইল।

—মরুভূমির প্রথম বিজয়-গান। ওই সেই গান গালিয়াৎ! মেয়েরাই গায়। ওই গান গেয়ে অনেক অথর্ব-বেশ্যা মাধুকরী করে খায়। শুনেই মনে হয়, খুন করে ফেলি! শুনে রাখো, এই গা-গা-গান, আমি বন্ধ করে দেব।

গালিয়াৎ চুপ করে রইল। তার তেষ্টা পেয়েছিল। অশ্ব চালাতে চালাতে বারবার সে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিচ্ছিল। এবার সে সামনে বসিয়ে নিয়েছে ইব্রিয়াকে। কারণ ইব্রিয়া গালিয়াতের সদ্য গজিয়ে ওঠা নরম গোঁফ লক্ষ করছিল অত্যন্ত আসক্ত দৃষ্টিতে। এমন ঘোলানো কামার্ত দৃষ্টি কমই দেখা যায়।

—আমি কখনও মন্দিরে গিয়ে রূপাজীবার স-স-সঙ্গ করিনি গালিয়াৎ।

—ভাল।

—আমি পবিত্র। আমার কোনও খারাপ ব্যাধি নেই। কিশোরদের ভালবাসলে এই যে পারারোগ, তা হয় না।

—আমি আর শুনতে চাই না ইব্রিয়া। আমরা পৌঁছে গেছি। তুমি কয়িনের এখানে আপাতত থাকো। আমার বোন আনাথ তোমাকে নিশ্চয়ই লুকিয়ে রাখবে। আমার উপর তোমাকে হত্যা করার নির্দেশ ছিল। তুমি নবি, ক্ষুদ্র হলেও নবি। তোমার আষার জয় হোক।

তখনও সূর্যের আলো ফোটেনি। অশ্বের হ্রেষা শুনে আনাথ তার ছেলেকে কোলে করে কুটিরের বাইরে বেরিয়ে এল। স্ত্রীর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কয়িন। ঘোড়া থেকে নেমেই অর্ধনগ্ন বোবা-উন্মাদ নবি অত্যন্ত লোভার্ত ভঙ্গিতে আনাথের কাছে এগিয়ে গেল। তার পর এক প্রবল তৃষ্ণায় দু'হাত বাড়িয়ে দিল শিশুর দিকে।

পাগলের মতো করে বলে উঠল— এই তো। এই তো রে! আমার সন্ধান বৃথা যাইনি খে-খে-খেতা। আমাকে প্রণাম কর আনাথ। কয়িন, প্রণাম কর আমাকে। আ-আ-আমি পেয়ে গেছি গালিয়াৎ। এই তো সেই শিশু, হায় খোদা, এই যে পুচকেটা, আমার রাজ্য। আমার সা-সা-সারগন। তোমার এক মুঠিতে দুধ, অন্য মুঠিতে মধু। খাও, মুঠি খাও সম্রাট, তুমিই সবার বিরুদ্ধ, তোমার হাত সবার বিরুদ্ধে উঠবে, এর কানে স্বর্ণকুণ্ডল কই! দাও, গালিয়াৎ ভাগ্নের কানে স্বর্ণকুণ্ডল দাও। শিশুকে প্রণাম কর সবাই। তোমারে বধিবে যে হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। শুনতে শুনতে এক গভীর ভয় গালিয়াতের বুক বেয়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হল, সে কি ভুল করল তাহলে!

তখন ইত্রিয়া খে খে করে হাসতে হাসতে বলে উঠল— এই জন্যেই তোদের বিয়ে দিয়েছিলাম কয়িন। জয় ইলোহে।

খেতা তার অশ্বকে বিমর্ষ মরুতে চালিয়ে দিল একা।

৪. পাণি-শিবিকা

গালিয়াৎ যখন তোরণদ্বারে ফিরে এল তখন প্রত্যূষ অতি স্পষ্ট। কেনানের ভূখণ্ড সামান্য, একে একটি ক্ষুদ্র দেশ বলাই সঙ্গত। অশ্ব দ্বারা চলাচলে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত মনে হয় হাতের তালু। এই গেলাম এই এলাম। কিন্তু পায়ে হেঁটে যেতে হলে মনে হবে কী প্রশস্ত দেশ! আব্রাহাম পায়ে হেঁটে উর থেকে মিশর প্রায় বারো শো মাইল পথ মাড়িয়েছিলেন।

শলোমনের আমলে মিশর ম্লান হয়ে গেছে। কারণ মিশর অশ্বপ্রেরণা পায়নি। যদিও এখন অশ্ব কেনা-বেচার হাট বসে, কিন্তু নতুন কাবুস বৃহৎ কোনও অশ্ববাহিনী গড়ে তুলতে পারেনি। ওই হাটের কেনা-বেচার সম্পূর্ণ তদারকি শলোমন নিজের করপুটে রেখেছেন। অশ্বের শিক্ষা-প্রণালী শলোমনেরই নিয়ন্ত্রণে। অশ্বরথের নির্মাতা শলোমন।

সম্রাট দুই জাতের রথ নির্মাণ করেন। যুদ্ধের রথ আর শৌখিন রথ। রথ-নগরীগুলি দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সাজানো। রথের কারিগরি লিবাননের দক্ষ ছুতারের কাজ। ফিনিশিয়া থেকে উত্তম কাঠ জোগাড় করেন এই রাজচক্রবর্তী। ফিনিশিয়া মানচিত্রের উত্তরে, সেখানকার দ্বীপাঞ্চল থেকে জলপথে কাঠ ভাসিয়ে আনা হয়। দেখা গেছে, শৌখিন রথ বাদামি অশ্বসহ মাঝে মাঝে রাজাদের উপহার দেওয়া শলোমনের চমৎকার সৌজন্যবোধ। তাতে রাজারাও বিশেষ খুশি হয়।

শলোমনের সৌজন্য জগৎ-প্রসিদ্ধ ব্যাপার। তিনি বিভিন্ন রাজকুমারীদের যখন পাণি প্রার্থনা করেন তখন একটি বৃহৎ শৌখিন রথ চারটি সাদা অশ্ব টেনে নিয়ে যায়, অশ্বের শরীর রাঙানো হয় মরু-মেহেদি দ্বারা, রথের ভিতরে সাজানো থাকে একটি ক্ষুদ্র শিবিকা। শিবিকার ভিতরে থাকে মূল্যবান পাথর-মুক্তাখচিত অঙ্গুরীয় এবং বিবাহ-প্রস্তাবের একটি ক্ষুদ্র সিঁথি-চুনোটি এবং থাকে রামধনু রঙের বসন। কনের কান, গলা, বাজু, কোমর, হাতের অলংকারও দেওয়া হয়।

লিবাননের সুবৃহৎ শিবিকাটি বিশেষ উদ্দেশ্যে গড়া। এটিতে চড়ে সম্রাট

আর্য-বিবাহ করতে চান। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই শিবিকাতে প্রথম আরোহণ করল রিদি হিব্রোন। একজন পতিতা! তার মুখটা যেন কার মতো!

এই প্রত্যূষেই শৌলগৃহে ডাক পড়েছিল সারিনের।

সম্রাট বললেন— সারিন! আমি আর্য-বিবাহ করতে চাই। তুমি সাদা ঘোড়াদের রাঙিয়ে দাও। অলংকার পরাবে ঘোড়ার দেহে এবং পাণি-শিবিকা প্রস্তুত করবে। শোনো, আর্য রাজাদের যে সমস্ত হাত আমার বিরুদ্ধে উঠে রয়েছে, তাকে অবনত করতে হলে পাণিগ্রহণই উত্তম! আর শোনো, এই প্রস্তাব নিয়ে রথযোগে যাবে খেতা গালিয়াৎ, তাকে ডাকো!

সারিন সম্রাটের চোখের দিকে চাইবার বিশেষ ক্ষমতা রাখে না। তবু আজ সে চাইল। সভয় বিস্ময়ে। অবাক হল, সম্রাটের চোখ দু'টি স্বপ্নোত্থিত, দিব্যস্পর্শে কঠিন। শৌলগৃহে রাত্রিবাস করেছেন সম্রাট। রাত্রিবাস মানেই সমস্ত রাত্রির ধ্যান। সারিন জানে, গত সন আর্যরাজ টায়ার-অধিপতি বিবলিস সম্রাটের বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এটি হাবিলের মুখে শুনেছে সারিন। বিবলিসের কন্যারা অগ্নিকুণ্ড সাজিয়ে তার চারপাশে নৃত্য করেছে এবং ওই আগুনে প্রথমা কন্যা আত্মাহুতি দিয়েছে। এবার নিশ্চয়ই দ্বিতীয়া কন্যা ইলা সম্রাটের লক্ষ্য।

নীচে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মুখে নেমে আসার আগে হঠাৎ সারিন সম্রাটের মুখে অদ্ভুত কথা শুনতে পেল। সম্রাট বলে উঠলেন— বোবা গন্দারটা পাহাড় থেকে ভেগে পড়েছে সারিন, ছায়ামূর্তিরা হদিস করতে পারেনি। এই রাত্রিতে গালিয়াৎ তার তাঁবুতে ছিল না। কোথায় ছিল তুমি বুঝে নিও। কিন্তু এখনই নয়। আগে রথ নিয়ে খেতা টায়ারে যাক। যদি দেখা যায়, ও নির্দোষ এবং বিয়েতে বিবলিসকে রাজি করাতে পেরেছে, তাহলে আমি ওকে পূর্ণমন্ত্রী করে দেব।

সারিন চলে যেতেই যেন দেওয়ালের ভিতর থেকে সম্রাটের দুই ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। শৌলগৃহের দেয়াল সৈন্যকক্ষে পরিপূর্ণ। দু'টি দেওয়াল দু'টি পরতে পাশাপাশি ভাগ হয়ে বেড়েছে চারপাশ। দুই দেওয়ালের মধ্যবর্তী ফাঁকে সৈন্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠুরি, অতি দক্ষ সৈন্যরা সেখানে লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু এমন সেই সব অভ্যন্তর যে দ্বিতীয় পরতের দেওয়াল ভেদ করে কোনও শব্দ সেখানে পৌঁছয় না। সম্রাটের প্রকৃত শৌলকক্ষ আরও এক পাথর-বেষ্টনে ঘেরা। এই স্থান অমরাবতী। চরম নিঃশব্দ। এখানে মরুতাপ, মরুশৈত্য, মরুঝড় পৌঁছয় না। সৈন্যরা মরুভূমির শ্রমিক মৌমাছির মতো। তাদের কোনও দাম্পত্য জীবন নেই। অবশ্য এরা সবাই পঁচিশ বৎসর বয়সের নীচে যুবা-কিশোর। এদের বলা হয়েছে, জিরুজালেমে মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেলে, তারা মুক্তি পাবে এবং হারেমের সুন্দরী এবং সুপ্রচুর রত্ন উপহার পাবে। সেই লোভে এবং আদর্শের টানে তারা এখানে এসেছে আর তা ছাড়া এরা অধিকাংশ জারজ এবং দরিদ্র। সূর্য-মন্দির এবং দাউদের হারেমসমূহ এই কিশোর-যুবাদের উৎপাদক, মরুভূমির যুদ্ধ-ধ্বস্ত দারিদ্র এদের জন্মদাতা।

এই কিশোর-যুবাদের বেছে নেওয়া হয়েছে। সব গরিবই এই সুযোগ পায় না। গরিব কিন্তু ক্ষীণকায়, অসুন্দর হলে চলবে না। শলোমান-প্রমাণ উচ্চতা লাগবে, স্বাস্থ্যও হতে হবে শলোমন-সদৃশ। বলা বাহুল্য মরুভূমি গরিবদেরও সুন্দর করে গড়ে কখনও কখনও। এরাই সম্রাটের ছায়ামূর্তি। এদের প্রশাসক হাবিল-কাবিল। হাবিল

কাবিলই মাঝে মাঝে এদের মরুভূমিতে ছেড়ে দেয়।

এদেরই বলা হয় এক-মানুষ। অর্থাৎ এরা সকলে মিলে একজন। এদের প্রত্যেককে হেতপুত্র সুমহান উরিয়র পবিত্রতার নামে প্রতিজ্ঞা করে এই শৌলগৃহে ঢুকতে হয়েছে। উরিয়র মুখ-অঙ্কিত তাবিজ এদের বাহুতে বাঁধা। এদের হাতে অম্মোনের খড়্গ উলকি করে আঁকা। একই সঙ্গে এদের মনে চাপানো হয়েছে অম্মোনের ঘাতক-বোধ এবং উরিয়র সম্মান আর ত্যাগ। চোখে জ্বেলে দেওয়া হয়েছে মন্দির নির্মাণের দেউটি। এরা নিষ্ঠুর, এরা অপরাধী এবং এরা সম্মানিত। এই গোপন সৈন্যকক্ষের কথা মরুভূমি জানে না।

গালিয়াতের কাছে তোরণদ্বারে নেমে এল সারিন। প্রশ্ন করল— রাত্রে তুমি তাঁবুতে ছিলে না গালিয়াৎ।

—হ্যাঁ, ঘোড়া ছুটে গিয়েছিল সারিন।

—বোবা-উন্মাদ লোকটা ভেগেছে, বুঝলে।

—তাই নাকি! তুমি কী করে জানলে?

—বোকার মতো প্রশ্ন ক'রো না। আমি শুধু জলের ভিস্তিউলি নই, খেতা! তুমি এক্ষুনি সম্রাটের সঙ্গে দেখা কর।

—কেন?

—প্রশ্ন ক'রো না।

—ও, আচ্ছা। কিন্তু আমি তো ঘোড়া খুঁজতে বার হয়েছিলাম সারিন! অন্যে ও ঘোড়া ধরতে পারত না।

—সম্রাট শুধোলে সেকথা ব'লো। এখন দেখা কর গিয়ে। ও মা! এ যে জননী বৎসেবার পালকি আসছে গো! কী কাণ্ড! দূর থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানাও গালিয়াৎ। দ্যাখ, দু'জন হিত্তীয় সৈন্য পালকির পাশে পাশে হেঁটে পাহারা দিয়ে আনছে। কথা কি সারগণ-মাতা হিত্তীয় সেনা ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করেন না। সম্রাট দাউদের এই জবরদখল বউটা শুনেছি, বিছানায় ভগবানের মূর্তি নিয়ে ঘুমায়। দাউদ এই কাণ্ড দেখে ভয়ানক বিরক্ত হত। মায়ের কোল থেকে সেই মূর্তি, অষ্টোরৎ দেবীর মূর্তি মহান সম্রাট শলোমানও কেড়ে নিতে পারে নাই।

—কেন?

—বোকার মতো কথা! শলোমন রাজা কারও উপর জোর করেন কখনও! করেন না। তাছাড়া...

—তাছাড়া!

—বুঝে দ্যাখ গালিয়াৎ, মূর্তিটা কি কেবল মূর্তি? ওটাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে, ধরা যাক, মাতার পূর্ব-স্বামী মহৎ উরিয়কে মনে পড়তে পারে। ওই তো হয়েছে মায়ের কাল, মূর্তি বুকে করে কাঁদা! রাজবাড়ির ভেতরের কথা আমরা কতটুকুই বা জানি! প্রণাম কর, প্রণাম কর। নইলে তোমার চাকরি চলে যেতে পারে।

—তা তো বটেই, হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয় বটে। তুমি ঠিক বলেছ, সারিন! ওই মাই-তো মহাত্মা শলোমনকে রাজা করেছেন। উত্তরাধিকার নিয়ে কম গোলমাল তো হয়নি! অন্যান্য মায়ের সন্তানরা তো ছিলই। একজন তো স্বঘোষিত রাজা হয়ে বসল। কে ঠেকায় কাকে!

—অ্যাই চুপ! শুনতে পেলে গর্দান চলে যাবে তোমার, আমিও বাঁচব না। তুমি ওই শিবিকার পিছু পিছু উপরে রওনা দাও। প্রাচীরের বাইরের দুয়োরে অপেক্ষা করবে, ডাক পড়লে যাবে। মনে হচ্ছে বৎসেবার এখন ছেলের সঙ্গে নিশ্চয়ই কিছু বোঝাপড়া আছে, এত ভোরে কী হল, কে জানে!

চারপায় থেকে নেমে প্রণাম জানিয়ে গালিয়াৎ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। শিবিকা উপরে চলে যাওয়ার পরও খানিকটা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়েই রইল খেতা গালিয়াৎ।

—যাব?

—নিশ্চয় যাবে। সম্রাটের হুকুম। একজন মন্ত্রী হয়ে এত ভয় কিসের তোমার! দ্যাখ, অন্তরে যদি ভক্তি থাকে তাহলে ভয় নেই, আর অন্তরে যদি অসূয়া থাকে, ভয় তো থাকবেই। তুমি কি সত্যিই ঘোড়া খুঁজতে গিয়েছিলে চাঁদের আলোয়? কী করেছ তুমি গালিয়াৎ!

—অ্যাঁ! বলে ভেতরে ভেতরে কেমন একটু কেঁপে গেল মিন্দাপুত্র খেতা গালিয়াৎ। সারিন নামের এই বেশ্যাটি কিছুতেই সামান্য নয়, এ সম্রাটের চর। নির্ঘাত এটি সারগনের পোষা সরীসৃপ এবং জেন।

গালিয়াৎ যখন মন্থর পায়ে ইস্রোন উপত্যকার দিকে উঠে যাচ্ছে, তার কিছু আগেই বৎসেবা তাঁর শিবিকা নিয়ে শৌলগৃহের প্রধান কক্ষে ঢুকে পড়েছেন। শলোমন ভাবতে পারেননি মা এভাবে চলে আসতে পারেন।

—তুমি রাত্রে কোনও রাজ-মহিষীর কাছেই গেলে না দেখে আশ্চর্য হয়েছি পুত্র! তুমি আমার নয়নের মণি, এই শৌলদুর্গে একা থাকো কেন?

—তুমি কেন এখানে এলে মা! তোমার দেহরক্ষীরাই খবর দিতে পারত, আমিই তোমার কাছে চলে যেতাম।

—আমাকে খুশি করার বৃথা চেষ্টা করো না খোকা! আমার সঙ্গে পরামর্শ করাটা বোধহয় বাতুলতা! আমি জানি, তুমি যথেষ্ট সাবালক হয়েছ, কিন্তু তুমি বাপের চেয়ে কায়দা জানো বলে মনে হয় না। আমি শুনলাম, তুমি একজন আর্যকে রাজস্ব আদায় করার কাজ দিয়ে মন্ত্রী করেছ!

—হ্যাঁ। বলে শলোমন পরমাসুন্দরী মায়ের মুখের দিকে চকিতে দৃষ্টিক্ষেপ করেই চোখ নামিয়ে নিলেন। শলোমন কখনও মায়ের চোখের দিকে দৃষ্টি স্থির করে পুরো এক নিমেষ চেয়ে থাকতে পারেন না। মা এখনও অতীব সুন্দর এবং মায়ের যৌবন এখনও ডাঁটো, আর পুষ্পিত। এই হিত্তীয় মায়ের সঙ্গে পিতা দাউদের বয়সের পার্থক্য ছিল অনেক। বৎসেবার রূপাসক্ত সম্রাট দাউদ সারা জীবন অপরাধী ছিলেন এবং এই হিত্তীয় স্ত্রীর কথা মতো চলতে বাধ্য হতেন। বলতে কি, সামান্য এক বালিকার কাছে আত্মসমর্পণ করেন বনি ইস্রায়েলদের প্রথম রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা সম্রাট দাউদ। বৎসেবার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন দাউদ, শলোমনই হবেন তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। অতএব বলা যায় ওই জ্বলন্ত রূপযৌবনের চরম কৌশলেই শলোমন আজ সম্রাট। এবং একথা বৎসেবা নানান ভাবে, নানা ইঙ্গিতে শলোমনকে স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু এইসব আভাসপূর্ণ কথা শুনতে শুনতে শলোমন নিত্যই আত্মগ্লানি বোধ করেন। মনে হয় তিনিও কি তাহলে ছায়ামূর্তি মাত্র!

—শোনো শলোমন, এই রাজ্যের স্রষ্টা তুমি নও, প্রতিষ্ঠাও তুমি করনি। তোমার

উপর রয়েছে শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। বলে নিজের বুকটাকে প্রশ্বাস টেনে সামান্য কেমন স্ফীত করে তুললেন জননী বৎসেবা। মায়ের এই রকম একটা হৃষ্ট ভঙ্গিমা সেই কবে থেকে দেখে আসছেন শলোমন এবং এই এক কথা শুনে কান পচে গেছে।

আজ কী হল সম্রাটের, তিনি বিনীত স্বরের মধ্যে কিঞ্চিৎ উষ্মা ঢেলে বলে উঠলেন— আমি জানি এই রাজ্যের স্রষ্টা স্বয়ং ঈশ্বর ইলোহে-এল্-আলিফ। হ্যাঁ, ঠিকই, আমি একে সৃষ্টি করিনি। এবং যাঁদের দিয়ে ইলোহে এই কাজ করিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই আমার নমস্য, প্রত্যেকের কাছেই আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

—তোমার কৃতজ্ঞতা এত নানামুখী কেন বুঝি না! তুমি আমার পুত্র, তোমাকে সব কথা খুলে বলা যায় না, শুধু এটুকু মনে রেখো, ওই সিংহাসন অনেক অপমানের বদলে পেয়েছি আমরা।

—হ্যাঁ, একজন চরম অপমানিতার প্রাপ্য উপহার এই সিংহাসন, জানি বইকি!

—জানো তাহলে! বেশ তো! তোমার অবাক করা জ্ঞান, যা তোমাকে ইলোহে দিয়েছেন, তা যেন এই চরম সত্যকে ছেড়ে না যায়!

—জ্ঞান দিয়ে মানুষ শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না মা।

—বেশ তো, জ্ঞান কখনও অকৃতজ্ঞও হয় না।

ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন শলোমন। যেহেতু তিনি শলোমন অর্থাৎ শান্ত, তাই হৃদয়কে সামাল দিয়ে বললেন— সেই কথাই তো বলছি মা! জ্ঞানের স্বভাবই হল খানিকটা উপচে পড়া, তা সবচেয়ে কাছের পাত্রটাকে ভরে তুলেও আরও অন্য পাত্রে ছড়িয়ে যায়, তা সূর্যদেব শামসের মতো অকৃপণ।

—এই সব বড় বড় কথার কোনও মানে নেই শান্ত, যদি-না, সিংহাসনটা ঠিকঠাক আঁকড়ে থাকতে পার! কেন তুমি জ্ঞান চেয়েছিলে তোমার স্বপ্নের ঈশ্বরের কাছে? সিংহাসন যাতে চলে না যায়, তাই তো?

—না। কখনওই না। আমি সিংহাসনে তোমার আশীর্বাদ নিয়ে বসার মুহূর্তেই জেনেছিলাম, এ সিংহাসন আমার নয়।

—তবে কার?

—তোমারই।

—নারী কখনও সিংহাসনে বসে না পুত্র।

—তাইই তো আমাকে বসতে হয়েছে মা! তবে সিংহাসনে বসে কেন জানি না মনে হয়েছিল, এই আসনে বসলে সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করা যাবে। চরম যন্ত্রণা ছাড়া পরম জ্ঞান কি সম্ভব! এই সিংহাসন অকৃতজ্ঞতা, চাতুরি আর অন্যায় যুদ্ধের ফল এবং তাকে অভিশাপের গহ্বরে বসিয়ে রেখেছ তুমি। শিশুদের বধ না করলে এই সিংহাসন কায়েম হয় না, কী আশ্চর্য!

—অন্যায় তো বটেই, কিন্তু কোনও নীতি আর অনুজ্ঞাকে অন্যায় বলতে নেই পুত্র। তা যদি ধরতে হয়, তাহলে, এই মরুভূমির সাতটি প্রধান জাতির প্রধানতম হিত্তীয়, সর্বোন্নত জাতি, তার কী দশা করেছ ইস্রায়েল-পুত্র, আমার প্রথম স্বামীকে মরতে হল কেন? তোমরা এই জাতির নখের যোগ্যও ছিলে না। ওহে শ্রুতিমান-শ্রোত্রিয় আমার ছেলেকে শাস্ত্রবাক্য আর ইতিহাস শোনাও তো! এর মন

বিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ আর্যকে মন্ত্রী করেছে!

—ঠিকই করেছি আমি।

—মোটেও ঠিক কর নাই। শোন, জ্ঞানকে সিংহাসনমুখী আর সংহত কর। আমি তোমাকে রাজা করেছি সিংহাসন খোয়াবো বলে নাকি! যাইই কর, তুমি আর্য বিবাহ করবে না।

—কেন?

—বিবাহে হিত্তীয়রা বশ মানে। আর্যরা হিত্তীয়-সংসর্গ পছন্দ করলেও যাকোব (ইস্রায়েল)-এর বংশকে কখনও পছন্দ করে না। তাদের ঘরে কোনও বৎসেবা নেই। আমি এখন যাব, স্মার্ত একে বলে দাও, শলোমন আসলে কে?

—আমি কে? কে আমি!

—কেন, তুমি রাজা। তুমি রাজা গো, তুমি সম্রাট দাউদের হিত্তীয় পুত্র!

—হিত্তীয় পুত্র!

—কেন, আমি হিত্তীয় নই?

—ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ। তুমি উরিয়র স্ত্রী। তুমি পবিত্র উরিয়র পত্নী।

—আমাকে অপমান করে তুমি সুখী হবে না শলোমন! তুমি প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বুঝে ফেলবে। গালিয়াতের বাবার নাম সিমন গালিয়াৎ— কেমন! সিমন কে? বল, কে? আর্যরাজ সিমন, নাম শোনোনি? সম্রাট এই রাজাকেই বর্শা দিয়ে মাটিতে গেঁথেছিলেন। মিন্দা গালিয়াৎ কখনও সেই সর্বনাশ ভুলে যায়নি খোকা! আমি হলেও ভুলতাম না।

—মা!

এই প্রত্যুষে শলোমনের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল। তিনি যে দাউদের হিত্তীয়পুত্র, মায়ের এই উচ্চারণ কেমন রহস্যময় যেন। অপর দিকে সিমন গালিয়াতের পুত্র খেতা গালিয়াৎ। এই তথ্য মা উদ্ধার করে এনেছেন। মিন্দা গালিয়াৎ এবং বৎসেবা তাঁদের সর্বনাশ কখনও ভুলতে পারেন না। তাহলে বলা যায়, ওই বৎসেবা কখনও দাউদের হন নাই। বৎসেবার চেয়ে দুর্বোধ্য রহস্যময় নারী মরুভূতিতে জন্মে নাই। এমন প্রভুত্বকামী হৃদয় কখনও শান্ত হয় না।

বৎসেবা কখনও বুঝবেন না, স্বপ্নের ঈশ্বরের কাছে শলোমন কেন জ্ঞান প্রার্থনা করেছেন। শুধুমাত্র সিংহাসন রক্ষার কাজে জ্ঞানকে ব্যবহার করলে শলোমন কি সুখী হতে পারবেন? বৎসেবা তো জ্ঞানের আর কোনও সার্থকতা এবং উদ্দেশ্য রয়েছে বলে ভাবতে পারেন না। মরুভূমিতে কোনও অধিপতিই কখনও জ্ঞানের সাহচর্য চায়নি, তারা কখনও হৃদয় যে সত্য বলতে পারে এবং হৃদয়কে সত্যের পালক দিয়ে ওজন করা হবে বলে কোনও দিব্যতাকে নীতিরূপে প্রতিষ্ঠা করেনি। শলোমন নিজেকে বললেন, আমি বৎসেবার বক্ষোলগ্ন মূর্তির মতো, আমি বৎসেবার খেলনা-রাজপুরুষ, আমি কেন হৃদয় নিয়ে চিন্তা করি?

যাঁরা ইতিহাসের নাটকগুলি এবং ঈশ্বর-অনুজ্ঞা শ্রুতিদ্বারা স্মরণে রেখে মুখের ভাষায় ব্যাখ্যা করেন তাঁরা শ্রুতিমান-শ্রোত্রিয়—স্মৃতির ব্যবহারকারী ভাষ্যকাররাই মায়ের মতে শ্রুতিমান, এরা আসলে হিত্তীয় পুরুত। দু'জন সমর্থ দেহরক্ষী ছাড়াও একজন শ্রোত্রিয়-শ্রুতিমানকে বৎসেবা সর্বদা সঙ্গে রাখেন।

ওই পুরুত আউড়ে উঠল— "তোমার পিতৃপুরুষ আব্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোব (ইস্রায়েল)-এর কাছে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি তোমাকে উপস্থিত করিলে পর তুমি যাহা গাঁথ (নির্মাণ কর) নাই, এমন বৃহৎ বৃহৎ ও সুন্দর সুন্দর নগর এবং যাহাতে (কখনও) কিছুই সঞ্চয় কর নাই, উত্তম উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ এমন সকল গৃহ এবং যাহা খুদ (খোদিত কর) নাই, এমন সকল খনিত কূপ এবং যাহা প্রস্তুত কর নাই, এমন সকল দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিত (বৃক্ষ)-ক্ষেত্র পাইয়া যখন তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে, তৎকালে আপনার বিষয়ে সাবধান থাকিও।"

—মা!

—হ্যাঁ, তুমি সাবধান থাকিও বৎস। চল শ্রোত্রিয় আমরা যাই। বলে শৌলগৃহের মেঝেয় স্থাপিত শিবিকায় প্রবেশ করার জন্য পর্দা তুললেন বৎসেবা। তারপর পর্দা ছেড়ে দিয়ে ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন— সাবধান থাকিও আর আদর্শ ভুলিও না।

—আদর্শ?

—অবাক হলে নাকি, তুমি তোমার আদর্শ ভুলে গেলে ইতিমধ্যে। কী করবার জন্য তুমি সিংহাসনে বসেছ শলোমন?

—মন্দির?

—হ্যাঁ, জিরুজালেমে ইলোহের মন্দির। যা তোমার বাবা পাপভয়ে পারেননি। উরিয় হত্যার পাপ আর যেন কী··· আমি বলি কি, সেই ধরনের কোনও পাপ যেন তোমাকে স্পর্শ না করে ওহে আমার পবিত্র-শিশু, আমার মহাজ্ঞানী শুলায়মন। আমার সাধের খোকা, সাবধানে থেকো বাবা।

বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন বৎসেবা। তারপর দ্রুত হাতে পর্দা ঠেলে শিবিকার ভেতরে ঢুকে পড়লেন। এক দণ্ড পরেই ভিতর থেকে পর্দা ঠেলে বাইরে মুখ বাড়িয়ে তিনি বললেন—তোমার মন্দিরে মরুভূমির সাত জাতির কাউকে বাদ দিও না, প্রত্যেকের ভগবানকে রেখো। অন্তত জাতিশ্রেষ্ঠ হিত্তীয়কে নিশ্চিহ্ন ক'রো না।

—তা হলে তো, এই মন্দির নির্মাণের কোনও মানে হয় না মা। এল্-ইলোহে-ইস্রায়েল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর তো এক এবং অদ্বিতীয়, এর কোনও শরিক হতে পারে না। বাবা কি তোমার কথা শুনতেন?

—উনি শুনতেন না, তুমি শুনবে। তোমার মনে পাপ ঢোকার আগে এবং দু'হাতে রক্ত মাখার আগেই এই পবিত্র কাজ শুরু এবং শেষ করে দাও। তোলো, কাঁধে তোলো পালকি। কই হে, বেহারা।

পালকি চলে গেলে সম্রাট শলোমন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। শৌলদুর্গের শৌল-সিংহাসনে চুপচাপ বসে পড়লেন। প্রথমে তিনি ভাবলেন, হাবিল-কাবিলকে ডাকবেন কি না। পরক্ষণেই সিংহাসন ছেড়ে চকিতে উঠে দাঁড়ালেন। কেমন গুমরে উঠল বুকের ভেতরটা।

আপন মনে বিড়বিড় করে উঠলেন শলোমন—আমিও শ্রুতিমান মা। আমাকে মানুষের ইতিহাস বড় কষ্ট দেয়। আমি কে? কেউ নই। কিন্তু তোমাকে বলা হল না, ঈশ্বরীয় সিন্দুকে যাকোবের বারো গোষ্ঠীর জন্যই কেবল পাথুরে বারো টুকরো রুটির ছবি টাঙানো আছে। গুলিবাঁট করে এই বারো গোষ্ঠীই কেনানকে ভাগ করে

নিয়েছে। তোমার সাত জাতির কথা আমি ভাবব কেন? এই ঈশ্বর-সিন্দুকের প্রতিষ্ঠাই আমার কাজ। মন্দির আমার আদর্শ, সেখানে তোমার স্থান কোথায় বৎসেবা? এবং···

—এবং কী?

—কে?

—আমি তোমার সিংহাসন কথা বলছি পুত্র। আমি রাজা শৌল। আমি পাগল রাজা।

—তুমি কেন?

—অংক মেলাও। হিসাব কর। ইতিহাসটা তোমার হৃদয়ের হাসির খোরাক হোক ছেলে। আমি মেলাতে না পেরে পাগল হয়েছিলাম। দাউদ আমাকে পাগল বলেই রাজ্যচ্যুত করে। আমারই সিংহাসন সে কেড়ে নেয়। জানো তো, আমি আত্মহত্যা করেছি। কেন? আমি সাত জাতিকে ঘৃণা করিনি। তাদের আচারে হস্তক্ষেপ করিনি। এই দেশটা আসলে তাদেরই। আর এই দেশটা অভিশপ্তদের। অমালেক, অম্মোন, মোয়াব, ইদোম, ইশ্মায়েলের দেশ এটা। লাল মরু থেকে কালো মরুতে তাদের তুলে আনো খোকা। তোমার মন্দিরে এদের প্রত্যেকের যেন চিহ্ন থাকে।

—না, না, এ হয় না। কিছুতেই হয় না। স্বয়ং আব্রাহাম তাঁর দাসীপুত্র ইশ্মায়েলকে উৎসর্গ করেও ... না থাক, তুমি বুঝবে না।

—কেন বুঝব না। আরে শোন শান্ত, আব্রাহাম কাকে উৎসর্গ করেন, ইশ্মায়েল না ইসহাককে, তাইই তো শাস্ত্রকাররা ঠিক করে বলতে পারেন না। পারেন নিশ্চয়। তবে উৎসর্গের সম্মান দাসীপুত্রকে দেওয়া যায় না। ইতিহাস চাইলে পুত্রকে নির্বাসিন দিতে হবে, অস্বীকার করতে হবে।

—অতএব আমি বৎসেবাকে অস্বীকার করব। এই সিংহাসন আমার। মন্দির আমাকেই গড়তে হবে। ভেবে দেখুন মহামতি শৌল···

—সবই তো দেখছি আমি। দেখছি যে, তুমি আমারই মতো পাগল হয়ে যাচ্ছ। কিন্তু পাগল হলে তো চলবে না। তুমি ধীমান এবং শ্রোত্রিয়। আগে ঠিক কর, ইতিহাসে তুমি কিভাবে বাঁচতে চাও। আমার মতো কি ব্যর্থ হবে তুমি? আত্মহত্যা করবে?

—না, না। জানি, আমার পরমায়ু বেশি নয়। কারণ আমি ঈশ্বরের কাছে পরমায়ু প্রার্থনা করিনি। এই সামান্য পরমায়ু আত্মহত্যায় নষ্ট করব না আমি। সামান্য আয়ুকে আমি জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করব। জ্ঞানেরই অন্য নাম সুবিচার।

—শুধু জ্ঞান দিয়েও বাঁচা যায় না ইতিহাসে। কর্মও চাই।

—মন্দির গড়ব আমি।

—মন্দির পবিত্র নিশ্চয়। কিন্তু তোমার জ্ঞানের চেয়ে পবিত্র নয়। কারণ মন্দির রক্তক্ষয় ছাড়া প্রতিষ্ঠা হবে না। মন্দিরের চুড়োটা তোমার স্পর্ধা, পুত্র। ভেবে দ্যাখ, চুড়োটা কতদূর উঠবে।

—আমার দু'হাত কি রক্তমাখা?

—ভয় পাচ্ছ কেন, শ্রেষ্ঠতম শ্রোত্রিয় কি জানে না, শাস্ত্র কী নিদান বলে। ইতিহাস কী বলে?

—জানি। বলে শলোমন আউড়ে উঠলেন—"তুমি যে দেশ অধিকার করতে

যাইতেছ, সেই দেশে যখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে লইয়া যাইবেন ও তোমার সম্মুখ হইতে অনেক জাতিকে, হিত্তীয়, গির্গাশীয়, ইমোরীয়, কেনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়, তোমা হইতে বৃহৎ ও বলবান এই সাত জাতিকে দূর করিবেন ; আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমার সম্মুখে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবেন এবং তুমি তাহাদিগকে আঘাত করিবে, তখন তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে, তাহাদের সহিত কোনও নিয়ম (সন্ধিপ্রস্তাব অথবা আপোস) করিবে না বা তাহাদের প্রতি দয়া করিবে না। আর তাহাদের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ করিবে না ; তুমি তাহার পুত্রকে আপনার কন্যা দিবে না ও আপন পুত্রের জন্য তাহার কন্যা গ্রহণ করিবে না। কেননা...

এই অবধি উচ্চারণ করে শলোমন আপন মনে হো হো করে হেসে উঠলেন। সেই হাসির শব্দ শুনে তাঁর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ছায়ামূর্তি হাবিল-কাবিল তার দুই পাশে এগিয়ে এল।

দৃষ্টি তেরছে তাদের পায়ের দিকে চাইলেন সম্রাট। দেখলেন, তাঁর ছায়াদের পা তাঁর চেয়ে সুন্দর। পা ফাটে না। অথচ তাঁর পা শীতের কামড়ে ফেটে যায়, সেই ফাটলে তপ্ত বালু ঢুকে বৃশ্চিকবৎ দংশন করে, তাঁর পা মরু-সরণির পক্ষেই উপযুক্ত, অনুমান করা যায়, স্বপ্নদর্শী আব্রাহামের পা কখনও সুন্দর ছিল না। আব্রাহাম ছিলেন মরুভূমির চিরপথিক, আশ্রয় খুঁজে ফেরা বিতাড়িত বেদে। মূশাও পশু চরাতেন। পশু চরাতেন দাউদ। কিন্তু শলোমন ? কেনানের অধীশ্বর, মুখে সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছেন। ওঁরা, বিশেষ করে ইশ্মায়েল জন্মেছিলেন তাঁর দু'হাতের মুঠিতে মধু আর দুধের অদৃশ্য গোপন ভিত্তি নিয়ে। লোকে বলে, তাঁর এক মুঠিতে পূর্ণ ছিল দুধ আর অন্য মুঠিতে মধু।

মধু দুধের দেশ এই কেনানে ওই গল্পটার মানে কী ? সারবত্তা কী ওই কথাটার ? মধুদুধের দেশ, মধুদুধের মুঠি ! সত্যিই কি শিশু ইশ্মায়েলের হাতের মুঠিতে মধু আর দুধ প্রলিপ্ত ছিল ? ইলোহে কি বাস্তবিকই ওই শিশু পয়গম্বরের হাতে মধুদুধের উৎস লুকিয়ে রেখেছিলেন ?

শলোমনের মনে হল, মরুভূমির প্রতিটি হতভাগ্য শিশুর মুঠিতে ইলোহে দান করেন দুধমধুর প্রস্রবণ ! একটি শিশুই ওই মুঠি থেকে দুধ আর মধু টেনে নিতে পারে। শুধু আত্মশোষণে অনেক শিশু বেঁচে থাকে। নিজেকে চুষে চুষে বাঁচে, কারণ মরুভূমির ক্ষুধার্ত নিরন্ন ইগারের বুকের বোঁটা শুকিয়ে যায়, শুকিয়ে যায় ভয়ে আর মরুত্রাসের তাপে আর কষ্টে।

বৈথেলধামের দাউদ-হারেমে এই ধরনের ক্ষুধায় চিঁচি করা আর মুঠি খাওয়া শিশুকে দেখেছেন শলোমন। দেখে অবাক হয়েছিলেন, মাটির উপর পড়ে রয়েছে বাচ্চাটা আর বাচ্চার মা বুড়া রাজার মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে মুখের গহ্বর থেকে মুঠি ছুটে গেলে বাচ্চা চেষ্টা করছে কেঁদে ওঠার। চেষ্টা করছে মাত্র, পারছে না বিশেষ। বাচ্চার পেট পড়ে আছে, মুঠি খেয়ে পেট তো উঠছে না কই ?

শলোমন জানেন, শিশুর পেট ওঠে না কিছুতে। শিশু চেষ্টা করে, কেঁদে যাতে উঠতে না হয় তার জন্য নিজের মুঠিকে মুখের মধ্যে টেনে নেওয়ার। সে বোঝে, বড়ো রাজার মনোরঞ্জনের সময় কেঁদে কেঁদে মাকে জ্বালাতন করতে নেই। এই শিশুর

মা যখন যৌনক্রীড়ায় রাজা ও অভিজাতদের সন্তুষ্ট করতে ব্যস্ত, বাধ্য হয়েই ব্যস্ত বটে, তখন মুহূর্তে এবং ঘনঘন মুঠি মুখ থেকে সরে গেলে, শিশু যে কাঁদে, সেটাই মরুভূমির প্রকৃত কান্না। এই কান্নার ভিতর দিয়ে কাম চরিতার্থ, নারী-সম্ভোগ এবং কখনও কখনও ধর্ষণই কি মানুষের ইতিহাস ?

এই কান্না অসহ্য দেখে ছদ্মবেশে থাকা শলোমন হারেমের একটা সুন্দরীর কক্ষের বাইরের চাতালে মাটিতে পড়ে থাকা মুঠি চোষা শিশুর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লেন। হারেমে সাধারণত সুন্দরীরা বাচ্চা প্রসব করে খুব কম, কারণ বাচ্চা হয়ে গেলে সুন্দরীকে অস্বাস্থ্যকর পুরনো হারেমে চলে যেতে হয়। কোনও কোনও রাজার অনুগ্রহে কোনও কোনও সুন্দরী বাচ্চা সমেত কিছুকাল ভাল হারেমে থেকে যেতে পারে।

শিশুর মুখের কাছে হাঁটু ভেঙে আধবসা ভঙ্গিতে সৈনিকবেশী শলোমন ঝুঁকে পড়েছেন। তিনি কান্না কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছে অসম্ভব। কী একটা দলা মতন গলার কাছে ঠেলে উঠতে চাইছে। আশ্চর্য নিঃস্ব আর অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। এই কান্না হয়তো প্রতিটি মরুকূপের জলের তলে লুকিয়ে রয়েছে।

শলোমন চাইলেন মুখ থেকে ছুটে যাওয়া শিশুর মুঠিটাকে শিশুরই মুখে গুঁজে দিতে আর তখনই আশ্চর্য সেই ঘটনাটা ঘটে গেল। কক্ষের ছাতের ছায়াপড়া সন্ধ্যার ছায়াছায়া জায়গাটা বজ্রের আলোর মতো চমকে উঠল। আজও শলোমন বুঝে পান না, সেই তীব্র আলো কোথা থেকে কিভাবে এক মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠেছিল ! শলোমন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার সাহস পাচ্ছেন না, কিন্তু খুব স্পষ্ট মনে হচ্ছে, ছায়ার মতো হালকা ডানামেলা একটা দেহ শলোমনের গা-ঘেঁষে বসে তাঁর হাত বাড়ানোর আগেই শিশুর মুঠিটা আলোকময় হাত দিয়ে ঠেলে দিয়েছে এবং শিশুরই মুখে মুঠি চকিতে গুঁজে দিয়ে চলে গেল কোথায় !

অতি স্পষ্ট হলেও ব্যাপারটা মাথায় যেন ঢুকতে চাইছে না। এ কান্না তাহলে দেবদূতরা সহ্য করতে পারে না ; মানুষ পারে। নাকি ওটা দেবদূত নয়, ওটি ইগার ! তবে মানুষ সবই পারে। একজন রাজা কী না পারে ! দেবদূত তাহলে ইশ্মায়েলের মুঠিটা ছুটে গেলে এইভাবে গুঁজে দিত ! শলোমন দেখতে পেলেন না কিভাবে একটা শিশু তার নিজের কান্না নিজেই থামিয়ে দেওয়ার জন্য মুঠিটা গুঁজে নেয় মুখে। মধু আর দুধ কি কখনও শলোমনের মুঠিতে ছিল না ! দাউদের কি ছিল না কখনও ? এই হাত কি কেবলই ঢাল আর অসি ধরবার জন্য ? শিশুর কোমল গালের পাশে ওই কার কুশ্রী পা ? কার ? কে ওই লোকটা ?

ওই পা দেখতে পেলেন সম্রাট শলোমন, তারপর নিজেরই ভেতর আঁতকে উঠলেন। ওই পায়ে খড়ম পরা ছিল শলোমনের। সৈনিক বেশ থাকলেও ভুলবশত পায়ে ওই রকম পাদুকা ছিল কেন সেদিন ? বিশ্রী পা ঢাকা দেওয়ার মতো সৈন্যপাদুকা কি ছিল না তাঁর ?

—আপনি কেন এভাবে হাসছেন সম্রাট ?

—আমার হাসিকান্নাকেও কি তাহলে প্রশ্ন করবে হাবিল-কাবিল ?

—আজ্ঞে, প্রভু। ছায়ার সেই সাধ্য নেই। প্রশ্ন নয়, কৌতূহল মাত্র। ক্ষমা

করবেন মহানুভব।

শলোমন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর স্বগোক্তি করলেন—"তুমি তাহার পুত্রকে আপনার কন্যা দিবে না ও আপন পুত্রের জন্য তাহার কন্যা গ্রহণ করিবে না। কেননা সে (এই সপ্তজাতি) তোমার সন্তানকে আমার (ইলোহের) অনুগমন (অনুগামী) হইতে ফিরাইবে। (যেমন রাজা শৌল সাতজাতির আদিধর্মে ফিরে গিয়েছিলেন) বা বাধা দিবে আর তাহারা অন্য দেবগণের সেবা করিবে (অর্থাৎ আদি দেবদেবীর সেবা করিবে)। তাই তোমাদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইবে এবং তিনি তোমাকে শীঘ্র বিনষ্ট করিবেন। অতএব, তোমরা বা তুমি তাহাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে— তাহাদের যজ্ঞবেদীসমূহ উৎপাটন করিবে, তাহাদের স্তম্ভসকল ভাঙিয়া ফেলিবে, তাহাদের আশেরা-মূর্তি, (এলা বৃক্ষতলে লাঠিপুঁতে এই দেবতার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়), এই আশেরাকে ছেদন করিবে এবং তাহাদের ক্ষোদিত প্রতিমা সকল অগ্নিতে পুড়াইয়া দিবে।"

সম্রাট দাউদ কত আশেরা-মূর্তিকেই ছেদন করেছিলেন কিন্তু বৎসেবার বুকে ধরা দেবমূর্তিকে কখনও কেড়ে নিয়ে জ্বালিয়ে দিতে পারেননি। সেই না পারা, সেই অক্ষমতা কেন ? কারণ বৎসেবা দাউদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে এই দেবতার অর্চনা করতেন। তিনি তাঁর দেবতাদের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিগ্রহ মাথার বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখতেন। এখন বৎসেবা নির্ভয় এবং প্রকাশ্য পূজা করেন।

ইলোহের নির্দেশ মানেননি স্বয়ং সম্রাট দাউদ। বৎসেবাকে বিবাহ শাস্ত্র অনুযায়ী অত্যন্ত ভুল। ধর্ষণ এবং বিবাহ-পীড়িতা নারী বৎসেবা। তাঁর কাছে সম্রাট দাউদের অপরাধের সীমা ছিল না। এই পিতৃ-অপরাধে অপরাধী শলোমন এখন কী করবেন ? তিনি তো আসলে বুঝেই পাচ্ছেন না, তিনি আসলে কে ?

—আচ্ছা হাবিল-কাবিল, মরুভূমিতে মানুষ বিগ্রহ-পূজা করে ?

—করে আজ্ঞে, তবে গোপনে।

—তোমরা বিগ্রহ ছেদন কর ?

—চোখে পড়লে করি।

—মানুষের লিঙ্গাগ্রত্বক ছিন্ন করে দাও ?

—আদর্শের জন্য করাই তো উচিত, আজ্ঞে।

—না, ঈশ্বর-অনুজ্ঞা ছাড়া এই কাজ করবে না। নিজের সন্তানের করবে, অন্যের নয়, আব্রাহাম আপন সন্তানের করেছিলেন।

—আজ্ঞে ! কিন্তু···

—বল।

—যাকোব অর্থাৎ ইস্রায়েলের দুই পুত্র শেখেমের পুরনো রাজা ঘমোর এবং তার পুত্রের লিঙ্গাগ্রত্বক ছিন্ন করেছিলেন জোর করেই এক প্রকার। করেননি ?

—যাকোব কথার অর্থ প্রবঞ্চক। ওঁর কিছু নিষ্ঠুরতা ছিল। আব্রাহাম স্বীয় মাংসে ঈশ্বর-অনুজ্ঞা চিহ্নিত করেন। অন্য জাতির উপর বলপ্রয়োগ ওঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

—তবে তিনি লোতের উপর নিশ্চয়ই জুলুম করেছিলেন।

—না, হয়তো অভিশাপ দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা যাইই করে থাকুন, আমি বলি কি, আপন মাংসকে ছিন্ন কর, সপ্তজাতির উপর কোনও ধরনের বলপ্রয়োগ

করবে না।

—বলপ্রয়োগ ছাড়া ধর্ম এবং আদর্শ হয় না মহানুভব। আশেরাকে ছেদন না করলে ইলোহের স্থান হয় না।

—ভুল কথা আদম-পুত্র। ঈশ্বর-অনুজ্ঞা স্বপ্নে আসে, আপন মাংসে সেই অনুজ্ঞা চিহ্নিত হয়। আপন মাংস, মনে রাখবে আপন মাংস। এই যেমন···

—বলুন মহারাজা !

—আমার বাবার আপন-মাংস আমি। আমার শৈশবে তিনি ঈশ্বর-অনুজ্ঞা চিহ্নিত করেছেন আমার লিঙ্গাগ্র-ত্বকে, তিনি আমাকেই ছিন্ন করেছেন। আমাকেই··· কেননা মায়ের এতে আপত্তি ছিল। বুঝলে, আপত্তি ছিল মায়ের। বাবা জোর করেন।

—কারণ।

—কারণ ?

—বৎসেবা কেন আপত্তি করবেন, ভেবে দেখুন। সম্রাট দাউদ কেন জোর করবেন।

—কেন ?

—আপনার উপর বলপ্রয়োগ কেন হবে ? ইগারের কাছ থেকে ইশ্মায়েলকে ছিনিয়ে এনেছিলেন মহামতি আব্রাহাম। কিছুটা বলপ্রয়োগ আজ্ঞে তখনই হয়েছে, এটা ঐতিহ্য আমাদের। সেই রকম মহারাণী বৎসেবা চাইছিলেন···

—কী চাইছিলেন ? বল, নাথনপন্থীরা কী বলে ? বলে যাও হাবিল-কাবিল, বলে যাও।

—আজ্ঞে, বৎসেবা চাইছিলেন, ইগারের যেমন আপত্তি ছিল আবার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা-ও তো ছিল না। অবশ্য···

—বল।

—অনুজ্ঞা চিহ্নিত না হলে সম্রাটের উত্তরাধিকার অন্য পুত্রদের কেউ পেয়ে যেত। বৎসেবা বঞ্চিত হতেন। নাথনপন্থীরা এই রকমই বলে থাকে হুজুর। তাছাড়া অন্যরাও বলে। মরুভূমিতে এটা একটা কেচ্ছা মহামতি, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। ইলোহের খাস বান্দারা স্বাতন্ত্র্যবাদী মহামান্য সম্রাট।

—আমি কি তাহলে ধর্মান্তরিত মাংস ? আমি কি অতএব আমি নই ? বলে দীর্ণ ভয়ংকর হাহাকার করে উঠলেন শলোমন। মনে হচ্ছিল, বৎসেবাই তাঁর আমূল প্রতিপক্ষ। এই নারীর বুক থেকে সকল দেবমূর্তি ছিনিয়ে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করা দরকার।

—স্বাতন্ত্র্যবাদী কে নয় আদমপুত্র ! প্রত্যেক দেবতা যেমন আলাদা, তেমনি প্রত্যেক জাতি আলাদা, তেমনি প্রত্যেকটা রাজা আলাদা এবং মানুষ মাত্রই আলাদা। মানুষকে ভাগ করে দিয়েছেন ভগবান এল্। কিন্তু সবাইকে বেঁধে রাখার উপায় কী ? ভগবান যাঁদের আলাদা করেছেন, আমি তাদের এক করব কী করে ? জ্ঞান দিয়ে কি মানুষকে এক করা যায় ? প্রজ্ঞা ? আমার প্রজ্ঞা কি কোনও কাজে লাগবে এই মরুভূমিতে ? কোনও মানুষই তো তার হৃদয়কে ভয় করে না। মানুষকে ধ্বংস করতে করতে, নারীকে ধর্ষণ করতে করতে, শিশুকে বধ করতে করতে এগোনোই কি ইতিহাস ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই-ই ইতিহাস ! ধ্বংস না করলে গড়া যায় না।

—বিনষ্ট এবং নিশ্চিহ্ন করতে হবে ?

—জয়ীরা তাই-ই করেন। অন্যের মূর্তি, অন্যের মতবাদ সহ্য করেন না, অন্যের সভ্যতা শেষ করে দেন।

—মানুষকে কি এক করা যায় না, শুধু ধ্বংস করা যায় ?

—আপনার শত্রু সর্বত্র প্রস্তুত সারগন, সামান্য অসতর্ক হলে…

—আমি শেষ হব, তাই না ? তাহলে তো বৎসেবাকে বিনষ্ট করতে হয় হাবিল-কাবিল ! নইলে উনি তো আমাকে খেলনার মতো ব্যবহার করবেন।

—হিত্তীয় রাজারা মায়ের সেবক হুজুর ! মা চাইছেন, হিত্তীয় রাজশক্তিকে যুদ্ধরথ দেওয়া হোক। উনি বলেন হিত্তীয় গর্ভ থেকে রাজা জন্মায়। উনিই কেনান-জননী। উনি সারি অপেক্ষা গরীয়সী। হিত্তীয়দের খাসভাবে দেখতে হবে এবং সুবিধা দিতে হবে।

—আর আর্যরা ? তারা কী চায় ?

শলোমনের এই গম্ভীর জিজ্ঞাসায় তাঁর ছায়ামূর্তিরা চুপ করে রইল। শলোমন বুঝলেন, এই প্রশ্নের উত্তর ওরা জানে না।

—ঠিক আছে, গালিয়াৎকে ডাকো। এবং আমি চাই, বোবা-উন্মাদটি কোথায় খুঁজে বার কর তোমরা। সারিনকে বল, সে বিয়ের ক্ষুদ্র শিবিকা সাজিয়ে দিক আর সাদা ঘোড়াকে মেহেদি রাঙিয়ে তৈরি করুক।

—আপনি বিবাহ করবেন ?

—হ্যাঁ।

—আর্য-বিবাহ করবেন ?

—হ্যাঁ।

ছায়ামূর্তিরা আবার নীরব হয়ে গেল। তারপর শৌলগৃহ থেকে সরে গেল। গালিয়াৎ কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্রাটের সামনে উপস্থিত হল। কী আশ্চর্য সম্রাট তাঁকে ইব্রিয়া বিষয়ে কোনও প্রশ্নই করলেন না।

কিন্তু সম্রাটের নির্দেশ শুনে গালিয়াৎ অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সে তার মনোভাব অবশ্য গোপন করে বলল—আর্যরাজের পক্ষে আপনার এ অনুগ্রহ নিশ্চয়ই সম্মানজনক।

—কিন্তু রাজা বিবলিসের জ্যৈষ্ঠ কন্যা এই প্রস্তাব শুনে চন্দ্রকলা নাচের পর আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে। তুমি দ্বিতীয়া কন্যা ইলার জন্য এই প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছ। মনে রাখবে তুমি যদি সফল হও, তোমাকে আমি পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদা দেব।

এবার গালিয়াৎ বিমূঢ় হয়ে গেল। তার ভুরুর মধ্যবর্তী স্থান সিরসির করে উঠল। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—তুমি কি মর্যাদা চাও না গালিয়াৎ ?

—আমি আপনার আজ্ঞাবহ দাস হুজুর ! আপনার প্রস্তাব আর্যরাজের কাছে পেশ করব আমি। কিন্তু দ্বিতীয়া-কন্যাও যদি আত্মাহুতি দেয়, তাহলে কী করবেন ?

—তুমি আর্য এবং রাজপুত্র বলেই তো তোমাকে অসাধ্যসাধন করতে পাঠাচ্ছি। তুমি পুরস্কৃত হবে গালিয়াৎ।

—আমি রাজপুত্র ? হুজুর, এ আপনি কোথায় শুনলেন ? আমি রঙের কারিগর

ছিলাম।

—আমার কাছে কিছুই গোপন থাকে না গালিয়াৎ। তুমি প্রস্তুত হও।

পাণি-শিবিকা রত্ন-অলংকারে পূর্ণ করে সাজিয়ে নিয়েছিল সারিন। মরুভূমিতে এই প্রথম দেখা যাচ্ছে, শৌখিন রথের চাকাও লৌহ-নির্মিত, কাঠের তৈরি নয়। তবে শলোমনের রথই এইরূপ অপূর্ব। রাজাদের শখের রথগুলি এখনও কাঠের, এমন কি সে যদি মালাটিয়ার রাজা হয়, তা-ও তার রথের চাকা লোহা দিয়ে গড়া হয় না।

লোহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করেছেন শলোমন। ইষানুল লৌহ-কারিগরি এবং লোহ-উৎপাদক বিদ্যা মালাটিয়ায় সীমাবদ্ধ এবং গোপন করে রাখলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে সে-ও লৌহ-ব্যবহারকারী রাজা নয়। একটি মাত্র রথ সে একবার পেয়েছিল, সেটি যুদ্ধরথ, তার চাকা লোহার। সেটি ইষানুল সাজিয়ে রেখেছে মানুষকে দেখাবার জন্য। এই রথই হিত্তীয়দের শৌর্যের প্রকাশ। পড়ে থাকা সেই রথের চাকায় মরচে ধরেছে।

পলেস্টীয় আর্য রাজারা পরাস্ত এবং তারাও লোহার ব্যবহার করতে পারে না এখন। শলোমন তাদের হাত থেকে সমস্ত লৌহ-অস্ত্র কেড়ে নিয়েছেন। সম্রাট দাউদের কাছে যুদ্ধে আত্মসমর্পণের সময়ই আর্যরা সমস্ত অস্ত্র জমা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল। দাউদের মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত সেই সব যুদ্ধাস্ত্র জমা করার কর্মসূচিতে ছেদ পড়েনি। বলা বাহুল্য, দাউদের কাছে অঙ্গীকার করলেও আর্যরা পুরোপুরি কথা রাখেনি। এখনও আর্য-বন্দর এবং গ্রামগুলিতে যুদ্ধাস্ত্র রয়েছে, লুকনো সেই সব অস্ত্র উদ্ধার করার কাজ অব্যাহত। গ্রামে গ্রামে এখনও অতর্কিতে সেনারা হানা দিয়ে তল্লাশি চালায়। দু'-একটি লৌহরথও উদ্ধার করে আনা হয়।

মৃতশুষ্ক কূপগুলির ভিতরে চাকা এবং বিভিন্ন অংশ খুলে রথ ডাবিয়ে রেখেছে আর্যরা এবং কূপগুলি বুজিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে কূপ খুঁড়ে তুলে আনে লৌহাংশগুলি এবং মরচের ক্ষয় থেকে বাঁচানোর জন্য বিশেষ এক ধরনের তেল এবং মোম লাগিয়ে নেয় তারা। তারপর শুকনো কূপের বালির তলায় পুঁতে রাখে। ঝকঝকে বালির আস্তরণের তলায় অস্ত্র এবং রথ জীবন্ত থেকে যায়।

উল্কা-বিক্ষত পাথুরে মাটি ছাড়া লোহা কোথায় ! তাই হিত্তীয়দের উত্তরাঞ্চলই লোহার জায়গা। লৌহ-আকর ভূমধ্যসিন্ধুর উপকূল-অঞ্চল আর্য বাসভূমিতেও নেই। ফলে লোহার জন্য হাহাকার কখনও ঘোচে না কেনানের। স্বল্প-পরিমাণ লোহার তাই সদ্ব্যবহার করেন শলোমন, তাঁর জ্ঞান তাঁকে সতর্ক করেছে এই বলে যে, লোহা এবং লৌহাস্ত্র নিজের করপুটে রাখাই সাম্রাজ্য-রক্ষার মৌলশক্তি এবং কৌশল। অন্যের হাত থেকে লোহা কেড়ে নাও। কেড়ে নাও ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণ।

রথ-নগরীগুলি সীমান্তবর্তী। কেনানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য রথ-নগরীর পরিকল্পনা মরুভূমির মহা সারগন শলোমনের রাজনৈতিক নিজস্ব অবদান। তিনি ভেবে দেখেছেন, এইভাবে রথ-নগরীগুলি বিভিন্ন সীমান্তে কঠিন শৃঙ্খলায় সাজিয়ে না রাখলে মরুভূমিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছাড়া জিরুজালেমে ইলোহের মন্দির নির্মাণ করাও যাবে না। সব সময় যুদ্ধের আতঙ্কই শান্তিরক্ষার উপায়।

আবার অপরপক্ষে মরুভূমির মৃতশুষ্ক কূপগুলি যুদ্ধগর্ভ, সেখান থেকে রথ এবং

লৌহ-অস্ত্র হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠতে পারে। বিবলিসের কাঠের রাজবাড়ি, শোনা যায়, কতকগুলি মৃতকূপের সমাধির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং কূপ মৃত হলেও তার গর্ভ যুদ্ধের জন্য এখনও জীবন্ত।

বিবলিসের রাজবাড়ির মাইল খানেক তফাতে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্তী সড়কের পাশেই খাড়া হয়ে রয়েছে দৃপ্ত এক রথ-নগরী ইফ্রা। সহস্র অশ্বের হ্রেষা সেখানকার বাতাস মথিত করছে সর্বক্ষণ এবং আকাশে জাগিয়ে তুলছে যুদ্ধের আতঙ্ক এবং দাউদের শৌর্য। আর তূরীভেরীর নিনাদ মাঝে মাঝেই সেই আতঙ্ককে করে তুলছে আরও আতঙ্কময়। ইফ্রার রথশালার গায়ে ধাতুফলক বসানো। লেখা রয়েছে—"এই সমুদ্র-উপকূলের পথ ধরে মহানবি মুশা তাঁর অনুসরণকারী ইস্রায়েলী বাহিনী নিয়ে একদিন প্রবেশ করতে পারেননি কেনানে, এই পথ ছিল তাঁর পক্ষে বিশেষ বিপদের, দাউদ সেই পথকে বনি-ইস্রায়েলদের জন্য করেছেন সবচেয়ে মসৃণ এবং নিরাপদ।"

রথে অধিষ্ঠিত গালিয়াৎ এই ধাতু-ফলকের কাছে এসে রথ থামিয়ে দিল। পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে সারিনকে একবার দেখে নিয়ে বলল— অনেক রক্ত ঢেলে তবেই এই পথ মসৃণ হয়েছে সারিন, আর্যরক্তে এই পথ এখনও পিছল। কিন্তু কারও পক্ষেই খুব কিছু নিরাপদ বলে মনে হয় না।

—কেন ? প্রশ্ন করল সারিন।

—আর্যরা এই ধাতুফলককে স্পর্ধামাত্র ভাবে।

—তুমি কী করে জানলে ?

—নইলে ইলার দিদি আত্মহত্যা করত না। আমি নিশ্চিত ইলার আত্মহত্যার জন্যও আমিই দায়ী হব।

—তুমি কি কাঁদছ গালিয়াৎ ?

—না। বলতে গিয়ে গালিয়াতের গলা শুকনো মরুবাষ্পে ভরে গেল, চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তবু সে বলবার চেষ্টা করল— না, আমি কাঁদছি না! ভাবছি, ইলা কিভাবে সাগরের কূলে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে চন্দ্রকলা নাচবে এবং আগুনে জ্যান্ত ঢুকে পুড়ে যাবে! আসলে এই নাচটা তো লুব্ধক-নাচ সারিন। যে-বছর সূর্যাস্তের পর পরই লুব্ধক রক্তিকা-তারাটা আকাশে ওঠে, সেই বছর নদীতে প্লাবন হয় এবং দুর্ভিক্ষ হয়। লুব্ধক নাচটা হল, ওই তারাকে শান্ত করা, কিন্তু মানুষ প্রার্থনাটা পৌঁছায় সাগরের বুকের আকাশে ঝুলে থাকা চন্দ্রিকার কাছে, কারণ চন্দ্রিকাকলা জোয়ার আনে।

—লুব্ধক-চন্দ্রিকার নাচটা তুমি দেখেছ ? তুমি তো আর্য!

—শস্যের দেবতা দাগনকে রক্ষা করার জন্য এই নাচটা হয় সারিন! দেখেছি। কিন্তু আগুনে পুড়ে মরা...ওই দ্যাখো আর্য....বিধবারা মিছিল করে দাউদ-নগরের দিকে যাচ্ছে। কী দৃশ্য!

—হ্যাঁ।

—বিধবা সব ঘরেই আছে, কিন্তু আর্য-বিধবাদের রকমটা আলাদা। এদের বিয়ে হয় না। এরা না পারে সূর্য-মন্দিরে গিয়ে পতিতা হতে, না পারে দাউদের হারেমে চলে যেতে। তবে নিশ্চয়ই তুমি জানো, এই বিধবারা গোপনে বিক্রি হয়। এরা অনেকেই অক্ষত-যোনি, এদের কারও কারও সতীচ্ছদ ছিঁড়ে যায়নি। আর্যরা মনে করে, এই বৈধব্য পবিত্র এবং বিধবার সতীত্ব আরও মূল্যবান। এদের ভিতর থেকেই দু'একটি

জাদুকায়া জন্মায়। তারা মানুষের ভাগ্য বলে দিতে পারে। তবে এটাও ঠিক, এই জাদুকায়া অত্যন্ত পবিত্র আর সুন্দর হয়। পুরুষের কাছে এদের আকর্ষণ সাংঘাতিক। আবার এদের অশ্রু পাত্রে ধরে আর্যরা সূর্য-তর্পণ করে। যুদ্ধটা তাহলে কী ?

—কী ?

—বিধবা ধর্ষিতার অশ্রুজলে মরুভূমির পূজা। অথচ দ্যাখ, এই অশ্রুজল মরুতাপে বাষ্প হয়ে আকাশে মিলিয়ে যায়। যখন মরীচিকা দেখি, মনে হয় ওই অশ্রুই কাঁপছে দিগন্তে। এই বেদনা যাঁর বুকে নেই, তিনি কি প্রকৃত জ্ঞানী সারিন ?

—আচ্ছা গালিয়াৎ, আর্যরা কি অন্য জাতির মেয়েদের বিধবা করেনি ? হিত্তীয়দের ঘর বিধবায় ভরেছিল কারা ? আমি পতিতা, আমিও বিধবা, তবে আমার অশ্রু কেউ তর্পণ করে না এই যা। মহাজ্ঞানী শুলায়মন আমার চোখের জলের মূল্য দিয়েছেন গালিয়াৎ।

হঠাৎ গালিয়াৎ চিৎকার করে উঠল— আমি তোকে খুন করে ফেলব সারিন!

শলোমন গালিয়াৎ আর সিরিনকে রথে করে বিবাহ প্রস্তাব দিয়ে টায়ার অভিমুখে পাঠিয়ে দেওয়ার পর শৌলদুর্গ নিজেও ত্যাগ করেন এবং দাউদ নগর পৌঁছান। রাজবাড়ির ভিতর ঢুকেই বার হয়ে আসেন। মায়ের সঙ্গে দেখা করে কী বলবেন ভেবে না পেয়ে মায়ের চোখের সামনে থেকে সরে আসেন। শিবিকায় করে আসতে আসতে মা দ্রুত পৌঁছনোর জন্য পথেই একটি শৌখিন এক্কা নিয়েছিলেন। শলোমন ভেবেছিলেন মায়ের সঙ্গে পথেই দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু মা দ্রুতই দাউদ নগর পৌঁছে গিয়েছেন।

শলোমনের একবার মনে হল, বৎসেবার বুকের মূর্তি তিনি কেড়ে নিয়ে ফেলে দেবেন। মায়ের মুখের আলো কিভাবে নিবে যায়, উপভোগ করবেন। কিন্তু কিছুই তাঁর ভাল লাগছিল না। সাদা অশ্ব রামের পিঠে করে শলোমন মরুভূমির মধ্যে একা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আর্য বিধবার মিছিল চোখে পড়ল। আশ্চর্য শুভ্র বেশ, আশ্চর্য কোমল আর স্নিগ্ধ-করুণ বিধবাদের মুখ! দেখেই আজ তাঁর বুকের ভেতরটা কেমন মোচড়াতে লাগল। কখনও এমনটি হয় না।

বিধবাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর মুখটার দিকে চেয়ে দেখে শলোমনের দেহে হঠাৎ কামনা জেগে উঠল কেন ? সাদা অশ্বের আরোহীকে দেখে প্রথমে বিধবার দলটা কেমন হকচকিয়ে থেমে গেল। এই দলটা সম্ভবত দাউদ নগরের কোনও মন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছে। শস্যের সম্ভাবনা আর কামের সম্বন্ধ এই মরুমর্তে নিবিড়। এরা স্বামীদের হারিয়েছে যুদ্ধে। এবং কেউ কেউ আছে, যাদের বরকে বিয়ের রাতেই যুদ্ধে যেতে হয়েছিল, স্বামীর সঙ্গে তাদের সহবাস হয়নি। এরা শস্যের দেবতা দাগনের মন্দিরেই যাবে নিশ্চয়! দাউদ নগরের দাগন সবচেয়ে বৃহৎ বিগ্রহের দেবতা। দেবতার এই বিগ্রহকে ছেদন করেননি কেন সম্রাট দাউদ! সম্ভবত সময় করে উঠতে পারেননি। সর্বত্র দাগন-বিগ্রহ বিনষ্ট হলেও দাউদ-নগরে তিনি থেকে গিয়েছেন। এই দাগনও শস্য-কামের দেবতা। এই দেবতা সপ্তজাতির শস্যদেবতার নকল।

দাগনের মন্দির নাম হলেও, এই বিগ্রহে বালদেবের ছাপ স্পষ্ট। ওই মন্দিরের সামনে একটি ভাঙাচোরা ফলকে বালদেবের যৌন-সংসর্গের উত্তম এবং রগরগে কাহিনী লিপিবদ্ধ। বালদেব কিভাবে বকনা ছদ্মবেশপরা বোন আনাথের সঙ্গে

যৌন-মিলন ঘটান সেই কাহিনী। মনে হয় এটি গোড়ায় বালদেবের মন্দির ছিল, আর্যরা যুদ্ধে দখল নিয়ে ওটিকে দাগনের মন্দিরে পরিণত করেছিল। ফলকটা যুদ্ধের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, নিশ্চিহ্ন হয়নি।

আর্যরা কী না করেছে এই দেশটার! হিটাইট অর্থাৎ হিব্রীয়দের সব সভ্যতা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। প্রথম দিকে ইস্রায়েলী বারো গোষ্ঠীকে অতি ভয়ংকর মার দিয়ে অভিভূত করে ফেলেছিল। মুশা থেকে সেই ভয় শলোমনের আগে দাউদ অবধি এক বিপুল সন্ত্রাস হয়ে জেগে থেকেছে। তারা কেনানীয় দেবতাদের গুঁড়িয়ে দিয়েছে শতেকবার। পুরনো দেবতাদের উৎপাটিত করে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু দেবতা দাগন তো এই কেনানীয় মরুমর্ত্যের আবিষ্কার। আর্যরা বালদেবের আদলে দাগনকে গড়ে নিয়েছে।

আজ পর্যন্ত আর্যদের বিধবারা আনাথকে প্রেম আর যুদ্ধের দেবী ভাবে। প্রেম আর যুদ্ধ। এই দেবীর সঙ্গে দাগনের বিরোধ তো নেইই আর, বরং মিলজুল দেখবার মতো। দাউদ নগরের এই আর্য-মন্দিরে বিধবারা তাদের চোখের পবিত্র জল ফেলতে আসে। চোখের জল প্রেম আর যুদ্ধকে দেয় তারা। আনাথের বকনা বাছুরের ছদ্মবেশের সামনে গড় হয়।

অথচ তারা বকনার ছদ্মবেশ ধরে কামনা চরিতার্থ করতে পারে না। তাহলে কী করে তারা? এই মিছিল থেকেই কেউ কেউ তারা উধাও হয়ে যায়। কিভাবে যায়? চোখেরই সামনে দেখলেন সম্রাট শলোমন। তাঁর কামেচ্ছা জেগেছিল। তিনি আকাশে চোখ তুলে ইলোহেকে স্মরণ করে বললেন— বিধবা এবং দারিদ্রের সমস্যা যুদ্ধই মিটতে দেয় না কখনও। এই বিধবাদের জন্য আমি কী করতে পারি, হায় ঈশ্বর। একদিকে এরা, আর অন্যদিকে বিবলিসের কন্যারা। কী অদ্ভুত! আমার অন্তরকে কি পাপ দখল নিতে চলেছে? না, না, এ হতে পারে না।

সবচেয়ে সুন্দর বিধবার মুখ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন সম্রাট। তাঁর এখন যোদ্ধৃবেশ, এই বিধবারা নিশ্চয়ই ভেবেছে এই ছায়ামূর্তি শলোমনের হৃদয় না হলেও, দৃষ্টি তাঁরই। ওরা সমবেত সুরে প্রার্থনা জানাতে থাকে।

—আমাদের বাঁচাও সারগন, আমাদের গ্রহণ কর। আনাথের দিব্য, আমাদের অন্তরের পাপ থেকে মুক্ত কর মরু-অধিপতি দাউদ-পুত্র। আমাদের লুঠ করে নাও, ধ্বংস করে দাও। আমাদের বাঁদী করে রাখো, আমাদের শেকল পরাও পায়ে। আমাদের খেতে দাও মহাপ্রভু! আমরা আর্য-নারী, আমরা সুন্দরী।

শুনতে শুনতে শিউরে উঠলেন শলোমন। এমন সময় চোখে পড়ল, দূর থেকে ঝড়ের বেগে অভিন্নরূপী দু'টি ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট একটি বৃহৎ বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। এ নিশ্চয় হাবিল-কাবিল। ওদের সামনে শলোমন দাঁড়াতে চান না এখন।

বৃক্ষ এবং ঝোপের আড়াল থেকে সবই লক্ষ করলেন সম্রাট। ওরা দু'টিতে এসে এক লহমায় মিছিল থেকে সবচেয়ে সুন্দর মুখটাকেই উঠিয়ে নিল এবং ওদের একজন অশ্বের সামনে বসিয়ে নিল মেয়েটাকে। তারপর ছুটে গেল সামনের দিকে। মিছিল আবার দাউদ-নগরের দাগন মন্দিরের দিকে চলে যেতে লাগল। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন সম্রাট। বিস্মিত হয়ে কোন্‌দিকে চেয়ে দেখবেন স্থির করতে পারলেন

না। কাদের অনুসরণ করবেন তিনি?

মিখা, মিখা, মিখা। ভাগ্যবতী মিখা! একটা চাপা গুঞ্জন হচ্ছিল বিধবা মিছিলের মধ্যে। মিখা তাহলে মেয়েটার নাম! সে ভাগ্যবতী কেন? এই লুণ্ঠনকে ভাগ্য কেন বলছে বিধবারা? শলোমন হাবিল-কাবিলকে অনুসরণ করলেন আড়াল থেকে। দেখলেন ওরা দু'টি মিখাকে সমুদ্র উপকূলের কিনারে নিয়ে এল। উপর্যুপরি দু'জনে মিলে ধর্ষণ করার পরিকল্পনা করেছে ছায়ারা। সেই ধর্ষিতার আর্তনাদ বিস্ময়কর রকম করুণ। এ কী দেখছেন সম্রাট? এঁরাই তাঁর ছায়া। তাঁর কামনাকে এরা এভাবে চরিতার্থ করে? কেন করবে না, এদের তো দাম্পত্য-জীবন নেই। এই মিখাকে তো সম্রাটই কামনা করেছিলেন।

শলোমন ধর্ষণের ক্ষুধার্ত চরম প্রহার সহ্য করতে না পেরে সমুদ্রকূল ধরে দ্রুত ছুটে চললেন ইফ্রার দিকে। তাঁর ছায়ারা তাঁকে মূক করে দিয়েছে। আশ্চর্য গ্লানি হচ্ছে শরীরে। হঠাৎ মনে হল আর্য-বিবাহের প্রস্তাব এর চেয়েও নিষ্ঠুর। মিখা এই অত্যাচার হয়তো চেয়েছে। ইলা চায় না।

রথের পথ রোধ করলেন শলোমন। বললেন— রথ ঘোরাও গালিয়াৎ। সারিন, ফিরে চলো। এ বিয়ে হবে না।

—কেন হুজুর! আমরা তো প্রায় পৌঁছে গিয়েছি। বলে উঠল সারিন।

সম্রাট বললেন— ভাগ্যিস এখনও পৌঁছওনি, তাহলে অন্যায় হত। উরিয় পবিত্র ছিলেন, আমার খাস সৈন্যরা অপবিত্র হয়েছে কেউ কেউ। আমি সেই অপবিত্রতার মাত্রা আর বাড়াতে চাই না। সারিন তুমি বুঝবে না আমার জীবন, তবু তোমরা ফিরে চল। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও গালিয়াৎ। তোমার মনের উপর আমি অনেক অত্যাচার করেছি।

সারিন অবাক হল। গালিয়াৎ কেঁদে ফেলল। মুখে আর কিছুই বলতে পারল না ওরা। ওরা ফিরে গেল। সমুদ্রকূলে ফিরে এলেন সম্রাট। রামাসিসকে উপকূলে ছেড়ে তাঁর শৌখিন ভাসমান ক্ষুদ্র জাহাজে ঢুকে পড়লেন। মাঝিদের নির্দেশ দিলেন আরও কিছুটা দক্ষিণে জাহাজকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। তারপর জাহাজ থেকে যখন সম্রাট নামলেন, তাঁকে আর চেনার উপায় নেই। একজন পুরোদস্তুর আব্রাহাম। নবিবেশ এবং একজন পশুতাড়ানো লোক। তিনি একা নন। তাঁর সঙ্গে আরও কিছু পশুপালক চেহারার লোক। আসলে এরা সমুদ্রের জলসৈন্য। জলসৈন্যরা আব্রাহামকে পিছনে দূর থেকে অনুসরণ করল।

আব্রাহাম উপকূলের একটি পরিত্যক্ত সৈন্য-আবাসে পৌঁছলেন। ওখানেই হাবিল-কাবিল তখনও মিখাকে ভোগ করছিল। এবং সম্রাট পৌঁছনোর ঠিক দু'দণ্ড আগে দুই ছায়ামূর্তি মিখার গলা টিপে দিয়েছিল। মিখা মরে গিয়েছিল। দুই ছায়ামূর্তি মৃত মিখাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়ার জন্য ভাঙা সৈন্য-আবাস থেকে বার করে আনল। আব্রাহামের চোখেরই সামনে মৃতদেহ ওরা সমুদ্রের জলে ফেলে দিল।

হাতের লাঠিটা আকাশে তুলে আব্রাহাম দুই ছায়ামূর্তিকে থামালেন। থামো হে!

—কে তুমি?

—আমি আব্রাহাম আদমপুত্র।

শিউরে উঠল দুই ছায়ামূর্তি। এ যে সারগনের গলা!

—হুজুর, পাপ করেছি আমরা। মিখাকে আমরা হারেমে পৌঁছে দিতাম। হল না। ও মরে গেল।

—তোমরা মেরে ফেলে দিলে ! এই জন্যেই কি আমি মরুভূমিতে প্রথম এই লাঠিটা পুঁতেছিলাম পুত্ররা ?

—শাস্তি দিন হুজুর আমাদের !

লাঠিটা আকাশে তুলে একটা দুর্বোধ্য আর্তনাদ করে উঠলেন আব্রাহাম। জলসৈন্যরা অসির ঘায়ে হাবিল-কাবিলের মস্তক ছিন্ন করে দিল। তারপর সেই ছিন্ন মাথা আর রক্তাক্ত ধড় সাগরের জলে ফেলে দিল। সেই দৃশ্য চেয়ে দেখলেন না আব্রাহাম। তিনি রামাসিসের পিঠে লাফিয়ে ওঠবা মাত্র শলোমন হয়ে গেলেন। সাদা অশ্ব সামনে ছুটল। একা মহা কান্নায় ভেঙে যেতে লাগল সম্রাটের হৃদয়।

সম্রাট চিৎকার করে বললেন, কা'কে বললেন কেউ জানে না, বললেন— প্রেম আর যুদ্ধের দেবীরা এইভাবে বিনষ্ট হয় প্রভু ! উরিয় অপবিত্র হয় ! আমার হৃদয় কিভাবে সত্য বলবে ! কিভাবে নির্মাণ করব আমার মন্দির ! কিভাবে ?

৫ ফিঙ্গা কোথায়

মরুভূমিতে হাবিল-কাবিলের মৃত্যুর পর নতুন হাবিল-কাবিল তৈরি হয়। শলোমনের সহচর ছায়ামূর্তি কখনও তাঁকে ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যায় না। সমুদ্রে নিহত যে দু'জন ভেসে গেছে, তারা যেমন হাবিল-কাবিল ছিল, শলোমনের পাশে এখন যারা দু'জন দণ্ডায়মান তারাও অনুরূপ হাবিল-কাবিল।

—তোমাকে পূর্ণমন্ত্রী করার কথা ছিল গালিয়াৎ ! হল না। কিন্তু তুমি আজ থেকে আমার অন্যতম ছায়া হয়ে থাকবে।

—আজ্ঞে, ছায়া !

—হ্যাঁ, কাবিল গালিয়াৎ ! তুমি আজ থেকে কাবিল। আর ওই হচ্ছে হাবিল, তোমার প্রতিরূপ ! অথবা তোমার অনুরূপ। তোমাকে পোশাক দেওয়া হচ্ছে, এই পোশাকই তোমার একমাত্র পরিচয়। তুমি কখনও এই পোশাক ছাড়া আমার সামনে আসবে না। তুমি আর গালিয়াৎ নও। তুমি কাবিল।

—আজ্ঞে আমি কাবিল গালিয়াৎ।

—এই পরিচয় তোমার নিজের কাছে রইল, পোশাকের আড়ালে, কিন্তু পোশাক ত্যাগ করলে, কখনও যদি কর, তাহলে ওই হাবিলই তোমাকে হত্যা করবে। কারণ শলোমনের ছায়া কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না। ছায়াকে প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা দিতে হয় পরম সততা ও চরম আনুগত্যের।

—আমার এই অভিষেক কেন মহানুভব ?

—কারণ, যারা এতদিন ছায়া হয়ে আমার সঙ্গে ছিল তারা, আর নেই।

—তাদের কী হয়েছে ?

—তাদের হত্যা করা হয়েছে।

—হত্যা ? কেন হুজুর ?

—কারণ তারা পূজারিনী আর্য-বিধবাকে বলাৎকার এবং খুন করেছে। আমি

আর্যদের বোঝাতে চাই, আমি তাদের ভালবাসি এবং বিশ্বাস করি। কারণ একজন গালিয়াৎ আমার দেহরক্ষী। তুমি বলেছ, তুমি তোমার মাংসের পরিচয় কী জানতে চাও না, তুমি কে তুমি জান না। মানুষের কাছে তোমার পরিচয় যাইই হোক, অন্তরে তুমি আমারই মতো একজন কেউ, অতএব তুমি আমার ছায়া।

শলোমন এবার হাবিলের দিকে চোখ ফেরালেন। বললেন—আজ থেকে হাবিল আর কাবিলের পোশাকের রঙ আলাদা হল। হাবিলের যোদ্ধৃবেশ হবে সব সময় সবুজ। কাবিল পরবে কালো। সবুজটা হবে ধূসর, কালোটা হবে নীলাভ কালো। হাবিল, তুমি কাবিলকে তৈরি করে দাও। বসন-কক্ষে নিয়ে যাও ওকে। আর যা যা পরীক্ষা করার করে নিও। শোনো, হাবিল ইশ্মায়েল, এই ফিঙ্গাটা আমার চেনা মনে হচ্ছে ! কোথায় পাওয়া গেল, আমি সেই জায়গাটাএকবার নিজে দেখতে চাই।

কাবিল গালিয়াৎ সম্রাটের হাতের ফিঙ্গাটার দিকে চাইল এবং শিউরে উঠল। এ তো ইব্রিয়ার ফিঙ্গা। সেই ফিঙ্গা, যা সম্রাট তার হাতে তুলে দিয়ে সংকেত-ছবি-বর্ণের পাঠোদ্ধার করতে বলেছিলেন। আজ শলোমন তাকে কিছুই শুধোলেন না। কাবিল গালিয়াতের মনে হল, তাকে সম্রাট এই মহা মরুভূমে একেবারেই অস্তিত্বহীন করে দিতে চান। বসন-কক্ষে এনে গালিয়াৎকে সম্পূর্ণ নগ্ন করা হল এবং তার কোমর-বন্ধনীতে আটকানো ফিঙ্গাটা নিয়ে নিল হাবিল ইশ্মায়েল।

হাবিল বলল—ছায়া যখন মাংসকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে তখনই সে প্রকৃত ছায়া কাবিল ! সম্রাটের মাংসকে রক্ষা করাই আমাদের কাজ। তুমি এই ফিঙ্গাটা রেখেছ কেন ?

—ওটা আমাদের থাকে হাবিল, ও কিছু না। তুমি কি ফিঙ্গাটা সম্রাটকে দেখাবে ?

—নিশ্চয়ই।

—কেন ?

—কারণ, এই ফিঙ্গা সম্রাটের কাছেই জমা থাকবে। তোমার মৃত্যুর সময় এই ফিঙ্গা তোমার কোমরে জড়িয়ে দেওয়া হবে। যেমন ধর, আমার কানের ইশ্মায়েলী স্বর্ণকুণ্ডল সম্রাটের কাছে জমা দিতে হয়েছে। মৃত্যু হলে আমার কানে পরিয়ে তবে আমাকে কবরে শোয়ানো হবে। জাতীয় ঐক্য বলে কিছু কি হয় ? হলে কেমন করে হবে আমরা জানি না, কেবল জানি জাতির চিহ্ন সম্রাটের কাছে সমর্পণ করে টিকে থাকতে হবে। বা তোমার মতো লুকিয়ে রাখতে হবে। তবু লুকিয়ে রেখে লাভ নেই, ওটি সম্রাটের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া ভাল। দ্যাখো, বোবা-উন্মাদটা পাহাড়তলির নীচের হালিস বস্তিতে লুকিয়ে রয়েছে নিশ্চয়ই। এলাকাটা হিত্তীয় কারিগরদের, সব কুমোর-কামার-ছুতার, বুঝলে, রঙের ব্যাপারিও আছে, খনিতে কাজ করে কেউ কেউ, তো এইজন্যে হালিস নাম বোধহয়।

—তুমি কোথাকার লোক ?

—গিলিয়দের।

—ফিঙ্গাটা হালিস বস্তিতে পেলে ? কোথায় ?

—পথের উপর। বালিতে অনেকটাই পুঁতে গিয়েছিল। কয়িনের বাড়ির সামনে।

—তুমি নতুনই এসেছ ?

—না, খুব নতুন নই। তবে দু'-চার বছর হল মাত্র। এসেছিলাম একজনকে খুঁজতে, হয়ে গেলাম শলোমনের ছায়া! সম্রাটের কাছে কিছুই গোপন করিনি। আমার উদ্দেশ্য বলেছি।

—কী উদ্দেশ্য?

—একজনকে খুঁজে বার করা।

—কে সে?

—একজন অসুর-সৈন্য। আসলে সৈন্যটা হিত্তীয়। জানো তো আসিরিয়ার অসুর-রাজারা এই হিত্তীয়দের উপর অত্যাচার কম করেনি। যারা ওখানে আছে, সবাই চেষ্টা করে পালিয়ে কেনানে চলে আসার। হিত্তীয়দের এই এক স্বভাব, ইফ্রোনকে অত্যন্ত ভালবাসে। কেউ কেউ পালিয়ে আসার জন্য অসুরদের সৈন্যবাহিনীতে ঢোকে। তারপর অশ্ব পেলেই পালায়। আমরা ইশ্মায়েলীয়রা অসুর-সৈন্যর একটা বড় অংশ, কিন্তু আমরা জানি ইশ্মায়েলই আমাদের প্রভু-আত্মা। অসুররা কেউ নয়।

—তুমি খুঁজতে এসে থেকে গেলে?

—কেন যাব না! আমরা ইশ্মায়েলীয়রা শলোমনকে ভালবাসি। তাঁকে আমরা শুধু রাজাই ভাবি না, নবি মনে করি।

—ওহ্!

—হ্যাঁ। আমি অসুরবাহিনীর একজন দামি সেনাপতি ছিলাম। আমার উপর অসুর রাজার নির্দেশ, আমি ওই পলাতক সৈন্যকে বধ করে ফিরে যাব। কিন্তু আমি 'ছিলাম' বলছি নিজেকে। আমি এখন ছায়ামাত্র। সম্রাটের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হয়েছে, বুঝলে!

—তোমাকে শলোমন বিশ্বাস করেছেন?

—কেন করবেন না, আমরা তো সত্য ছাড়া বলি না। এই জন্যেই অসুর সৈন্যবাহিনীতে আমাদের কদর বেশি। তোমাকে পরে আমি সমস্তই বুঝিয়ে বলব। এখন চল। এই পোশাকে তোমাকে সত্যিই সারগন শলোমন বলে মনে হচ্ছে। অবিকল সারগন। তুমি কে? বল, কাবিল। বারো বার উচ্চারণ কর, কাবিল, কাবিল! এই গ্রন্থে হাত রেখে শপথ নাও, তুমি শলোমনকে পিতামাতা অপেক্ষা ভালবাস।

—বাসি।

—হ্যাঁ, চল! আচ্ছা শোনো, কয়িনের আসল নামটা কী বলতে পার? ও নিশ্চয়ই একজন হিত্তীয়, আসলে কে লোকটা?

এ কথা শুনে অত্যন্ত ভয়ে পেয়ে গেল গালিয়াৎ কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। কেমন হতাশ হয়ে ভাবল, সে তো কয়িন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানে না।

ওরা দুই ছায়ামূর্তি যখন সম্রাটের সামনে এল তখন সম্রাট শলোমন দুজনকেই উদ্দেশ করে বললেন— মনে রেখো তোমাদের সঙ্গে সর্বক্ষণ আরও একশো ছায়ামূর্তি রয়েছে। এই একশোকে অনুসরণ করছে সহস্র ছায়ামূর্তি। এদের কেউ একজন যদি কোনও অপরাধ করে বসে, তারজন্য তোমরা দু'জন দায়ী এবং অপরাধী হতে বাধ্য। আমি কৈফিয়ত তোমাদের কাছেই চাইব। বিচার তোমাদেরই হবে। তোমরা দু'জনই সহস্রাধিপতি এবং আমার বিবেক।

বিবেক কথাটি সম্রাট এমন জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন যে, গালিয়াৎ কেঁপে গেল। এবং মনে হল বীর গালিয়াৎকে যেন সম্রাট দাউদ বিবেকের পরীক্ষায় জয়ী হতে বলছেন। বলছেন, একজন গালিয়াৎ কি শুধু যুদ্ধকৌশল বোঝে, হৃদয় বোঝে না?

হাবিল ইশ্মায়েল সম্রাটের হাতে গালিয়াতের ফিঙ্গাটা তুলে দিল নিঃশব্দে। সম্রাট সেটি হাতের মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন চাপা স্বরে— তুমি প্রতিহিংসা ত্যাগ কর কাবিল গালিয়াৎ! এ ফিঙ্গা আমার পূর্ব-পরিচিত। তুমি আদমপুত্র, তুমি স্বয়ং সুবিবেচনা, ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির সময় তোমাকে কোলে নিয়ে খেলা করেছেন। তুমি আমারই উত্তম প্রতিনিধি। শোনো আমি কে! হাবিল ইশ্মায়েল, কাবিলকে শোনাও আমি আসলে কে। আমার যে শলোমন-সংহিতা তার থেকে উদ্ধার কর আমার স্বীকারোক্তি।

হাবিল ইশ্মায়েল মন্দ্রস্বরে বলে উঠল— "আমি শলোমন, আমি স্বয়ং সুবিবেচনা, তাই আমিই পরম কৌশল, আমি চরম পরাক্রম। আমিই ধার্মিকের পথ নির্মাণ করেছি এবং বিচারের পথের মধ্য দিয়ে গমন করেছি।"

সম্রাট নিজের বুকের দিকে আপন আঙুল তুলে ইঙ্গিত করে বললেন— এই আমি, এই দাউদপুত্র শুলায়মন।

হাবিল আবার বলতে লাগল— "সদাপ্রভু নিজ পথের আরম্ভে আমাকেই পাইয়াছিলেন, অর্থাৎ ঈশ্বর যখন শুরু করেন, আমিই তখন আদি স্বরূপে ছিলাম, আমাকেই তিনি আদি রূপে গঠন করেন।"

হাবিলের উচ্চারণের মধ্যেই দেখা গেল দেওয়াল ভেদ করে একশত ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে এই নাতিবৃহৎ শৌলগৃহের দেওয়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এরা কারা? চমকে উঠল গালিয়াৎ। সে বুঝতে পারছিল, শৌলদুর্গ এক সুকঠিন শৃঙ্খল এবং সুদৃঢ় রাষ্ট্রনিবাস।

শলোমন আবার নিজের দিকে আঙুল দেখালেন— এই আমি হিত্তীয় বৎসেবার পুত্র শুলায়মন।

সঙ্গে সঙ্গে শতমূর্তি একস্বরে গলা মেলালো— এই আমরা শতপুত্র শুলায়মন।

হাবিল আবার বলতে শুরু করে— "জলধি যখন হয় নাই, তখন আমি জন্মিয়াছিলাম, যখন জলপূর্ণ উনুই (কূপ) সকল হয় নাই, তখন আমি হইয়াছি। পর্বত সকল স্থাপিত হইবার পূর্বে, উপপর্বত সকলের পূর্বে আমি জন্মিয়াছিলাম। তখন ঈশ্বর স্থল ও মাঠ নির্মাণ করেন নাই, জগতের ধূলির প্রথম অণুও গড়েন নাই; যখন তিনি আকাশমণ্ডল প্রস্তুত করেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম।"

শতমূর্তি একস্বরে বলিল— নিশ্চয় তুমি সেখানে ছিলে শুলায়মন।

হাবিল বলতে থাকে— "যখন ঈশ্বর জলধিপৃষ্ঠের চক্রাকার সীমা নিরূপণ করিলেন, যখন তিনি ঊর্ধ্বস্থ আকাশ দৃঢ়রূপে নির্মাণ করিলেন, যখন জলধি প্রবাহ সমূহ প্রবল হইল, যখন তিনি সমুদ্রের সীমা স্থির করিলেন, যেন জল তাহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করে, যখন তিনি পৃথিবীর মূল নিরূপণ করিলেন, তৎকালে আমি তাঁহার কাছে সক্রিয় ছিলাম, আমি তাঁহাকে আনন্দ দিতাম, তিনি আমা হইতে আনন্দ পাইতেন, তাঁহার সম্মুখে আমি নিত্য আহ্লাদ করিতাম...."

শতমূর্তি সমস্বরে বলিয়া উঠল— নিশ্চয় তুমি ইলোহের সম্মুখে ক্রীড়া করিতে শুলায়মন।

শুনতে শুনতে গালিয়াতের অঙ্গাদি শিথিল হয়ে গেল, অবশ হয়ে গেল তার মস্তিষ্ক, তার বোধ, তার চিন্তা, তার নিজের 'আমি', তার হৃদয়, তার দাগন, তার মা-বাবা-বোন কোথায় যেন মুছে গেল, সে কালো পোশাকে তলিয়ে গেল। সে নিজেকেই আর মনে করতে পারল না। সে হয়ে উঠল সারগন শলোমনের অবিকল এক ছায়া।

—তুমি কে মিন্দাপুত্র ? কোথায় তোমার গর্ভাশয় ?

—এই মরুভূমি পিতা শুলায়মন!

—তুমি কে ?

—আমি আদমপুত্র কাবিল, আমি পশুপালক যাযাবর, আমি আলিফ, আমি এল্, আমিই শুলায়মন, মহাপ্রভু! আমি ছায়ামূর্তি মাত্র। আমি কেউ নই।

আদম মরুভূমির শস্যাদি ক্ষেত্রবান দেখিলেন ; যব, জনার, গম, মসিনা, সরিষা দানা বাঁধিয়া ফলিয়াছে। দ্রাক্ষাক্ষেত্রগুলি সতেজ হইয়াছে। মরুভূমি কতকাংশে সবুজ হইয়া উঠিলে মানুষের আনন্দ হয়, কতক অংশ বিশেষ সবুজ হইলে অন্যান্য অংশেও সবুজের ছিটা ধরে, পাথুরে মাটি ফুঁড়িয়া ইফ্রোন উপত্যকায় হলুদ বেগুনি ফুলের সমারোহ হয়। দ্রাক্ষালতাগুলির কুঞ্জে কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জন করিয়া ফেরে। শলোমন মৌমাছির গায়ে সরিষার গন্ধ পাইয়া থাকেন।

আদম লিপিকারকে বলিলেন— ভাই তুমি আদিপুস্তক হইতে কিছু সারাংশ তুলিয়া বুঝাইয়া দাও মরুতে নিবাসিতা ইগার পুত্র ইশ্মায়েলকে লইয়া কোথায় বসতি গড়িলেন। স্থানটি আদিপুস্তক হইতেই বুদ্ধি করিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে। আব্রাহাম ইগারকে এবং পুত্র ইশ্মায়েলকে পূর্বদেশের দিকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। পূর্বদেশ বলিতে জোড়া নদীর অঞ্চলগুলি বুঝিবে। বিস্তারিত করিয়া ধরিলে তাইগ্রিস নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকা আসিরিয় অর্থাৎ অসুরদের দেশ বলিয়া গণ্য হইবে। অসুররা তাইগ্রিস নদী অর্থাৎ আদিপুস্তকের ফোরাত নদীকেও দখলে রাখিবে ধরিতে পার। পূর্বদেশে যাইবার পথে প্রথমে ফোরাত পড়িবে। ফোরাত পার হইলে গিলিয়দ পাহাড়।

গিলিয়দ পাহাড়কে ঘিরিয়া যে-অঞ্চল তাহার নাম আদিপুস্তকে মিদিয়ন। এবার সতর্ক হইয়া লক্ষ করিতে হইবে আদিপুস্তক মিদিয়নীয় বণিক বলিয়া এক জাতের বণিকের উল্লেখ করিতেছে, আবার মিদিয়নীয় বণিকদের চকিতে একস্থানে ইশ্মায়েলীয় বণিক বলিয়া ফেলিয়াছে। অতএব মিদিয়ন অঞ্চলে ফোরাতের তীরে ইশ্মায়েল বসতি গড়িল ইহা সুনিশ্চিত। সারা আদিপুস্তকে দেখা যাইতেছে, অভিশপ্তদের যখনই তাড়াইয়া দেওয়া হয়, তখন তাহারা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও একটি পাহাড়ে আশ্রয় লয়। পাহাড়টিকে ঘিরিয়া তাহাদের বসতি গড়িয়া উঠে। আমরা পূর্বেই লক্ষ করিয়াছি, অভিশপ্ত লোত যে নির্জন ক্ষুদ্র পাহাড়টির দখল লইয়া কন্যাগর্ভে মোয়াব ও অম্মোনের জন্ম দিলেন, তাহার নাম সোয়র অর্থাৎ ক্ষুদ্র। পাহাড়ের ক্ষুদ্রত্ব হইতে বুঝিবে, রাজা মোয়াব অথবা অম্মোন অতি ক্ষুদ্র রাজাই ছিলেন এবং তাঁহারা যর্দনের তলার দিকে পাহাড়ে থাকিতেন, সে স্থান কখনও বিশেষ শস্যশ্যামল ছিল না। তাঁহারা ক্ষুদ্র এবং হীনবল রাজা ছিলেন বুঝিয়াই মুশা প্রথমে ইঁহাদের আক্রমণ করিয়া পরাস্ত

করেন। সমুদ্রকূলের বলবান আর্য-অধ্যুষিত পথ মাড়ান নাই।

সে যাহাই হউক। ইশ্মায়েলের কথা, লোতের কথা বলিতে বলিতে আমরা ইদোমের কথাও কিছু বলিব। এই ইদোম বা এষৌ হইলেন ইস্রায়েল বা যাকোবের যমজ ভাই। ইহাকে ইস্রায়েল বঞ্চিত করেন এবং পিতার উত্তরাধিকার মায়ের ধূর্ত-সহায়তায় অধিকার করেন এবং ইদোমকে তাড়াইয়া দেন। এই ইদোম অভিশপ্ত হইয়া মোয়াবদের পাশাপাশি মরুঅঞ্চলে রাজত্ব গড়েন। ইদোমই প্রথম মানুষ, যিনি তিন জাতিতে তিনটি স্ত্রী করিয়াছিলেন। ইদোম এবং যাকোবের পিতাই হলেন সারিপুত্র ইসহাক। এই ইদোমের তিন স্ত্রী হইলেন যথাক্রমে হিত্তীয়, হিব্বীয় এবং ইশ্মায়েলীয়। ইশ্মায়েলের কন্যা বাসমতকে এষৌ বিবাহ করিয়াছিলেন —কিন্তু এইরূপ করিলেন কেন ?

উত্তরে বলা যায়, উপেক্ষিত, বিতাড়িত এবং অভিশপ্তরা এইরূপ করিবেই। এষৌ বা ইদোম তিন জাতিতে নিজেকে ছড়াইয়া দিলেন, তিন জাতিকে আপন করিলেন। আদিপুস্তকে যাকোবকে বা ইস্রায়েলকে সতর্ক করা হইল, তুমি আপন মাংস ছাড়া অন্যত্র বিবাহ করিবে না, ইস্রায়েল তাই মামা লাবনের কন্যাদের বিবাহ করিলেন। কিন্তু ইস্রায়েলী রাজারা রক্ত ও মাংসের এই শুদ্ধতা রক্ষা করেন নাই। স্বয়ং দাউদ তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। কিন্তু বলিতেই হইবে, বৎসেবার হিত্তীয় মাংসে প্রথম প্রবেশ করিয়াছেন এষৌ ওরফে ইদোম। এই ইদোমই ইশ্মায়েল মাংসে আপন জ্ঞাতিত্ব প্রকাশ করেন। এই এষৌর নাতিই অমালেক। অতএব দেখা যাইতেছে, ইশ্মায়েলীয়রা ইদোমকে লইয়াছে, ইস্রায়েলকেও প্রত্যাখ্যান করে নাই।

ইশ্মায়েলের এই ভূমিকাটি দেখিবার মতো। প্রকৃতপক্ষে মরুভূমিতে দুই ধরনের মানুষ থাকিত। এক শ্রেণী অভিশাপযুক্ত, অপর শ্রেণী আশীর্বাদযুক্ত। লালমরু আর কালোমরুর বিভাজন ইহমর্তে চিরকালই আছে। হিত্তীয় এবং ইশ্মায়েলীয়রা অভিশাপগ্রস্তদের গর্ভ দিয়াছে এবং আশীর্বাদধন্য আগ্রাসীদেরও গর্ভ দিয়াছে। অবশ্যই বলিতে হইবে, ইশ্মায়েলীয়রা ইস্রায়েলকে রাজা হইতে সাহায্য করিয়াছে চরম সংকটে অলৌকিকভাবে।

দু'টি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করি। ইস্রায়েল, পূর্বনাম যাকোব (ইসহাকপুত্র)। যাকোবের কনিষ্ঠপুত্র ইউসুফ ওরফে যোশেফ। এই যোশেফকে যাকোবের অন্য পুত্ররা ঈর্ষা করিত। মেষ চরাইতে গিয়া উহারা যোশেফকে এক কূপে ফেলিয়া দিয়া মারিতে চাহিল। এই ঘটনা অদ্ভুত যে, কূপে পড়িয়া গিয়াও যোশেফ মরিলেন না। ওই কূপ হইতে একদল পথবাহী মিদিয়নীয় বণিক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া মিসরে লইয়া গেল। এই বণিকরা ছিল ইশ্মায়েলীয়। আমরা ভাবিতেছিলাম, কূপে যোশেফ পড়িয়া গিয়াছেন, এবার তাঁহাকে কে উদ্ধার করিবে ? কূপের পার্শ্ববর্তী পথ ধরিয়া বণিকরা মিসরে ব্যবসা করিতে যাইতেছিল। এই বণিকরা মিদিয়ন হইতে আসিতেছিল, তাহারা ইশ্মায়েলের মাংস ছিল। মনে রাখিতে হইবে, যোশেফ না বাঁচিলে যাকোব তথা ইস্রায়েল বাঁচিত না, আদিপুস্তক হইত না।

ইহার পর দ্বিতীয় ঘটনা যে হইল তাহাও ইশ্মায়েলীয় মাংসে গাঁথা। কেননা মোশি বা মুশা মিসরে থাকাকালীন যুবা বয়সে রাস্তায় এক মিস্রীয় গাড়োয়ানকে খুন করিয়া বালিতে পুঁতিয়া ফেলেন। কেননা গাড়োয়ানটি এক ইস্রায়েলীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি

এবং ঝগড়া করিতেছিল এবং হাতাহাতি হইবার উপক্রম দেখিয়া মুশা উহাকে পুঁতিয়া দিলেন। এই খুনি মুশাই মিস্রীয় গাড়োয়ানকে মাটিতে পুঁতিয়া দিয়া কাবুসের ভয়ে মিসর ছাড়িয়া মিদিয়নে পলাইলেন। ইদোম যে ইশ্মায়েল-কন্যা বাসমতকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারই পরবর্তী মাংস ছিলেন রুয়েল। রুয়েলের সাত কন্যা ছিল, সিপ্পোরা সেই সাত কন্যার এক কন্যা। এই সফুরাকে বিবাহ করেন মোশি। এইখানে একটুখানি প্রেমের কিস্সা রহিয়াছে, সিপ্পোরা আর মোশির, তাহা আমরা লিখিব না। কিন্তু ইহাই বলিব, মুশা না বাঁচিলে এবং আশ্রয় না পাইলে আদিপুস্তক হইত না।

অতএব আমরা ইগারের মাংসকে কিরূপ দেখিতেছি? নির্বাসিতা নারীই আদিপুস্তকের নাটক সৃষ্টিকারিণী, কিন্তু তাঁহার কথা আদিপুস্তক কখনও স্পষ্ট করে নাই এবং চাপিয়া দিয়াছে। আদিপুস্তক ইশ্মায়েলকে গর্দভমনুষ্য বলিল এবং তাড়াইয়া দিল। বলিল, এই গর্দভমনুষ্য সকলের বিরুদ্ধে যাইবে। তাঁহার হাত সকলের বিরুদ্ধে খাড়া হইয়া উঠিবে, তাঁহার মাংস হইতে রাজা উৎপন্ন হইবে। তা হয়তো হইবে, ভবিষ্যৎ দেখিবে সেইরূপ হইয়াছে কিনা। কিন্তু শলোমনের যুগে কী হইল, আমরা বলিব।

শলোমন ইশ্মায়েলকে সর্বাপেক্ষা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ইগার তাঁহার মাংসকে কখনও আক্রমণ করিবে না। বরং বাঁচাইবে। ইগারের মাংস যোশেফকে প্রাণে বাঁচাইয়াছে এবং মুশাকে প্রেম দিয়াছে। আশ্চর্য লাগে, ইগার এবৌকে বিমুখ করে নাই এবং অমালেককে যখন অন্যায় রণে মুশা মারিলেন, গিলিয়দ পাহাড় একাকী ক্রন্দন করিয়াছে। হায় অমালেক, হায় অমালেক বলিয়া মাতন করিয়াছে ইশ্মায়েলের উটপূজক মনুষ্যরা।

মোয়াব এবং অম্মোনরা যতবার ধ্বংস হইয়াছে ইশ্মায়েল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। ইশ্মায়েল মরুভূমির সপ্তজাতিকে ঘৃণা করে নাই, কিন্তু তাহারা ধ্বংস হইলে চুপ করিয়া থাকিয়াছে। ইদোম ধ্বংস হইলে ইশ্মায়েল খুশি হইতে পারে নাই। শুধু অস্তিত্ব বাঁচাইবার জন্য অসুরদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আপাতত হাবিল ইশ্মায়েল শলোমনের ছায়া হইয়া গেল।

শলোমন হালিস বস্তির পথে এক স্থানে সাদা অশ্বের পিঠ থেকে নেমে পড়লেন। পথের পাশের এই কুটিরের মালিক কে, জানতেন না। এত খুঁটিয়ে জানা তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়। এখানেই পথের উপর বালিতে পোঁতা সেই অদ্ভুত সাংকেতিক ফিঙ্গাটা পাওয়া গিয়াছে। ওই কুটিরটাই কি তবে সন্দেহজনক? সেই বোবা-উন্মাদটা কোথায় গেল?

কুটিরের বাইরে একটি বিলাপী গাছ অজস্র সাদা ফুল ফুটিয়েছে। এটি আসলে মরু-শেফালিকা। এর ভেষজ গুণ কেউ তেমন জানে না। দিনের বেলা মরুতাপে এই গাছের ফুল নেতিয়ে পড়ে। কিছু ফুল হলুদ রঙের হতে পারে। সন্ধ্যায় এই গাছ সুস্থ হয়, তখন এর সুঘ্রাণ বাতাসে ছড়ায়। মরুজ্বরে এই গাছের পাতা পিষে মধুর সঙ্গে খাওয়ালে রোগী সুস্থ হয়, জ্বর ছেড়ে যায়। এই গাছটার গুণের কথা কুটিরের লোকেরা নিশ্চয়ই জানে না।

এখনও ভোর হয়নি আস্ত, বাতাসে হালকা সাদা আঁধার ছড়ানো, সঙ্গে শেফালির ঘ্রাণ। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সম্রাট। বাইরে একটি খুঁটায় বাঁধা বড়

স্ত্রী-ছাগল। দূরের একটি কুটির থেকে লাফাতে লাফাতে দু'টি ছাগশিশু স্ত্রী-ছাগলটির বাঁটের কাছে ছুটে এসে দুধ খেতে শুরু করল। দেখা গেল, একজন স্ত্রীলোক বাচ্চা দু'টির পিছুপিছু ছুটে এসেছে। দুধের বাঁট থেকে বাচ্চা দু'টিকে ছাড়িয়ে নিল বউটা এবং দ্রুত পায়ে নিজের বাড়ির দিকে চলে যেতে লাগল।

স্ত্রীলোকটি কতদূর যাচ্ছে? সম্রাট পিছু পিছু প্রায় দশ রশি পথ হেঁটে এসে বুঝলেন, ছাগশিশু দু'টি এই এতদূর থেকে তাদের মায়ের কাছে ছুটে গিয়েছিল। সম্রাট বউটিকে পিছন থেকে ডেকে উঠলেন— এই শোনো!

বউটি তার বাড়ির বেড়ার দুয়োরের কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল। আনাথ। ওকে দেখেই চিনতে পারলেন সম্রাট। আনাথও প্রত্যুষের সাদা ঘোর আলো-আঁধারে মাথা বাস্তবে সম্রাটকে চিনে ফেলল। তারপর অবাক হয়ে গেল। কয়িনের বাড়িটা হালিস বস্তির প্রান্তিক বাড়ি, অন্য কুটিরগুলির থেকে অনেকখানি দূরবর্তী এবং বিচ্ছিন্ন।

সম্রাট শুধোলেন— বাচ্চা দু'টিকে ওভাবে টেনে আনলে কেন?

—আমরা শুধু ছানা দু'টি খরিদ করেছি সারগন! দুধ তো কিনি নাই!

—না। এ হয় না। বাচ্চা দু'টিকে আমায় দাও, আমি খাইয়ে আনছি। ও-বাড়িতে আমি বলে যাব, ওরা যাতে আরও কিছুদিন বাচ্চাদের দুধটুকু দিতে আপত্তি না করে।

—ওরা মানবে না। এমন তো হয় না মরুভূমিতে।

—ওরা আপত্তি করলে, আমিই এসে খাইয়ে যাব। দাও, আমাকে দাও, আমিই কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি। কতদিন এদের খেতে দিতে হবে, আমি বিচার করে ওদের বলে যাব। আশা করি ওরা আপত্তি করবে না।

সম্রাট আনাথের কোল থেকে ছাগশিশুদের নিলেন। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে যেন উড়ে গেলেন। দুধ খাইয়ে নিয়ে ফিরে এলে সূর্যের আলো দিগন্তে খেলে উঠল আভাসে। আনাথের কুটিরের ঝাঁপের বেড়ার মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। বাচ্চা দু'টির কশ দুধের ফেনায় ছলছল করছে।

সম্রাট হঠাৎ শুনতে পেলেন, ভেতরে কোনও মানবশিশু টি টি করে কাঁদছে। কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য রুগ্নতা প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখলেন, শিশুর মাথার কাছে বসে রয়েছে সেই অর্ধনগ্ন বোবা-উন্মাদটা। ওকে দেখেই সম্রাট দুই ধাপে ছায়ার মতো বাইরে বেরিয়ে এসে গলার স্বর তুলে ডাকলেন আনাথের নাম ধরে।

আনাথ বেরিয়ে এলে ছাগশিশু দু'টিকে তার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন— এই মরুমর্তে নিয়ম হচ্ছে, কোনও শিশুর মুখের দুধ কেনাবেচা হবে না, তাদের প্রাপ্য তাদেরই দিতে হবে। ছাগশিশু কিনেছ, দুধ খরিদ কর নাই, এ-যুক্তি ব্যবসায়ীর, তোমার মতো মায়ের নয়। কে কাঁদে?

—আমার বাচ্চা, মহানুভব।

—আমি একবার দেখতে পারি?

—না, না। আপনি কেন? একজন বাউর-হেকিম ওকে দেখছে, জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে ঠিক।

—আমি দেখলে ক্ষতি কী? দ্যাখ, আমার একপান ওষুধই তোমার শিশুর পক্ষে যথেষ্ট। খল নল আছে তো? জ্বর যদি আরও বেড়ে যায়, ওই বাউর-টাউর পানিপড়া

দিয়ে বাঁচাতে পারবে না। মন্ত্রে মানুষ বাঁচে না আনাথ, যন্ত্রে বাঁচে। খলটা হল যন্ত্র, তাতে পিষতে হবে গাছের পাতা। তুমি কি আমার চিকিৎসায় আস্থা রাখো না?

—তামাম মরুভূমি রাখে রাজচক্রবর্তী। কিন্তু ... আচ্ছা আমি আসছি, আপনি এখানেই একটু অনুগ্রহ করে দাঁড়াবেন?

—বুঝেছি, শোনো। আমার সঙ্গে এসো। গাছটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, খলে পাতা মেড়ে মধু দিয়ে তুমিই নিজে হাতে বাচ্চাকে খাইয়ে দেবে। সারল কিনা আমি জেনে যাব এক ফাঁকে এসে। তাই না? এসো।

সম্রাট চলে গেলে বিলাপী গাছটার কাছে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আনাথ। তারপর একমুঠো পাতা ছিঁড়ে নিল। উষার আলো লেগেছে সংসারের সর্বত্র। কোথাও মরু-দোয়েল শিস দিচ্ছিল আর দূরে সম্রাটের সাদা অশ্ব উধাও হয়ে যাচ্ছিল। আনাথ ভাবছিল, ওই মানুষটাই কি ঘাতক দাউদের পুত্র আর উনিই কি মহাজ্ঞানী শলোমন! তাই যদি না হবেন, তা হলে সামান্য এবং অতি তুচ্ছ ছাগশিশুকে এভাবে কোলে করে দুধ খাওয়াবেন কেন? এই মরুতে শিশুর মুখের দুধ ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য নয়, এ কথা উনিই বলতে পারেন! তাঁরই অনুভূতি এত স্বচ্ছ! তবু কী আশ্চর্য, এই সম্রাটের সবচেয়ে বড় শত্রু তারই কোলের শিশু! ভেবে আনাথ কেমন শিউরে উঠল।

কিন্তু নবিবাক্য তো ভুল হয় না। ইব্রিয়া কি স্বপ্নদর্শী নয়? কয়িন যে বলে, ইব্রিয়া পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত নবি। এই নবিকে ঘিরে মানুষের মাতলামি দিন দিন বেড়েই চলেছে। রাত বাড়লে আনাথদের ছোট উঠোন ভরে যায় নানা জাতির লোকে। তারা ইব্রিয়ার উত্তেজনা আর বক্তৃতা শুনতে আসে। আনাথের শিশু বিলালকে রঙ-গন্ধ মাখিয়ে বসানো হয় একটি তক্তিঅলা বেদীর উপর, ফুলপাতা দিয়ে পুজো করা হয়, গম্ভীর একটা ঢাক বাজে মাঝে মাঝে। দু' দিন থেকে এই ঢাক বাজানো হচ্ছে। একদিন একটি ছায়ামূর্তি হঠাৎ এসে উঠোনে ঢুকে বলে গেছে—ঢাক বাজিও না ইব্রিয়া, শান্তভাবে শিশুপূজা কর। কিন্তু বক্তৃতা করো না। শলোমনের সহস্র-চক্ষু তোমাকে দেখছে।

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠেছিল আনাথ। এ যে দাদা গালিয়াতের গলা। বাইরে শতমূর্তি বাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে। এই ঘটনায় ইব্রিয়া আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে তীব্র ঘৃণা আর চরম তাচ্ছিল্যে বলে উঠল—তোমাকে আমরা চিনতে পে-পে-পেরেছি দেহরক্ষী! তুমি তো মরুভূমির কুকুর। জাতির কলঙ্ক!

—তুমি চুপ কর ইব্রিয়া। এত উত্তেজিত হও কেন? আমাকে চেনবার দরকার নেই তোমার!

—কেন?

—সম্রাট বলেন, আত্মসংকেতের সমষ্টি হল মানুষ, সেই সংকেত শুদ্ধ হৃদয় থেকে আসবে। যে সংকেত এই শিশুকে ঘিরে তুমি পেয়েছ, তা সত্য হতে যত সময় দরকার, তার আগেই শলোমনের মন্দির আকাশে মাথা তুলবে। তুমি এই প্রতিজ্ঞা ত্যাগ কর!

—না। তুমি জানো না কিছু। এই শিশুপূজা দিয়ে আমরা নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করেছি, আমরা আত্মত্যাগের জন্য তৈরি হয়েছি। অন্তর্গর্ভ সমস্ত মরুকূপ জেগে উঠবে,

হ্যাঁ, জে-জে-জেগে উঠবে। আ-আ-আমি এই শিশুর মতোই পবিত্র। তুমি কে হে?

—আমি হাবিল ইশ্মায়েল।

—কুত্তা! কিন্তু গলাটা চেনা মনে হয়!

—আমি কাবিল গালিয়াৎ! আমরা হাবিল-কাবিল, কে কী জানি না! দ্যাখ, এই তো আমরা। বলে ছায়ামূর্তি অন্য আর একটি ছায়াকে আহ্বান করল। তারপর সম্পূর্ণ কণ্ঠস্বর বদলে ফেলে বলল—আমিই শলোমন, ইব্রিয়া। কণ্ঠস্বর দেখে চেনার চেষ্টা করো না। ঢাক বন্ধ কর! বন্ধ কর ঢাক। তুরীভেরী কিছুই বাজাবে না। আমি মনে করি, আমার বধ্য প্রাণীটা এখানেই থাকে। অবশ্য তাকে আমি আশ্বস্তও করতে পারি। আমি খুঁজছি তাকে! চলো, কাবিল! চল! ওহো, তুমিই তো হাবিল হে! তাই না?

শেষে ছায়ামূর্তির কণ্ঠ আরও অন্য রকম হয়ে গেল। তখনই শোনা গেল, বাইরে তীব্র ছায়াস্বর রাত্রির আকাশকে মথিত করে দিচ্ছে। যেন ভয়ঙ্কর ত্রাস এসে কয়িনের বাড়িটাকে ঘিরে ধরেছে।

সেই ত্রাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল গালিয়াৎ। সে একটি কথাও বলেনি। বলতে পারছিল না। সবার অলক্ষ্যে তালগোলবাঁধা পাকানো একটি রুমাল ঘরের ভিতর দিকে কয়িনের কোলের কাছে ছুঁড়ে দিল গালিয়াৎ। তাতে একটি পাথরে সে লিখে দিয়েছিল, অসুর-সেনাপতি খুঁজছে। ভাগ্নের অসহায় শিশুমুখে চেয়ে তার প্রবল কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। কেবল বুঝতে পারছিল, হাবিল ইশ্মায়েল উগ্রভাবে শলোমনকে ভালবাসে। সম্রাটের জন্য প্রাণ দেওয়াটাও তুচ্ছ ব্যাপার। এদিকে একাই সে গালিয়াৎ এবং সারগনের গলা নকল করে ইব্রিয়াকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। আনাথ দাদাকে স্পর্শ করবার জন্য ছুটে এসেছিল ইশ্মায়েলের কাছে, কিন্তু কণ্ঠস্বর বদলে যাওয়ায় ভয়ে কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, বুঝল এ ছায়া দাদার ছায়া নয়। দেখা গেল, কয়িন পাকানো রুমালটা তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আনাথ হঠাৎ শব্দ করে অত্যন্ত নিঃসহায় ভঙ্গিতে ডুকরে কেঁদে উঠল এবং বেদীর কাছে ছুটে গিয়ে পূজিত আপন শিশুকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে রে রে করে উঠল ইব্রিয়া। বলল—ওকে ছেড়ে দে মা, অমন করে ধরতে নেই। উনি মোদের মরুভূমির দেবতা।

এই মরুদেবতাকে সম্রাটের নির্দেশিত বিলাপী পাতার রস সেবন করালো আনাথ। ইব্রিয়াকে বলল না, কী সে খাওয়াচ্ছে এবং কার নির্দেশে। নইলে ইব্রিয়া এ ওষুধ কিছুতেই খাওয়াতে দেবে না। ইব্রিয়া নিজেকে সুচিকিৎসক মনে করে। তার নাকি অজস্র স্বপ্নাদ্য জানা আছে। কিন্তু কিছুতেই শিশুর জ্বর নামছিল না।

—ছেলেকে তুই কী খাওয়ালি মা আনাথ! অমনটি করে না, যা তা খাওয়াতে নেই। দ্যাখ, এ শিশু তো শুধু একলা তোমার নয়, এ শিশু সকল অপমানিত জাতির। তুমি কি বিশ্বাস কর না?

দুই চোখ বেয়ে নিঃশব্দে জল গড়িয়ে পড়ছিল আনাথের। আর্যদের সঙ্গে কিভাবে কে জানে, সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে ইব্রিয়া। এই উঠোনেই মধ্যরাতে রাজা বিবলিস এবং রাজা ইষানুল এসেছিল পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতে। কয়িন ইষানুলকে ডেকে এনেছিল। উরিয় এবং সিমন—দুজনই দাউদের হাতে বধ হয়েছে, এই অপমানজনক মৃত্যুই বিবলিস আর ইষানুলের সাময়িক ঐক্যের কারণ। ইব্রিয়া বলছিল, অম্মোন,

অমালেক, ইদোম, এদেরও একত্রিত করবে। অমালেকীরা অনেকটাই রাজি হয়েছে। মোয়াববাও এসেছিল, তারা ইস্রায়েলীয় মন্দির প্রতিষ্ঠা চায় না। তারা বলছিল, মোশি এই কেনানে একজন অনুপ্রবেশকারী এবং চরম স্বাতন্ত্র্যবাদী এবং শঠ। অম্মোনের যাবতীয় কষ্টের জন্য দাঊদই চরম দায়ী। অম্মোনরা কথা না বলে ইব্রিয়ার কথা চুপচাপ শুনে গেল। এই অনুষ্ঠানে নাথনপন্থীরাও শ্রোতা ও সমর্থকরূপে উপস্থিত ছিল।

গত রাতেই ইব্রিয়া বলছিল—আজ রাত্রের সমবেত সকল জাতির কাছে আমার আবেদন শোনাবে অনেকটাই যিবুষীয় জাতির কান্নার মতো। যিবুষ অর্থ জিরুজালেম, প্রত্যেকেই আ-আ-আপনারা জানেন। জি-জি-জিরুজালেমের মাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে তারা, এই জাতি যিবুষীয়। এদের তরফ থেকেই আমি কথা বলছি বন্ধুগণ। যিবুষীয়রা কখনও মাটি ছাড়বে না। এদেরকেই শলোমন উৎখাত করতে চাইছেন তাদের স্বক্ষেত্র থেকে। এটা অ-অ-অন্যায়। জমি অধিগ্রহণ করবেন সারগন। যিবুষীরা দেবে না। কেন দেবে ? কো-কো-কোথায় যাবে তারা ?

—থাকবে। বলে উঠল ইষানুল।

—হ্যাঁ, থাকবে বইকি! বলে উঠল বিবলিস। তারপর বলল—আর্যদের ঘরে ঘরে বিধবা এবং পঙ্গু মানুষের সংখ্যা বাড়বে জানি। এ কথা জেনেও আমরা যিবুষীয়দের পাশে দাঁড়াব আর যা করতে হবে তাইই করব। কথা দিচ্ছি। এই শিশুর জয় হোক মহাত্মা ইব্রিয়া। এই শিশুই আর্য আর হিত্তীয়কে একই মাংসে বেঁধেছে, জয় হোক! মহান ইষানুল নিশ্চয়ই জানেন, আমরা হিত্তীয় সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধাই করি।

এই ভাবে অনেক শলা, কত অঙ্গীকার এবং কথা দেওয়া নেওয়া হল। আনাথের মনে হচ্ছিল, তার শিশু বিলালই সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এই শিশুই শলোমনের পতন ঘটাবে। শলোমন কিছুতেই মরুভূমির জিরুজালেমে মন্দির নির্মাণ করতে পারবেন না।

ইব্রিয়া বলে উঠল—যুদ্ধের রক্তমাখা হাত কখনও মন্দির নির্মাণ করতে পারে না। পবিত্র উরিয়কে যে-রাজা হত্যা করে এবং উরিয়-পত্নীকে ধর্ষণ করে সেই মহাপাপী সম্রাট কখনও ইলোহের মন্দির নির্মাণ করতে পারে না। আমরা চেষ্টা করব নবান্নের রাতে যখন ইস্রায়েলীরা ঈশ্বর-সিন্দুক কাঁধে করে নাচগানা করবে, ধাঙড়া নাচবে এবং মরিয়মপন্থী হিজড়েরা আর রূপাজীবারা নাচবে-গাইবে তখন ওই সিন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার। নিহত সিমন-রাজের মাংস আর্যরাই পারে এই কাজ করতে। বলুন বিবলিস, আপনি প্রস্তুত ?

আনাথের ভয় করছিল, নবান্নের রাতে সত্যিই কী হবে তা হলে! রাজা বিবলিস কি ইস্রায়েলীদের ঈশ্বরীয় নিয়ম-সিন্দুক কেড়ে নিতে পারবে ? সিন্দুককে ঘিরে যে নাচগান হয়, তা যে মস্ত রাজকীয় ব্যাপার! ওই উৎসব সপ্তজাতির লোকেরা চেয়ে চেয়েই দেখে না, অনেকেই নাচেগানে অংশও নেয়। ওই উৎসব দেখতে দেখতে মনে হয়, এই নাচগানের আড়ালে কতই না রক্ত ঝরেছে, লোকক্ষয় হয়েছে। এ যে রঙের উৎসব, কিন্তু আসলে শোণিত-উৎসব, রক্তের খেলা মাত্র।

বাদ্যি-বাজে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। রক্তও উষ্ণ হয়ে ওঠে। মরিয়মপন্থীরা গেয়ে ওঠে :

হে সদাপ্রভু, দেবগণের মধ্যে তুমিই কামাল কিয়া, তুমিই অতুলন
তুমিই পবিত্র গান, তুমিই পবিত্রতম গান, হে মহত্তম, হে মহান!
মহাশুচি মহাপ্রাণবান, তুমিই মরূদ্যান প্রভু, তুমি যে আকাশনিধি, তারিফ-সম্মান,
তুমি বিস্ময়-মোশির ক্রিয়াকারী, তুমি কোজাগর, যখনই বাড়ালে ডান হাত করিলে বিস্তার
গ্রাসে গেল সকল শত্রু, মরু-চরাচর, সকলি হইল ফানা ফানা
জাতিগণ হইল কম্পমান, ভূধর কাঁপিল, কাঁপিল ফিলিস্টান, মেঘে ম্লান হল আর্য-বিবস্বান
সকলি হইল নানাখানা—হে সুমহান!

দুপুরের আগেই বিলালের জ্বর কমতে শুরু করল। মরু-শেফালিকার রসে যেন জাদু ছিল। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। শিশু হেসে উঠল। পাগলের মতো বিলালকে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে তুলল আনাথ। আর তখনই হঠাৎ সম্রাটকে মনে পড়ে গেল। দুটি ছাগশিশুকে কোলে করে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন আব্রাহাম। কী নিষ্পাপ সারগনের মুখখানি, কী কোমল আর প্রসন্ন, চোখ দুটি কী গভীর! ছাগশিশুর কশে লাগা দুধের মতোই যেন তিনি পবিত্র! ছাগশিশুর জন্যও যাঁর বুকে কষ্ট বেজে ওঠে, তিনি আসলে কেমন! ছাগশিশুকে দুধ খাওয়ানোটা তাঁর কোনও ছলনা নয় তো ?

রাত্রি গভীর হয়েছিল। কয়িন বাড়িতে নেই। সেই রুমালের পাথর দেখে সে ইফার বাজারে গেছে। ফেরেনি। গরিব মানুষ তারা, কী করে যে সংসারটা চলে! এ দিকে ইব্রিয়া এসে কাঁধে পড়ায় কী ঘটনাই না ঘটে চলেছে! আনাথ ভাবতে পারেনি তার কোলের শিশুই হবে ইব্রিয়ার লক্ষ্য। এই বিলালই কি তা হলে মরু-দেবতা ?

'তুমিই পবিত্র গান, তুমিই পবিত্রতম গান, হে মহত্তম, হে মহান!' তাইই কি ? শিশুর মুখের দিকে চেয়ে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে আনাথ। ফের কানে ভাসে মরিয়ম-সঙ্গীত। 'মহাশুচি মহাপ্রাণবান, তুমিই মরূদ্যান প্রভু, তুমি যে আকাশনিধি, তারিফ-সম্মান!' এ যেন শিশু ইশ্মায়েল!

কিন্তু ডান হাত বিস্তার করেছিল কে ? সদাপ্রভু তো নয়, উনি যে মোশি! আর ওইভাবে ডান হাত বিস্তার করলে সেনাপতি জশুয়া চরম বল পায় এবং এষৌর নাতি অমালেককে প্রায় কাবু করে ফেলে! যখনই মোশি ডান হাত খানা নামিয়ে নেন, তখনই জশুয়াকে কাবু করে ফেলে অমালেক। পরে মোশি ডান হাতে সাদা কবুতর দেখিয়ে অপ্রস্তুত করেছিলেন অমালেককে এবং ওই অবস্থায় জশুয়া অমালেকের মুণ্ড উড়িয়ে দেয়।

তা হলে এইই বুঝি বিজয়-সঙ্গীত! জাতিহত্যার উল্লাস-গান! হায় মরিয়ম, দাদাদের বিজয়গাঁথা কত মিথ্যায় ভরেছিলে তুমি! ফিলিস্টাইন আর্যদের বিবস্বান (সূর্য) তো মেঘে ঢাকা পড়েছিল আকাশে মেঘ ছিল বলে! এই মিথ্যা ভাষার অলঙ্কার কেন মরিয়ম ? আর্য কিন্তু মোটেই কম্পিত হয়নি। মোশির ক্রিয়াকারী ঈশ্বর মরিয়মের জিহ্বায় মিথ্যাও দিয়েছিলেন গাইবার জন্য।

তুমি তারপর কী গাইলে মরিয়ম ?
সকলি হইল নানাখানা—হে মহান!

ইদোমের দলপতি হইল বিহুল—
মোয়োবের মেড়ারা করিল শোরগোল,
কেনানীরা গলিয়া গেল, গান গাহে মরিয়ম বাজাইয়া ঢোল
প্রভু দিব্যমান
মরিয়ম কহে গাঁথা শোনে পূণ্যবান।

কে শোনে এই জাতিহিংসার নিষ্ঠুর বিষণ্ণ-সঙ্গীত ? মোয়াবরা মেড়া, ইদোমরা বোকা, অম্মোনরা অপরাধী, ইশ্মায়েল নির্বাসিত—এই গানে কিসের মাদকতা। এই কি নবান্ন-গীত ?

ভাবনায় ছেদ পড়ল আনাথের। বাইরে একটি তীব্র হ্রেষা উচ্চকিত হয়ে থেমে গেল। হঠাৎ আনাথ লক্ষ করল কুটিরের ভিতরের ঘরে দ্রাক্ষারস সঞ্চিত করার গর্তে বসে থাকা ইব্রিয়া নেই। ওই গর্তেই ইব্রিয়াকে লুকিয়ে থাকতে হত এতদিন ; ওই গর্তেই হাত পা গুটিয়ে শুয়ে থাকতে হত। গর্তের উপরে চাপা দেওয়া থাকত নলখাগড়ার দড়ির চালি। ইদানীং ওর অনেক সাহস বেড়েছে, অনেকটাই প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে সে।

অবাক হওয়ার মতো ঘটনা এই যে, শত ছায়া-সারগন এই হালিস বস্তি ঘিরে থাকলেও কখনও ইব্রিয়াকে আক্রমণ করেনি। সবই কি তা হলে সম্রাটের নির্দেশ। কিন্তু লোকটা গেল কোথায় ? বাইরের ঘোড়ার ডাকটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কারণ ছায়ামূর্তিরা তো রাতেও ঘুরে বেড়ায়।

তবু ছেলেকে কোলে করে বাইরে বেরিয়ে এল আনাথ। আজ রাতে উঠোনে পূজা-সমাবেশ হয়নি। বাইরে বেরিয়েই চমকে উঠল আনাথ গালিয়াৎ। ঘোড়া থেকে নেমে এক ছায়ামূর্তি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—কী চায় ?

—আমি তোর দাদা আনাথ।

—বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস কর, আমি গালিয়াৎ। দেখিস, বিলালের যেন কোনও ক্ষতি না হয়। কয়িনকে সাবধানে রাখিস।

—তোমার সম্রাট না থাকলে আমার খোকা বাঁচত না হাবিল ইশ্মায়েল।

—না, না, আমি ইশ্মায়েল নই আনাথ। আমি সিমনের ছেলে, মিন্দার খোকা, তুই আমার যমজ সহোদরা।

—তুমি যেই হও, ছায়া বই তো নও।

—হায় দাগোন, এ আমি কী করলাম।

—তুমি চলে যাও ইশ্মায়েল। কেউ তোমাকে চেনে না।

—ইব্রিয়া আমার বধ্য আনাথ।

—তাই বল। নিশ্চয় তোমাকে দেখেই ইব্রিয়া চলে গেছে।

—আমি খুন কেন করিনি।

—ওহ, তাই ? তোমাকে এই জন্য কুত্তা বলে ডাকেন মহামতি ইব্রিয়া।

—আমি গালিয়াৎ রে আনাথ। আমাকে লক্ষ করছে অন্য ছায়ামূর্তি। তুই আমাকে কি ঘৃণা করিস আনাথ ? আমার মুখ পোশাকে শক্ত করে আঁটা, আমি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি, মুখোস খুলে দেখাতে পারি না, আমি কে ?

—কান্নায় এখানে কেউ ভোলেন না ছায়ামূর্তি। তুমি যদি সত্যিই বীর গালিয়াৎ হতে, আগে ফিঙ্গা দেখিয়ে বলতে, আমি তোর দাদা। কই, ফিঙ্গাটা দেখি খেতা গালিয়াৎ। দেখাও। মুখের বাঁধন খোলার তো দরকার নেই। দেখাও না, কোমরের ফিঙ্গাটা।

—নেই। ও আমি...কী করে বোঝাই...আমি যে আজ...আমি কী হয়ে গেছি আনাথ।

—শোনো, ওই দিকে, ইব্রিয়া কোথায় গেল ? আমি জানি না। যাও যাও, বিরক্ত করো না। আমি অসহায় আনাথ, তোমার সম্রাট অনেক করেছেন আমাদের জন্য। সম্রাট হয়ে...যাও, যাও...তোমার সারগন নিশ্চয়ই শিশুর মতো সুন্দর। তুমি ওই ইস্রায়েলী রাজচক্রবর্তীর জন্য অবশ্যই গর্ব করতে পার।

—আমি গালিয়াৎ, সুন্দরী বোনটি। আমি যে পোশাক খুলে দেখাতে পারছি না তোকে। হাবিল একজন হরবোলা অভিনেতা এবং শলোমনের আত্মা, ও সব একাকার করে দিয়েছে। আমি সিওল (যমালয়)-এ ঘুরে বেড়াচ্ছি খুকু। মা কেমন আছে ? কয়িন কোথায় ? ওরে, কয়িন কোথায়।

—ফিঙ্গাটা দেখাও না ইশ্মায়েল।

এবার আর কোনও কথা বলল না ছায়ামূর্তি। ঘোড়াটার রাশ ধরে টেনে ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগল। আকাশে কাবুসের খাস প্রহরীর মতো শুভ্র চাঁদ টহল দিচ্ছিল। দিগন্তে মদির শুভ্রতা চোখের জলের মতো কাঁপছে। ওই দিকে চলে যাচ্ছে লোকটা।

কে ও ? সত্যিই কি দাদা ? কেন তাকে বিশ্বাস করল না আনাথ। এই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত, মারী-মড়ক-দুর্ভিক্ষের মরুতে বোন কি ভাইকে বিশ্বাস করতে পারে ? কোনও জাতি কি কোনও জাতিকে বিশ্বাস করে ?

কোলে ছেলে-ধরা আনাথের চোখ দুটি ভরে আসছিল অশ্রুতে। এই জ্যোৎস্নায় তার মন সত্যিই কেমন করছিল। এত বিষণ্ণ সে নিজেকে কখনও দেখেনি। জন্মের আগেই তারা ভাইবোন পিতৃহীন হয়েছে। বাবা ছিলেন, আস্কিলনের রাজা। তারা শুধু এইটুকুই জানে, রাজকন্যা বা রাজপুত্রের সুখ কাকে বলে তারা তা জানে না। জন্মের পর তাদের কোমরে কেবলই জড়ানো হয় আর্য-ফিঙ্গা। রাজত্ব খোয়ানো আর্যরা এখনও বিশ্বাস করে আবার তারা মরুতে রাজত্ব করবে। দাদার তো কপালের মধ্যভাগ সিরসির করে।

কী কপাল। আজ সে শলোমনের ছায়া হয়ে গেল। শুধু ছায়া। যে দাউদ আর্যদের কেবলমাত্র পরাস্ত করেছে কিন্তু নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি, আজ কি শলোমন সেই অপূর্ণ রাজ-আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ করতে চান ? তাঁর জ্ঞান কি এতই বিদ্বেষপরায়ণ, এতই বক্র ?

ইলোহের শাস্ত্র তো সকল জাতিকেই নিশ্চিহ্ন করতে বলেছে। আর্যরা তো সেই সপ্তজাতির মধ্যে পড়ে না। এমনকি তারা শলোমনের জ্ঞাতিমাংসও নয়। কেনানে আর্যরা ইস্রায়েলদের সবচেয়ে বড় শত্রু, এদের সঙ্গে যুদ্ধে কখনও কখনও সন্ধি হলেও শত্রুতার কোনও নিরসন হয়নি।

দাদা আজকের মরুভূমির কুকুর হয়ে গেল। কোনও আর্য আজ আর তাকে বিশ্বাস করবে না। হতভাগ্য সিমনপুত্র কি সেনাপতি উরিয়র চেয়ে হতভাগ্য নয়? কী আশ্চর্য! যুদ্ধ শেষ হল, অথচ যুদ্ধ শেষ হল না। ইব্রিয়া চায় বিভাজিত, অপমানিত, ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত মানুষের সমর্থন। ব্যথা কে পায়নি এই মরুভূমির বুকে? বিবলিসের কন্যাদের ব্যথা কী করে সহ্য করবে মরুমর্ত?

ইব্রিয়া নবি হতে চায়। তার কী দুর্মর আকাঙ্ক্ষা! রাজতন্ত্র একটা ভুল, মিথ্যা, মরীচিকা। দিব্যতন্ত্রই মানুষের আত্মার শেষ সত্য বলে। তাই কি বলে না। মরুভূমি কি শেষ অবধি স্বপ্নক্ষেত্র নয়? ঈশ্বর কি মানুষকে মরীচিকার জলের মতো ডাকেন না বারবার? আয় অব্রাম, আয়! এই সমস্ত মরু-ভূমণ্ডল, ওই মরীচিকা-লিপ্ত দিগ্বলয়, ওই লক্ষ-মধুপ-গুঞ্জিত দ্রাক্ষাকুঞ্জ, ওই উষ্ণ-শীতল উনুইসকল, ওই উষ্ট্রবাহিনী, ওই অশ্বেতর শ্রেণী, ওই পশু-বাথান, ওই দুগ্ধমধু প্রস্রবণ, ওই স্বর্ণবিভাযুক্ত উপত্যকা, ওই মহাদেবদার, রাজবৃক্ষ জলপাই, ওই সুমহান জিতবৃক্ষ, ওই লিবনি, লুস, অর্মোনি, এলা, সমূহ সরস বৃক্ষরাজি, ওই জউ, হোগলা, হিজল, ওই নল, ওই যব, গম, মসিনা, সরিষা, সবই তোমার জন্য শোভিত আব্রাহাম!

ওই ইন্দ্রধনু-পোশাক তোমারই জন্য যাকোব (ইস্রায়েল)। তুমি তাড়া খেয়ে ফিরেছ। লাবন তোমার মামা, তোমাকে তাড়া করে এসেছিল ফোরাতের তীর পর্যন্ত, গিলিয়দ পাহাড় অবধি, তারপর যব্বোক নদীতীরে পৌঁছলে তুমি। এই যব্বোক-তীরে তোমার সঙ্গে ঈশ্বরের মল্লযুদ্ধ হল। ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলে বলেই তো তুমি ইস্রায়েল, তুমি বিজেতা। মল্লযুদ্ধে তোমার উরু ভেঙে যায়। তবু তুমি থামলে না, সকল জাতির উরু ভেঙে রক্তপান করলে তুমি। ধিক দাউদ! ধিক রাজতন্ত্র। রাজার পিপাসাই মরুভূমিকে শুষ্ক করেছে।

ভাবতে ভাবতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল আনাথ। দিগন্ত থেকে ফিরে এল সেই ছায়ামূর্তি। কাছে এসে বলল—তোমার ছেলে কেমন আছে আনাথ?

আনাথ ফুঁপিয়ে উঠে ব্যাকুল আর প্রায় অবরুদ্ধ গলায় আর্ত চিৎকারে বলে উঠল—আমার দাদাকে মুক্তি দিন সম্রাট! আমার স্বামীকে বাঁচান প্রভু, আমার শিশুকে রক্ষা করুন! আপনার অনুগ্রহ প্রতিটি বালুকণায় ছড়ানো, আপনার জ্ঞান সূর্যের আলোর চেয়ে প্রকাশিত, আপনার সৌন্দর্য দেবদূতের চেয়ে উজ্জ্বল। ইব্রিয়াকে ক্ষমা করে দিন।

—পরমায়ুর চেয়ে বড় আসক্তি কিসে আনাথ? আমি কি বাঁচতে চাইব না? তুমি ইব্রিয়াকে চলে যেতে বল।

—ও, যাবে না হুজুর! আপনি আমার শিশুকে দেখে বলুন, এ কি সত্যিই দেবতা? বলুন, এ কি আপনারই প্রতিদ্বন্দ্বী!

—আমার ডান হাত স্বপ্নে অঙ্গারে পুড়ে গেছে রাজকন্যা! আমি আজও এর কোনও অর্থ করতে পারিনি। তুমি ঘরে যাও!

—আমি রাজকন্যা?

—তুমি আর্যরক্ত দুর্লভ রমণী সিমন-কন্যা। তুমি অলৌকিক-সুন্দর। তুমি সুদ্রাক্ষা-চঞ্চল পেয়ালা! তুমি সম্রাট দাউদের বীণাতন্ত্রীর চেয়ে বিষণ্ণ-সুন্দর। তুমি মরিয়মের গানের চেয়ে উদ্দীপক।

—না, এ ভুল! এ মিথ্যা! এ স্তুতি অতি ভয়ঙ্কর, আমি এর যোগ্য নই! আমাকে ক্ষমা করুন মহামতি সম্রাট!

—তুমি ঘরে যাও আর্য-বালিকা! আমি তোমার অপরূপ কৌমুদী-সুষমাকে তারিফ করি। নতজানু হই রাজকন্যা! যাও, দাঁড়িয়ে থেকো না। বলে সম্রাট পথের উপর বালিতে হাঁটু পেতে দুটি হাত জড়ো করে কপালে ঠেকালেন।

—এ পাপ, নিশ্চয়ই পাপ, সারগন!

—আমাকে রক্ষা কর আনাথ! বলে শলোমন দু হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন। তারপর চোখ থেকে হাত সরিয়ে দেখলেন, আনাথের কান্না বাড়ির ভেতরে চলে গেছে! ধীরে ধীরে নতজানু ভঙ্গিমা থেকে উঠে দাঁড়ালেন সম্রাট। লক্ষ করলেন চারদিকে শত ছায়ামূর্তি জ্যোৎস্নায় কালো চিহ্নের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে।

কালো শামের পিঠে করে ধীরে ধীরে অনেকটা পথ চলে এসেছিলেন সম্রাট। এখন পিছনে ফিরে চাইতেও তাঁর ভয় করছিল। এতক্ষণ মরু-সরণিতে কী করলেন তিনি? কাকে কী বললেন এতক্ষণ। তিনি নতজানু হলেন কেন? তিনি কি প্রেম চাইলেন আনাথের কাছে? কেন এমন হল? এত কালের যুদ্ধের অবশেষ, প্রেমের অবশেষ কি তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে? বৎসেবা যে ভালবাসা দাউদকে দেননি, তাইই কি তিনি আনাথের কাছে এতক্ষণ প্রার্থনা করলেন?

হঠাৎ শামকে মোচড় মেরে ঘোরালেন শলোমন। দ্রুত ছুটে এলেন আনাথের সামনে। তীব্র স্বচ্ছ জ্যোৎস্নালোকে আনাথের মুখ এ বার একেবারে শুকিয়ে গেল। সে ভয়ে আর্তনাদ করে বলল—তোমার অনেক আছে মহানুভব! অনেক পশুধন, অনেক অস্ত্র, কত রথ, কত ঐশ্বর্য! কত নারী, কত মহিষী! এত বড় সাম্রাজ্য তোমার!

—আমি কেউ নয় আনাথ! আমাকে ক্ষমা করে দাও!

—কী চাও তুমি? কেন চাও? কেন এভাবে আবার ছুটে এলে?

—আমি জানি না। আমাকে ক্ষমা করে দাও সিমনকন্যা আনাথ! প্রেম আর যুদ্ধের দেবী, আমাকে ক্ষমা করে দাও! আমি ঘাতক নই!

—তুমি ছলনাকারী জ্ঞানী শুলায়মন, আমার পুত্রকে ঈর্ষা কর বুঝি? আমার স্বামীকে খাবে বুঝি তুমি? তোমার তো অনেক আছে। কেন এসেছ? যাও, চলে যাও! ইব্রিয়া, তোমার ফিঙ্গা কোথায় ইব্রিয়া! আমাকে বাঁচাও!

বলতে বলতে মাটিতে লুটিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল আনাথ গালিয়াৎ। তার অজ্ঞান দেহের পাশে উঠোনে চাঁদের আলোয় মুখে আঙুল পুরে চুষছিল শান্ত শিশুটি। চাঁদ যেন নেমে এসেছিল শিশুর মুখের উপর। তারারা ঝুঁকে নেমেছিল শিশুর মুখ দেখবার জন্য।

সম্রাট ভয়ে চোরের মতো বাইরে বেরিয়ে এসে শামের পিঠে চড়ে বসলেন। তাঁর মনে হল, সমস্ত বুকটা তৃষ্ণায় খটখট করছে।

তখনই ঢুকে এল সেই রহস্যময় ছায়ামূর্তি। অশ্বের পিঠ থেকে নেমে কোষ থেকে তরবারি মুক্ত করল। চৈতন্যহীনা আনাথের শিশুকে হাতে ধরে শূন্যে তুলে অসির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে উঠোনে ফেলে দিল। ঘুমন্ত শিশু আর্তনাদ করারও সময় পেল না। ঈষৎ শব্দ হল ছাগশিশুকে কোপ দিয়ে কাটার মতো, চ্যাঁ করল কিছুটা,

প্রতিবেশীরা কিছু শুনলও না। চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করে উঠল বাতাস। তরবারিখানা মাটিতে গেঁথে খাড়া হয়ে ঝিলমিল করে দুলতে থাকল। ইহাই কি আলিফ-এল-আলফা ?

নিরর্থক একদঙ্গল ডাক-হরিণের আর্তনাদে ভরিয়া উঠিল মরুভূমির আকাশ। রক্তাম্বরী ঋণ্ডিকা তারা জ্বলিতে থাকিল। ডুলি ভাসিয়া গেল। আগুনের উট ভাসিতে থাকিল, মরুঝড় বহিল মৃদু গতিতে এবং শলোমনকে একটি ঘূর্ণি ঘিরিয়া ধরিয়া অন্ধ করিয়া দিল। ইতিহাস তাঁহার দুই চক্ষুতে বালি নিক্ষেপ করিল।

৬. আনাথের ছায়া সরে যায়

শিশুর রক্তমাখা তরবারি তখনও উঠোনের মাটিতে পোঁতা। সেটি দুলে দুলে কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেছে কখন! একবার মাত্র সচিৎকারে জেগে উঠে আবার জ্ঞান হারিয়েছিল আনাথ। তার দ্বিখণ্ডিত শিশুকে সে চিনতে পারেনি।

ইব্রিয়া কোথা থেকে ভোর রাতের দিকে ফিরে এসেছিল। সম্ভবত সে তার কোনও প্রণয়ী কিশোরের কাছে গিয়ে থাকবে। ফিরে এসে দেখল, শিশুকে শলোমন তাঁর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য ইলোহের কাছে উৎসর্গ করে বেদীর উপর রেখে গেছেন। উঠোনে পড়ে রয়েছে আনাথ। সমস্ত রাত্রির মরুঝড় ধীরে ধীরে বয়ে গেছে তার দেহের উপর দিয়ে। সে বেঁচে রয়েছে মাত্র। চোখ তুলে তার শিশুকে চেয়েও দেখছে না একবার!

ইব্রিয়া তার কাঁধের নবিমার্কা বড় ফোতাটা মাটিতে পাতল। তারপর দ্বিখণ্ডিত শিশুকে তুলে নিল তার উপর। তারপর রওনা দিল নিরুদ্দেশ মরুপথ ধরে একাকী। তার মনে হল, আনাথ শুয়ে আছে থাক। ওকে ভাল করে না জাগানোই ভাল। এই মরুভূমি আর বোধহয় আনাথের ভার সইতে পারছে না।

পথ চলতে চলতে আশ্চর্য লাগল, কোথাও একটি ছায়ামূর্তি চোখে পড়ছে না। সব কোথায় উধাও হয়ে গেছে। শিশুকে উৎসর্গ করার পর নিশ্চয়ই সম্রাট নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে রয়েছেন কোনও মহিষীর সঙ্গে। বিবলিসের করা অপমান এবং প্রত্যাখ্যান এইভাবে পুষিয়ে নিল দাউদের ছেলে! কী ভাগ্য আমার, কয়িনের সঙ্গে আমি রাজকন্যা আনাথের বিয়ে দিয়েছিলাম! ফল লাভ হয়েছিল, কিন্তু সেই ফল আমি রক্ষা করতে পারলাম না। তবে নিশ্চয়ই আমি শিশুর এই মৃত্যুকেও মহিমান্বিত করব। নিশ্চয়ই করব। আমি ছাড়ব না!

ইব্রিয়া উষার আলোর সামনে দাঁড়াবে বলে একটি উচ্চ টিলার উপর উঠল। এখানে ধাতু-ফলকে লেখা, 'আব্রাহাম শিশু বলিদান নিষিদ্ধ করেছেন, এখানে শিশুদের পরীক্ষা করা হয় না।'

মিথ্যে কথা। বলে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল ইব্রিয়া। সেই চিৎকারে আভাসিত উষা কেঁপে উঠল। ইব্রিয়া বলল, বলিদান আসলে আত্মবলিদান, সে কখনও বন্ধ হবে না আব্রাহাম! আমি খণ্ডিত, ছিন্ন শিশুকে কাঁধে করে বইছি, এ আমারই অংশ। আমিই আনাথের গর্ভে একে সদাপ্রভুর আশীর্বাদে উৎপন্ন করেছিলাম। উৎপন্ন করিয়েছিলাম আমি।

একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে টিলার উপর থেকে সম্মুখে চাইল ইব্রিয়া। দেখল, একদল নাঙা ফকির জিরুজালেমের দিকে চলেছে। দৌড়ে সে দিকে ছুটে গিয়ে শরীরের পোশাক ফেলে দিয়ে নবি ইব্রিয়া দলে ভিড়ে গেল এবং এগিয়ে চলল; তার কাঁধে ঝুলছে লাঠিবাঁধা শিশুর মৃতদেহ।

এ দিকে কুটিরের খুঁটি ধরে চুপচাপ বসে রইল আনাথ। তার পলক পড়তে চায় না, চোখ আশ্চর্য রকম বিস্ফারিত। তার কোনও কিছু প্রকাশের ক্ষমতাও নেই। সে ভেবে পাচ্ছিল না, কেন সে কথা বলতে পারছে না। তাহলে বাস্তবিকই বোবা হয়ে গেছে। কী রকম দুঃস্বপ্ন এই জীবনটা! কী সব হল যেন। বোঝাই গেল না কিছু। মায়ের অমতে পালিয়ে এসে সে বিয়ে করল কয়িনকে। সেই কয়িন কোথায়? ইফার বাজারে মাল বেচতে গেল আর তো ফিরল না।

কখনও জানাও হল না ইব্রিয়ার সঙ্গে কয়িনের যোগাযোগ কী করে ঘটেছিল! কয়িন ইব্রিয়াকে বিশ্বাস করেছিল অন্ধের মতো। কী আশ্চর্য দ্যাখ, তার শিশু শলোমনের দয়ায় কোথায় উধায় হয়ে গেল! কে তার শিশুকে কোথায় নিয়ে চলে গেল! আনাথ এখনও বিশ্বাস করে না, তার শিশু এই মরুভূমির কোথাওই নেই। কোথাও লুকিয়ে রয়েছে, হামা টেনে চলে গেছে বিলাল।

শলোমন নিশ্চয়ই বলতে পারবেন তার খোকা কোথায় রয়েছে। তিনিই তো খোকাকে ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়েছিলেন! সারগনের শিশুপ্রেম জগদ্বিখ্যাত! তিনি সারিনের শিশুকে রক্ষা করেছিলেন।

কয়িন যখন ফিরল না প্রতিবেশীদের একজন ভয়ে ভয়ে বলল—ও আর ফিরবে না আনাথ। একা কী করে থাকবে।

আনাথ কোনও উত্তর না দিয়ে নির্বাক বসে রইল। একটু বাদেই দেখা গেল শত ছায়া-সারগন কয়িনের কুটিরটাকে অত্যন্ত সতর্কভাবে পরিবেষ্টন করে ফেলল। সকাল থেকেই এই ব্যবস্থা হল। প্রতিবেশীরা যাতে আনাথকে অযথা উত্যক্ত না করে সেই দিকে কঠোর দৃষ্টি দেওয়া হল। মাঝে মাঝেই প্রতিবেশীদের ভিড় ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখন। আনাথ ঠিক কিছুই বুঝতে পারছিল না। কয়িন কেন ফিরবে না, তা-ও সে ভাবতে পারছিল না। তার মধ্যে শুধু একটা ভয় আর বিস্ময় জমাট বেঁধে গিয়েছিল। ইব্রিয়া কোথায় গেল, তা-ও সে বুঝতে পারছিল না।

সারিন জোর করে আনাথকে খাওয়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। সারিন কোনও প্রতিবেশীকে কথা বলতে দিচ্ছিল না। আনাথ যখন জানে না, তার শিশুকে হত্যা করা হয়েছে, তখন তাকে বলার দরকার নেই। তরবারিখানা এখনও মাটিতেই পোঁতা। ওর পাতে রক্ত শুকিয়ে গেছে। মাটিতে পড়ে থাকা রক্তও কালো হয়ে গেছে। প্রতিবেশীরা বুঝতে পারছে না, বিলালের আসলে কী হয়েছে! সন্দেহ কারও মনে উর্বর হয়ে উঠলেও ভয়ে তারা কিছু প্রকাশ করছে না। তরবারিখানাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা আঁতকে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।

সারিন আনাথের কাছে তিন দিন তিন রাত্রি পার করে দিল। মাঝে মাঝে হঠাৎ করে আনাথ সারিনের গলা জড়িয়ে ধরে বোবার মতন ডুকরে উঠল। বোবারই মতন কথা বলে উঠতে পারল না। কয়িন তবু ফিরল না। তখন লিবাননের আট বেহারার বৃহৎ শিবিকা এসে ভিড়ল কয়িনের কুটিরের সামনে।

আনাথ এল শৌলদুর্গের অমরাবতী-কক্ষে। তরবারিখানা শিবিকার মাথার উপর বসিয়ে বয়ে আনা হল।

সবুজ এবং কালো পোশাকের ছায়ামূর্তি এসে আনাথের সম্মুখে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আর্তনাদ করে মূর্ছা গেল আনাথ। আনাথ তার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরকে ভয় পাচ্ছিল। তার দৃষ্টি কিছুতেই স্বাভাবিক হচ্ছিল না। সে নিজেকেই চিনতে পারছিল না। মাঝে মাঝে মাটিতে পোঁতা তরোয়ালের ছায়া কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল তার মনের মধ্যে। মনের ছায়াটি তীব্র আলোকময়, বজ্রের ঝলকানির মতো। মন থেকে সেই ঝলক যেন তার চোখে এসে লাগছিল। তখন সে হাত তুলে সেই বজ্রালোককে আড়াল করতে চাইছিল। আর সে কোথাও যেন ইগারের মতো লুকিয়ে পড়তে চাইছিল।

লিবাননের খাটের সুশুভ্র বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল আনাথকে। শৌলগৃহের প্রধানকক্ষের পার্শ্ববর্তী এটি সম্রাটের বিশেষ বিশ্রাম-কক্ষ। এখানে কারোরই প্রবেশাধিকার নেই। এই প্রথম সারিন এবং ছায়ামূর্তি দুটি এ ঘরে ঢুকেছে। এই ঘরের গা দিয়ে একটি বহতা জলাধার বসানো, এখানে স্নানাগারে জল প্রবেশ করছে। অদ্ভুতভাবে সুশীতল মিষ্ট বায়ু খেলে বেড়াচ্ছে। দুধে মরু-গোলাপের পাপড়ি ফেলে আর সুগন্ধি-নির্যাস মেশানো জল দিয়ে আনাথাকে স্নান করাতে বলে সম্রাট প্রধান কক্ষে চলে গেলেন। বিশ্রাম-কক্ষে ঢুকে মহাধিপতি একদণ্ডের বেশি দাঁড়ালেন না। ছায়ামূর্তি দুটি সম্রাটকে অনুসরণ করল। চলে যাওয়ার আগে শলোমন বললেন—এই পাথরের বাটিতে পান্থপাদপের রস রয়েছে সারিন। এই খেয়ে মরুভূমিতে চল্লিশ বছর বেঁচে ছিল আমার পূর্বপুরুষ মোশির লোকরা, তারপর ওরা কেনানে ঢুকতে পেরেছিল। পান্থপাদপের রস প্রাণদায়ী এবং উত্তম। আনাথকে খাইয়ে দিও। এই রসের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মেশানো আছে। আনাথের ঘুম দরকার।

সম্রাট বাটিটা সারিনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে এলেন প্রধান-কক্ষে। এবং ছায়ামূর্তিদের প্রথমেই বলে উঠলেন—শিশুহত্যা কে করল এখনও উদ্ধার করা গেল না। তা হলে তোমাদেরই মধ্যে কেউ অর্থাৎ হাবিল অথবা কাবিল এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, ধরে নিতে পারি।

শিশুহত্যার অসি সম্রাটের পায়ের কাছে মেঝেতে শোয়ানো। সম্রাট সে দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চাপা আর্তনাদ করে উঠলেন—হায় ইলোহে। এ কী দেখছি আমি। এ যে আমারই তরবারি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে উঠল সবুজ ছায়ামূর্তি।

—তুমিও বলছ, এ আমারই। দুই শত চার চক্ষু এই তরবারি দেখেছে প্রত্যহ, প্রধান-কক্ষের দেওয়ালে ঝুলে রয়েছে।

সবুজ ছায়ামূর্তি বলে উঠল—দুই শত পাঁচ চক্ষু আজ্ঞে।

—কী। বলে চমকে উঠলেন সম্রাট। বললেন—পাঁচ কেন? আমি তো এক চক্ষু নই হাবিল।

—না, মহানৃপতি। এ কৃপাণে আপনার চোখ পড়ে নাই, ও কেবলই ঝুলে থাকত।

—ঠিক বলেছ, আমি এই সুদীর্ঘ কৃপাণে চেয়েও দেখতাম না। আমি এর ব্যবহার

জানতাম না হাবিল-কাবিল। তবু তোমরা বলছ দুই শত পাঁচ? ওই এক চক্ষু কে আদম-পুত্র? আমি নই, আমি হতে পারি না। শিশুহত্যার দ্বারা আমি আমার হৃদয়কে ছিন্ন করতে পারি না।

কালো ছায়া বলে উঠল—আপনার হৃদয় লৌহরথ অপেক্ষা দৃঢ় আর তেজস্বী সম্রাট। কৃপাণ তাতে প্রবেশ করতে পারে না।

—কী বলছ তুমি কাবিল গালিয়াৎ।

—আমি গালিয়াৎ নই মহামান্য। আমার আজ কোনও পরিচয় নেই। আমি ছায়া, আমার হৃদয় নেই, করুণা নেই, মমতা নেই, আমি কারও সন্তান নই, কারও সহোদর নই মহাশিশু শুলায়মন।

—তা হলে তুমিই ঘাতক কাবিল।

—আমি আদর্শ মহাপিতা, আমিই অঙ্গীকার। আমার কষ্ট নেই, শোক নেই। আমিই ইব্রিয়াকে দিয়ে আমার আত্মজকে খুন করিয়েছি। আমি ওই অসির ব্যবহারকারী, আমাকে শাস্তি দিন প্রভু। আমাকে মুক্তি দিন জ্ঞানী শুলায়মন।

—আদর্শ নিজেই শৃঙ্খল কাবিল। মন্দির নির্মাণের পর নিশ্চয়ই তুমি মুক্তি পাবে। কিন্তু তুমি তা হলে ঘাতক নও। হাবিল, তা হলে বল...বল, হাবিল ইশ্মায়েল, ওই একচক্ষু কে? মনে রেখো, আমার সমস্ত ভার তোমাদেরই বহন করতে হবে। ছায়ার অন্তরেই আমি আমার নিষ্ঠুর হৃদয়কে লুকিয়ে রেখেছি।

—আমিই ঘাতক মহাত্মা শুলায়মন। বলে আর্তনাদ করে উঠল কাবিল গালিয়াৎ। তারপর বলল—সীনয় পাহাড়ের অগ্নিসংকেতকারী মোশির ঈশ্বর একচক্ষু ছিলেন।

এ কথা শুনে সম্রাটের হৃদয় কেঁপে উঠল। শৌলগৃহের দেওয়ালে ঝুলন্ত কৃপাণকে ইলোহে নিরীক্ষণ করেছেন প্রতি মুহূর্তে। ঈশ্বরের একমাত্র অগ্নিময় তৃতীয় নেত্র ছাড়া কিছুই থাকে না। মল্লযুদ্ধের পরাস্ত ঈশ্বর নিশ্চয়ই একচক্ষু। একচক্ষু দ্বারাই জগৎকে তিনি বিভক্ত করেছেন।

সম্রাট লক্ষ করলেন, কাবিলের কথা মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করে হাবিল চুপ করে রয়েছে।

—তুমি কিছু বললে না হাবিল ইশ্মায়েল?

হাবিল বলল— পরিণামদর্শিতাই আপনার তত্ত্ব, বিবেচনাই আপনার ঈশ্বর, জ্ঞানই আপনার তৃতীয় চক্ষু মহামতি। আপনিই বলুন, আমাদের কী করতে হবে। ইব্রিয়াকে হত্যা না করে আপনি ভুল করেছেন।

কাবিল গালিয়াৎ প্রায় আর্তনাদ করে বলল— ইব্রিয়া আমারই বধ্য ছিল, কিন্তু কেন বধ করিনি বলতে পারব না।

—কেন করনি? বলে তীব্র প্রশ্ন করল হাবিল ইশ্মায়েল। তারপর বলল— জোড়া পাহাড়ে আমিই তোমার হাতে কশা তুলে দিয়েছিলাম। সম্রাট ওখানে পৌঁছনোর আগেই তুমি বোবা-উন্মাদটাকে মরণ-গহ্বরে ফেলে দিতে পারতে। কেন দাওনি?

—একজন নবিকে আমি হত্যা করতে পারি না হাবিল।

—নবি?

—হয়তো তাই।

—বাজে কথা।

—কাউকে এভাবে তুচ্ছ করার আগে একবার অন্তত ভেবে দেখা উচিত মহাকৃতজ্ঞ ইশ্মায়েল।

'মহাকৃতজ্ঞ' কথাটি হাবিল ইশ্মায়েলকে মুহূর্তে বিদীর্ণ করে দেয়। ইগারপুত্র ইশ্মায়েলের অতীত ঘটনা, লিঙ্গাগ্রত্বক ছিন্ন হওয়া এবং মা-ছেলের অপমানিত নির্বাসন সত্ত্বেও ইস্রায়েলদের প্রতি অপরিমেয় দুর্বলতাকে ওই বিশেষ শব্দটি মনে করিয়ে দেয়।

—তোমাকে সঠিক সম্বোধনই করেছে ইব্রিয়া! বলে উঠল গালিয়াৎ তার নিজেরই কথার রেশ ধরে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে হাবিল তার কোমরে ঝোলানো অসি খাপ থেকে টেনে নিয়ে চিৎকার করে উঠল—কী বললে, আমি কুকুর! বলেই সে কাবিলের গালের উপর সেই অসি চালিয়ে দিল।

শলোমন শিউরে উঠে বললেন—এ কী!

দেখা গেল, মুখোস-আঁটা গাল অসির ঘায়ে চিরে কেটে চর্বি আর রক্ত-দৃশ্য হয়ে উঠল। গালে নিজের হাত চেপে ধরে গম্ভীর চাপা বিষণ্ণ-ব্যথিত সুরে কাবিল গালিয়াৎ বলে উঠল—হাবিলই হন্তারক, একশো বার। আমি বলছি, আনাথের শিশুকে এই ছায়ামূর্তিই শেষ করে দিয়েছে! কারণ, কয়িনকে হত্যা করার জন্যই এ আজ সম্রাটের ছায়া হয়ে মরুভূমিতে ঘুরছে।

বলেই কাবিল গালিয়াৎ দেওয়ালের ফাঁক গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—আজ আমার ছায়ারাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, হায় ইলোহে! দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন শলোমন।

গালিয়াৎ হঠাৎ আবার বেরিয়ে এসে বলল—আমি জানি, আমি কেউ নই। আমাকে হত্যা করার আগে ভেবে দেখো ইশ্মায়েল, এর আগে দু'টি ছায়ামূর্তি মরুমর্তে হারাম হয়ে গেছে। তুমি ইগারপুত্র, অভিশপ্ত তুমি। আব্রাহাম যাকে নির্বাসন দেন, কোনও সম্রাট কি পারেন না তাকেই চিরতরে মুছে দিতে!

বলতে বলতে গালিয়াতের দুই ভুরুর মধ্যস্থল সিরসির করে উঠল। এবং অবাক হল সে, এখনও তার অস্তিত্ব মরে যায়নি। কেবল তার পরিচ্ছদ রক্তে ভিজে যাচ্ছে। শলোমন ছুটে এসে কাবিলকে ধরে ফেলে জোর করে টেনে আনলেন খাটের উপর। শুইয়ে দিলেন। এবং দ্রুত হাতে চিকিৎসা শুরু করলেন। কাবিল গালিয়াতের মুখের পরিচ্ছদ খুলে দিয়ে দেখলেন, আনাথের মুখটাই পুরুষরূপ ধরে শুয়ে রয়েছে। সব কাজ ফেলে শলোমন বসে রইলেন গালিয়াতের শিয়রে।

দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে গেল। রাত্রি নামল মরুভূমিতে। রাত্রি গভীর হয়েছিল। হঠাৎ চর্বির আলোজ্বলা মশালটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শলোমন চমকে উঠলেন। খাটের কাছে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে আনাথ। চোখের পাতায় বিস্ময় আর সুচফোটা ব্যথা। দাদাকে দেখছে আনাথ। একটি কথাও কিন্তু বলছে না। গালিয়াতের চক্ষু মুদ্রিত এবং সে নিদ্রা অভিভূত, ফলে আর্য বোনের আসা টের পেল না। বোন ফিরে গেল।

তখনই সম্রাটের মনে হল—আমিই শিশুবধ করেছি। আমার দু'হাত রক্তে মেখেছি আমি। কিন্তু তারপর?

সমস্ত রাত্রি শৌলসিংহাসনে বসে শলোমন চেয়ে রইলেন ঘুমন্ত কাবিলের মুখে।

ভোর হলে আচমকা শৌল-সিংহাসন থেকে শলোমন উঠে দাঁড়ালেন। কাউকে কিছু বললেন না। তখনও কাবিল গালিয়াৎ ঘুমিয়ে রইল। সম্রাট নিঃশব্দে শৌলদুর্গ ত্যাগ করলেন। ইফ্রোন উপত্যকার মকপেলা গুহার সামনে এসে নতজানু হয়ে কী যেন প্রার্থনা করলেন কিছুক্ষণ। আব্রাহাম আর সারির সমাধিতে সাদা মরুপদ্ম উৎসর্গ করে দিলেন। দেখা গেল, তাঁর দু'টি চোখ জলে ভিজে উঠেছে।

কৃষ্ণঅশ্ব শামসের পিঠে চড়ে নীচে নামতে লাগলেন। জলসত্রের কাছে এসে সারিনকে দেখতে পেলেন সম্রাট। বললেন—আনাথ কেমন আছে সারিন?

—এখনও কথা বলছে না হুজুর!

—তুমি কখন নীচে নামলে?

—ভোর রাতে মহানুভব। এখনই একবার উপরে যাব।

—ঠিক আছে।

বলেই শলোমন শামসকে হাঁকিয়ে দিলেন সম্মুখে। অশ্বের গতি ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। মানচিত্রের দক্ষিণে তলার দিকে ছুটে চলল সূর্য-অশ্ব শামস। সম্রাট একা! কোনও ছায়ামূর্তি আপাতত তাঁকে অনুসরণ করছে না। তিনি একাই চলে এলেন সমুদ্রকূলবর্তী রঙের বাজার ইফাতে। প্রত্যেকটি দোকান সতর্ক দৃষ্টিতে দেখতে থাকলেন। হঠাৎ করে কোনও দোকানের সামনে নেমে পড়ে দোকানদারকে প্রশ্ন করলেন—ব্যাপারি কয়িন এখানে কোথায় ছাউনি ফেলে মাল বেচত বলতে পার?

—কে আপনি?

—আমি শলোমনের সৈনিক, দেখতে পাও না!

—আমরা কি আর চোখে দেখতে পাই রাজা, জ্ঞানী শুলায়মন যা দেখান তাই দেখি। এই যে কয়িনের বাচ্চাটা উৎসর্গ হয়ে গেল, দিব্যতন্ত্রী রাজা যা ভাল মনে করলেন তাইই হল। আবার বুঝি শিশু বলি চালু হল, এরপর রাজা চাইলে শয়ে শয়ে শিশু বলি, পশু বলি হবে, ঘটনা হচ্ছে, সিংহাসন রক্ত চোষে মহারাজ, ভিস্তি ভিস্তি রক্ত না ঢাললে রাজ্যপাট হয় না, সম্রাট দাউদ কী করেছেন, মনে করুন। মাফ করবেন, আমি একটু বাচাল মহাশয়!

—কয়িন কোথায়?

—ওই হোথায় গিয়ে দেখুন, ছাউনি তুলে নিয়ে চলে গেছে, কুথা গেছে বলে নাই। দুঃখে আত্মঘাতী হল কিনা নরদেবতা ফরৌন বলতে পারেন, দাগোন বলতে পারেন, দেবী আনাথ বলতে পারেন। আর ধরুন ইলোহিম বলতে পারেন। আমরা মানুষ, আমরা কী করে বলি মহারাজা!

শুধুমাত্র নামটুকু বলে এই মরুমর্তে কাউকে কি খুঁজে বার করা যায়? সম্রাট যে কখনও কয়িনকে চোখে দেখেননি। তবে এখন মনে হচ্ছে, যার শিশুকে হত্যা করা হয়েছে, তার নাম রাতারাতি মরুভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে। অতএব মরে না গিয়ে থাকলে কয়িনকে নাম ধরেই সন্ধান করা যেতে পারে।

কিন্তু শলোমনের হঠাৎ মনে হল, এই সৈনিকের বেশে কয়িনকে খোঁজা বৃথা। কারণ, এই ছায়াকে বোধহয় মানুষ বিশ্বাস করে না আর। ছায়ামূর্তিরা খুঁজতে বার হয়েছে শুনলে কয়িন আরও ভয় পেয়ে যাবে এবং আরও লুকিয়ে পড়বে। কিন্তু কয়িন কি একবার তার স্ত্রীর খোঁজ করবে না? কেন করবে না?

আনাথ এখন শৌলগৃহে রয়েছে, যদি শুনে থাকে কয়িন, তাহলে ? তাহলে তখন কী করবে বেচারি !

উরিয় কী করেছিলেন ? আসলে উরিয় তখন যুদ্ধে ব্যস্ত। বৎসেবাকে দাউদ পদ্মপুকুরের জল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গর্ভসঞ্চার করেছিলেন। তারপর, ধর্ষণের পর কী হল ? বৎসেবা স্বগৃহে ফিরলেন।

শলোমনও কি শোক-বিহ্বল নির্বাক আনাথের গর্ভসঞ্চার করে কয়িনের কুটিরে ফেরত পাঠাবেন ? সেই জন্যই কি সম্রাট আনাথকে লিবাননের শিবিকায় চড়িয়ে সারিনকে দিয়ে শৌলদুর্গে তুলে এনেছেন ? তিন দিন কয়িনের জন্য অপেক্ষা করাই কি যথেষ্ট হয়েছে ! অবশ্য তিন দিন নয়, কয়িন সর্বসাকুল্যে পাঁচ দিন বাড়ি ফেরেনি। কেন ?

একজন গরিব ব্যাপারির পক্ষে পাঁচ দিন বাড়ি না ফেরা কি খুবই অস্বাভাবিক ? কয়িন কি এক হাট থেকে অন্য হাটে চলে যেতে পারে না ?

—আর কোন্ বাজারে কয়িন যেত হে দোকানি ?

—আজ্ঞে যদ্দুর জানি ওর বাজার ছিল এই ইফা।

—ও, হালিস বস্তিতে ফিরল না কেন ?

—কী করে বলব বলুন মহারাজা ! সন্তান গেল, বউটাও গেল। কয়িন কিসের টানে ফিরবে !

—ওর বউ গিয়েছে কোথায়। আনাথ রয়েছে।

—তাহলে বাজারে বাজারে ঢেঁড়া দিয়ে যান। কয়িন শুনুক, আনাথ রয়েছে। দরকার পড়লে বউটাকে জোগাড় করে নেবে !

—দরকার পড়লে ?

—আনাথকে কার কতটুকু দরকার কী করে বলব হুজুর মা-বাপ !

রঙের কাপড়ের এই দোকানদারটিকে প্রচণ্ড আঘাত করতে ইচ্ছে হলেও শলোমন নিজেকে সংবরণ করলেন। কারণ দোকানদার প্রথম থেকেই তির্যক মন্তব্য করে চলেছে, অথচ তার কথাকে বাচ্যার্থে খুব নিরীহ আর সহজ প্রতিপন্ন করতে চাইছে সে। যেন সে কয়িনের মনটাই বোঝে না, যেন সে কয়িনকে অবজ্ঞা করতে পারলে বাঁচে। আসলে ওর ভাষা ফলকাকৃতি, জটিল !

আনাথকে কার কতটুকু দরকার ? কথাটি উত্তপ্ত লোহার মতো শলোমনের হৃদয়ে ঢুকে গেল। আনাথকে দরকার কার এবং কতটুকু ? অবশ্যই কার এবং অতি অবশ্যই কতটুকু ? বৎসেবাকে দাউদের যতটুকু দরকার হয়েছিল ? আজ কি সত্যিই কয়িনের আর আনাথকে দরকার নেই ?

যদি কারও হৃদয়ে সহসা কোনও ঐতিহাসিক মরু-বিভীষিকা ঢুকে যায়, আসলে শিশুহত্যা নিষ্করুণ বিভীষিকা ছাড়া কিছু নয়, তাহলে কি সন্ত্রস্ত মানুষটি আর কাউকে খুঁজে দেখতে চায় না ! স্ত্রী, পশুধন, আতরদান, সুর্মাপাশা, অক্ষরঅঙ্কিত গোলাপদান, পুরানো বেগনি বস্ত্র সবই তাহলে তার কাছে অর্থহীন হয়ে ওঠে ? মরু-বাণিজ্য, বাজারের বিকিকিনি বালিখেলা মনে হয় ? কী হয় ঈশ্বর, তখন একজন মানুষের কী হয়—আমাকে বলে দাও সদাপ্রভু !

সম্রাটের নিঃশব্দ আর্তনাদ সমুদ্রের জলে তোলপাড় করতে থাকে। সম্রাট হঠাৎ

সমুদ্রে চেয়ে দেখেন, দু'টি ছায়া-সারগনের লাশ তরঙ্গে শাসিত হয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। ওরা কি তাহলে এখনও সাগরে ভাসছে ! ওরা কি মমিদেহ ? ওরা কি শেষ হয়নি ? সমুদ্রের দিকে ভয়ে আর চাইতে পারেন না সম্রাট।

দম ধরে দাঁতে দাঁত চেপে চুপচাপ কিছুক্ষণ কাপড়ের এই দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন শলোমন। তারপর কী মনে করে দোকান থেকে বেশ ক'হাত ময়ূরকণ্ঠী দামি কাপড় কিনে ফেললেন। অতঃপর সম্রাট ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে আসেন মানচিত্রের আরও তলার দিকে। জেরিকো পেরিয়ে ঘোড়া নামে গ্যালিলি শহরে। গ্যালিলি হ্রদের তীরে সম্রাটের অতি ক্ষুদ্র রাজবাড়ি রয়েছে। এখানে শান্ত স্তব্ধতা। কেউ থাকে না বাড়িতে। হ্রদের চারিদিকে ছড়ানো রাজবাড়িটিকে পাহারা দেওয়ার জন্য সামান্য কিছু প্রহরী-সৈনিক। এখানে লোক-বসতি কম। রাজবাড়ি থেকে সামান্য তফাতে হ্রদের পার্শ্ববর্তী একটি বিখ্যাত দরজির দোকান দেখা যায়। দোকানের নামটি আকাশস্পর্ধী, জিবরাইলের দোকান। দরজি যে দেবদূত নয়, তা বলাই বাহুল্য। তবে ওই নামটার জন্যই হয়তো দরজি লোকটির গুমোর খুব। অবশ্য হাতের কাজও অতীব সূক্ষ্ম এবং অত্যন্ত তারিফ করার মতো। অভিজাতরাই এখানে কাজ দেয়। গরিবদের দোকান এটা নয়। দরজি সারা দিনে একটাই কাজ ধরে। ওকে দিয়ে দিনে একাধিক কাজ করানোর সাধ্য কারও নেই। এখানে সম্রাট কখনও নিজের পরিচয় দেননি। যদিও দেননি, তবু তা দরজির কাছে গোপন থাকেনি। সম্রাট পরিচয় দেননি, অথচ কাজ দিয়েছেন। সেই কাজ হয়ে উঠতে মরুভূমির ঋতুও অনেক সময় ঘুরে গেছে। কিন্তু দরজিকে কিছু বলার জো নেই। ও কাউকে মানে না। কারণ জিবরাইল নামটাই বোধহয় তার এই ধরনের সম্ভ্রমকে চড়িয়ে রেখেছে। অথবা এ একটা পাগল লোক। কথা বলে অদ্ভুত। কখনও নিজেকে স্বপ্নদর্শী গনৎকার বলেনি। তবু ওর কথা কান পেতে শোনার মতো। সম্রাট সেই আকর্ষণে এখানে ফিরে ফিরে আসেন।

আজ ছায়ামূর্তির হাতে নতুন কাপড় দেখেই দরজি বলল—বসেন সারগন মহামতি ! এইটে তো রাত্রিবাস হবে হুজুর ! মাফ করবেন, এতে আপনার স্ত্রীদের কারও গোপন ঋতুরক্ত যেন না লাগে, শুদ্ধ রাখবেন। সাহস দিলে বলি একটা কথা...

—বলুন !

—রাত্রিবাসের এই পোশাক আপনাকে যন্ত্রণা দেবে দিব্যদর্শী ! আপনি আজ এক সাংঘাতিক যন্ত্রণা খরিদ করেছেন।

—আমি স্ত্রীদের এই পোশাকে স্পর্শ করব না। এমন করে দিন আমি যেন যুদ্ধ আর প্রেমের দেবীকে স্পর্শ করতে পারি !

—প্রেমের সামান্য স্পর্শসুখও কি আপনার ভাগ্যে আছে, বলতে পারি না ! আপনার হাত কি রক্তাক্ত মোশিহা ?

—আপনি ভেবে বলুন খলিফা ! আমি কি তাহলে ফিরে যাব ?

—না, কাপড় রেখে যান। আমি দেখব। এ দিয়ে অন্য কোনও পোশাক হয় কিনা। আচ্ছা শুনুন মোশিহা।

—বলুন আকাশ-প্রতিভা, লজ্জা নিবারণ করুন আমার। আমাকে ঢেকে দিন কারিগর।

—আপনার মৃত্যু হবে মহৎ, কারণ সদাপ্রভুর কাছে আপনি পরমায়ু প্রার্থনা করেননি। মহৎ মৃত্যুই আপনার শ্রেষ্ঠ পোশাক মহানৃপতি সারগন, আমি সামান্য দরজি, আপনার লজ্জা আমি কী করে ঢাকি ! এখন আপনি একবার জিরুজালেম যেতে পারেন। আমার মনে হচ্ছে, ওখানে মন্দিরের যে মাটির চৌহদ্দি, তার কিনারে, অত্যন্ত গা-ঘেঁষে একটি নতুন শিশু-সমাধি খাড়া করে তোলা হচ্ছে ! এই শিশু এক জাগ্রত দেবতা !

—সে কি ! সমাধি কেন ? শিশুর সমাধি কেন ওখানে ! বলতে বলতে হাতের কাপড় দরজির দিকে ছুঁড়ে দিলেন সম্রাট শলোমন। তারপর গ্যালিলি হ্রদের তীরস্থিত রাজবাড়ির দিকে চেয়ে রইলেন অন্যমনস্কভাবে। বুঝতে পারলেন, জিবরাইল দরজির কাছে জিরুজালেমের কোনও খবর সহজেই চলে আসতে পারে, কারণ কেনানের যে-কোনও প্রান্তের মানুষই তার খদ্দের। অবশ্য জিবরাইল দিব্যদর্শী গনৎকারই বটে, আশ্চর্য লাগে, লোকটা যা বলে অনেক সময়, বলতে কি অধিকাংশ সময়ই মিলে যায়। তাছাড়া লোকটার কথা বলার আকর্ষণ কম নয়। দরজির রূপটাও কেমন প্রসন্ন-সুন্দর, একটা দিব্যদর্শীভাব সর্বদা চোখেমুখে ফুটেই রয়েছে। মরুমর্তের কোনও সুগভীর দুঃখ-যন্ত্রণার কথা বলতে গেলেও লোকটার জিহ্বা আড়ষ্ট হয় না।

শিশুর সমাধি। কে এই শিশু ? আচ্ছা, এ আনাথের মৃতপুত্র নয় তো ? কিন্তু...না, এ তো হতেই পারে। দ্বিখণ্ডিত শিশুকে ইব্রিয়াই কি তাহলে সরিয়ে ফেলেছে ? এই প্রশ্ন জিবরাইল খলিফাকে করা সমীচীন হবে না। কারণ তাতে দরজি বিরক্ত হতে পারে। এবং এত অসহায়ভাবে নিজেকে সামান্য দরজির কাছে উপস্থিতই বা করবেন কেন শলোমন ? যাঁর সঙ্গে স্বয়ং ইলোহে স্বপ্নে কথা বলেছেন, যিনি কেনান-অধিপতি, জ্ঞান যার কৌশল, তিনি কেন একজন গনৎকারের কাছে অসহনীয়ভাবে নতজানু হবেন ? দরজি যা বলে, শুনে যাওয়া এবং নির্বিকারভাবে শোনাই তো শলোমনের পক্ষে স্বাভাবিক। দুধমধু নয়, হাতের মুঠিতে সোনার তরবারিই শলোমনের জন্ম-জয়ন্তীর ছবি।

অবাক লাগছে, কোনও ছায়ামূর্তি এখনও তাঁকে জিরুজালেমের সংবাদ পৌঁছে দিতে পারেনি বা দেয়নি। কেন ? মূল ছায়ামূর্তি দু'টিই তো এখন দ্বিধাবিভক্ত। এবং কাবিল গালিয়াৎ আহত। কিন্তু মন্ত্রীরা কী করছেন ? যে-সব সৈন্যরা জিরুজালেমে মোতায়েন তারা কি হাত-পা গুটিয়ে বসে রয়েছে।

শামের পিঠে চকিতে লাফিয়ে উঠলেন সম্রাট। আজ দরজিকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলেন, পোশাক নিতে কবে আসতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ থেকেই অশ্ব ঊর্ধ্ববেগ ধরল। মরুঝড়ের গতিকে পিছনে ফেলে শাম পৌঁছল জিরুজালেম। মন্দির-চৌহদ্দির কিনারে নগ্ন ইব্রিয়াকে দেখতে পেলেন সম্রাট। ধ্যানে বসে রয়েছে নাঙা সন্ন্যেসী। তার গা-ঘেঁষে অর্ধ উলঙ্গিনী একটি মেয়ে। মেয়েটিকে চিনে ফেলেন সারগন। সেই রূপাজীবা নারী দিব্যা, যে সারিনের শিশুকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। ইব্রিয়ার সঙ্গে ভিড়েছে।

দেখা গেল, সম্রাটের চোখের সামনে শিশুর সমাধির চারদিকে যিবুষীয়রা খেজুরের কণ্টকিত ডাল পুঁতে দিচ্ছে। চেষ্টা হচ্ছে, সমাধির দেওয়াল গেঁথে তোলার। এখানকার সৈনাধিপতি একদল সৈন্যসহ মন্দিরের চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে। সৈন্যাধক্ষ

এগিয়ে এল সম্রাটের কাছে।

—আমি খবর কেন পেলাম না মীনাক্ষ ?

—আজ্ঞে, খবর তো পাঠিয়েছি গতকালের আগের দিন।

—কোথায় ? কে নিয়ে গেছে ?

—দাউদ নগরে সর্বাধিপতি ! অবশ্যই সংবাদ পাঠানো হয়েছে।

—দাউদ নগরে কেন ? শৌলদুর্গে খবর যাবে !

—জননী বৎসেবা ইদানীং বারংবার বলে পাঠাচ্ছিলেন, জিরুজালেম সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য যেন তাঁর মারফত আপনার কাছে পৌঁছায়। আমি কেনান-জননীকে উপেক্ষা করতে পারিনি মহামান্য !

—আমিই তোমাকে নিয়োগ করেছি হেতপুত্র মীনাক্ষ, এরপর তুমি মায়ের কাছেই তোমার পদমর্যাদা বুঝে নিও। সেটাই বোধ করি ভাল হবে।

—সুর-বিজেতা মহাজ্ঞানী সারগন ! আমি জানি বিচক্ষণতার মুকুট আপনারই যোগ্য। কিন্তু জননী তাঁর নির্দেশকে আদেশ জ্ঞান করতে বলেছেন। খুব দ্রুতই খবর এসেছিল, আপনি মন্দিরের জন্য একটি শিশুকে উৎসর্গ করেছেন। জননীই সেই খবর পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছেন...

এবার আশ্চর্য বিহ্বল আর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সম্রাট। বললেন—উৎসর্গ করেছি ? আমি উৎসর্গ করেছি শিশু ! কী বলেছেন মা ? বল, কী বলেছেন।

এই সময় আকাশে মহাচিৎকার করে উঠল অর্ধনগ্ন পাগলী দিব্যা—তুমি মায়ের বুক থেকে শিশুকে কেড়ে নিয়েছ শলোমন ! তোমাকে আমি ক্ষমা করব না। তুমি মহানবি আব্রাহামের কলঙ্ক, জেনের বাদশা। তুমি পাপী। তুমি জীবদ্দশায় সিওলে (যমালয়ে) বাস করবে রাজা ! মহাত্মা ইব্রিয়া বলেন, তুমি ছাগশিশুর মুখে দুধ দাও আর মানুষের শিশুকে বধ কর ! তুমি খনিতে ফেলে মানুষ মারো। জুলুম করে ট্যাক্সো আদায় কর।

—ওকে তুই বলে দে দি-দি-দি-দিব্যা। রাজার জ্ঞান সর্বদা ছলনাকারী। অভিশপ্ত আর বঞ্চিতের রক্তে ওর দোয়াত পূর্ণ করেছেন ইলোহে। এখানে ম-ম-ম-মন্দির গড়ার ক্ষমতা ওর নেই। এ মাটি দাউদের নয়। এ যিবুষের মাটি। ওই সমাধির দেবতা আমাদের রক্ষা করবেন ! বলে উঠল ইব্রিয়া ইয়াহুদ।

দিব্যা আকাশ ফাটাতে থাকল। সমাধিকে ঘিরে জড়ো হয়ে গেল যিবুষীয়রা। মাথা নিচু করলেন সম্রাট শলোমন। কাউকে কোনও কথা না বলে শামের পিঠে চড়ে বসলেন অতর্কিতে। মন্থর বেগে অশ্ব দিগন্তের দিকে ছুটে যেতে লাগল।

কিছু দূর আসার পর শলোমনকে নিদ্রা আকর্ষণ করল। তিনি শামের পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপরই তাঁকে স্বপ্ন ঘিরে ধরল। এক দিকে অঙ্গার, অন্য পাশে স্বর্ণপিণ্ড। তিনি আগুনে হাত দিলেন।

শলোমন কল্পনা করেন, মরুভূমিতে কিভাবে মাতৃগর্ভগুলি তল্লাশ করা হত। মায়েরা তাদের শিশুপুত্রকে কোলে করে সারি বেঁধে দাঁড়াত। সারিবদ্ধ নারীরা দেখত, সেই আগুন, সেই সোনা, কিসে হাত দেবে তার শিশু ? মোশি আগুনের দিকেই যে হাত বাড়িয়েছিলেন, তা তো নয়, তিনি সোনাই ধরতে চেয়েছিলেন। দেবদূত শিশু মুশার হাত সোনার দিক থেকে টেনে আগুনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। শিশু মোশি আগুনের ছোট ডেলা মুখে পুরে ফেলেন, মোশির জিহ্বা পুড়ে যায়, তোতলা হয়ে যান

তিনি।

শলোমানের হাতও স্বপ্নের মধ্যে সোনার দিক থেকে টেনে কেউ অঙ্গারে ঠেলে দিল। অঙ্গার মুঠোয় ধরে মুখে পুরে ফেললেন সম্রাট। তাঁর জিহ্বাও হাতেরই মতন ঝলসে গেল। মনে হল তিনি সমগ্র মরুভূমির আগুন ভক্ষণ করলেন।

বুকের ভিতর দিয়ে আগুনের তরল স্রোত নেমে গেল। মনে হল, অসহ্য যন্ত্রণায় ডান হাতের আঙুলগুলি ছটফট করছে। ঘোড়া ধীরে ধীরে হলেও গতিবেগ বাড়িয়ে নিয়েছিল। আজ এই প্রথম ঘুমন্ত এবং যন্ত্রণাকাতর সম্রাটকে শাম পিঠ থেকে ছিটকে মরুতে ফেলে দিল। মাটিতে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে সম্রাটের আহত চেতনা ককিয়ে উঠল। তিনি উপুড় হয়েই মাটিতে পড়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

—মা! আমি কোনও শিশুকে কোথাও উৎসর্গ করিনি মা! আমি নিজেকে ছাড়া কাউকে ইলোহের কাছে কখনও উৎসর্গ করিনি। বলে নিঃসঙ্গ মরুভূমিতে শলোমন দেখলেন, তাঁর চোখ দু'টি বালিতে কিচকিচ করছে,তাঁর চোখের জল গড়িয়ে পড়ার আগেই বালি সেই অশ্রু শুষে নিচ্ছে। সারগন অবাক হয়ে মুখ তুলে দেখলেন, শাম খানিক তফাতে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে একা একা লেজ নাড়ছে। তাঁকে ছেড়ে চলে যায়নি।

—কিন্তু শাম আজ আমাকে এভাবে ফেলে দিল কেন? কেন ফেলে দিল! আমি কি পারি না ওই পশুটাকে চাবকাতে! পারি না কি? কিন্তু ও তো আমায় কখনও ফেলে দেয়নি। আমার কি প্রয়োজন ফুরিয়েছে এই মরুমর্তে! কিন্তু মন্দির; আমার আদর্শ।

ভাবতে ভাবতে সম্রাট সহসা দেখলেন, লাল মরুর একদল শরণার্থী কোথায় যেন চলেছে! নিশ্চয়ই এখনও ওরা বসত করার জায়গা পায়নি। সপ্তজাতির মধ্যে যারা মন্ত্রীপদ পেয়েছে, তারা এই লালমরুর মানুষদের উপর গোপনে পীড়ন চালায়, ছায়ামূর্তিদের লেলিয়ে দেয়। এই অনুপ্রবেশ তারা বন্ধ করতে চায়। এখনও এরা বেদে, ঘৃণ্য, অপরাধী এবং দাস— এদের মাতৃভূমি নেই।

শলোমন দেখলেন, দলের মধ্যে একজন দেখতে অবিকল আব্রাহামের মতো। তার পিছনে স্ত্রী এবং দাসী। তারাও দেখতে সারি আর হাগারের মতো। কী বিস্ময়কর দৃশ্য! এরা কোথায় চলেছে? সঙ্গে কাঁধে করা ঈশ্বরীয় সিন্দুক শিবিকার মতো করে বয়ে নিয়ে চলেছে! আব্রাহাম! বলে ভূশায়িত সম্রাট চিৎকার করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কাজ হল। আব্রাহাম পত্নী-দাসী সঙ্গে করে থেমে পড়লেন। দলের অগ্রগতিও কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। আব্রাহাম এগিয়ে এলেন সম্রাটের কাছে। হাত বাড়িয়ে বললেন— ওঠো হে, পড়ে আছো কেন?

খুবই বিস্মিত হলেন সম্রাট, তাঁকে মাটির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে আব্রাহাম চলে গেলেন। দলটাও আগের মতো চলে যেতে লাগল। সম্রাটের মনে হল, সব মানুষেরই ছায়া মরুভূমিতে থেকে যায়, তিনিও কি তাহলে থেকে যেতে পারেন না। কিন্তু ওরা কোথায় যাচ্ছে! আচ্ছা, এদের মধ্যে কি কয়িন কোথাও ছিল? না, না, একজন হিত্তীয়ও তো এই দলে থাকবে না।

ওরা লোতের বংশ হতে পারে! হতে পারে বারোগোষ্ঠীর কেউ! সব এখন মিলে গেছে। মিলে গেলেও জাতিসত্তা কেউ বিসর্জন দেয়নি। এরা নিশ্চয়ই কোথাও

বাধাগ্রস্ত হবে এবং মার খাবে। এদের ভার আর মরুভূমি সহ্য করতে পারছে না। এদের অনুপ্রবেশে বৎসেবার চরম আপত্তি আছে। এদের আর খেতে দিতে এবং বাসস্থান দিতে পারছে না মরুমর্তের কৃষ্ণমৃত্তিকা।

সহসা তীব্র সমবেত আর্তনাদ শোনা গেল। সম্রাট চমকে উঠলেন। শামের পিঠে উঠে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, তিনজন পুরুষের গলা কাটা পড়ে। বালি রক্তে ভিজে যাচ্ছে। দল কিন্তু এগিয়ে চলেছে। এই মৃত্যু কি এতই সহজ! এদের মেরে ফেলা হল কেন?

—বল, তোমাদের মরতে হল কেন? এখনও প্রাণ আছে দেহে, কেউ একজন বল তোমরা, কেন এমন হল!

—আজ্ঞে আমরা অভিশপ্ত। দলে জায়গা হল না। ওরা অনেক আগেই আমাকে ফেলে দিতে চেয়েছিল। তবে মেয়েদের নিয়ে গেছে। শিশুদের কী হবে জানি না। একজন এই কথা বলে চোখ বুজল। বাকি দু'জন সাড়া দিতেই পারল না।

মৃতদেহ তিনটি পড়ে রইল। শলোমন উঠে দাঁড়ালেন। শামের লাগাম ডান মুঠোয় চেপে ধরে তিনি আকাশে চোখ তুললেন। দেখলেন, একটি কোড়া পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। এ যেন অনন্তযাত্রায় চলে গেল যুদ্ধের বিহঙ্গ। তার পরই আকাশে মেঘ জমল। আবার মেঘ, বর্ষা নেমে আসছে।

মাঝে মাঝে ঘন হয়ে বৃষ্টিপাত হবে। সবুজ হয়ে উঠবে মরুস্থলীর গ্রাম আর শহরগুলো। ফসল যা হবে, কেনানের মানুষের তাতে পেট ভরবে না। মিশর থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হবে। তার বিনিময়ে দিতে হবে ঘোড়া আর লোহার রথ। ইদানীং মিসর যুদ্ধ-রথ চাইছে। শৌখিন রথে আগ্রহ নেই। অশ্বও চায় যুদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত, সুশিক্ষিত। শলোমনকে হিসেব কষে চলতে হয়। যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধের ঘোড়া ও রথ কতটা কিভাবে বিক্রি করবেন তিনি; বিনিময়ে কত শস্যই বা পাবেন! খাদ্যের ব্যাপারে চিরকালই কেনান মিশরের উপর নির্ভরশীল।

অতীতে ইস্রায়েল অর্থাৎ যাকোবের ছেলেরা কেনানে দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের সন্ধানে মিসরে নেমে গিয়েছিল। তার আগে যাকোবের কনিষ্ঠপুত্র যোশেফকে কূপ থেকে উদ্ধার করে মিদিয়নীয় ইশ্মায়েল-বণিকরা মিসরে পৌঁছে দেয়। এই যোশেফ কাবুসের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিয়ে মিসর-রাজ কাবুসকে মুগ্ধ করেন। নিজগুণে ইউসুফ বা যোশেফ মিসরের সিংহাসনে বসেছিলেন। যোশেফ যখন রাজা, তখন তাঁরই কাছে যাকোবের জ্যেষ্ঠপুত্র অন্য ভাইদের সঙ্গে করে মিসর পৌঁছে খাদ্যের জন্য দরবার করে। অথচ মনে রাখতে হবে, এই জ্যেষ্ঠপুত্রের নেতৃত্বেই কৈশোরে যোশেফকে অন্য ভাইরা হত্যা করার চেষ্টা করে এবং কূপে ফেলে দেয়। তবু প্রাণে বেঁচে যান যোশেফ। উনি বেঁচে না থাকলে মোশির আবির্ভাব ঘটে না। কারণ যাকোব পুত্রাদিসহ দুর্ভিক্ষেই মারা পড়তেন। যাকোবের বারো পুত্রের নামানুসারে বারো গোষ্ঠীর অভ্যুদয়। অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ না হলে মানুষ যুদ্ধে জেতে না।

যোশেফকে হত্যাই করেছে, ধরে নিয়েছিল ঘাতক ভাইয়েরা। মিসরের রাজা হয়েও যোশেফ তাঁর ভাইদের ক্ষমা করেন এবং খাদ্য দিয়ে প্রাণ বাঁচান। ভাইদের জন্য চোখে জল এসেছিল যোশেফের। ঘাতকদের জন্য চোখে ঘনিয়ে ওঠা অশ্রু এই মরু-আকাশকে কখনও কখনও শিশিরের মতো সিক্ত করেছে। এই শিশির-কণিকা

থেকে শলোমনের জন্ম। কিন্তু এ কথার বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়, আমি কি ঘাতক নই ? নিজেকেই প্রশ্ন করেন শলোমন। প্রশ্ন করেন আকাশের কোড়া পাখির দিকে চেয়ে, মরুতে পড়ে থাকা মৃতদেহের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে।

বৃষ্টি নামল। আজ তাঁর সঙ্গে কোনও ছায়ামূর্তি নেই। তাঁর অনুচর দেহরক্ষী ছায়ারা দ্বিধাবিভক্ত। এই বৃষ্টির মধ্যে কেউ যদি তাঁকে হত্যা করে কেউ বুঝতেও পারবে না শলোমন কিভাবে শেষ হয়েছেন।

অসম্ভব বড় বড় ফোঁটার সঙ্গে তীব্র ঝড় শুরু হল। বাতাস ঝাপটা দিয়ে দিয়ে দিগন্ত থেকে তেড়ে তেড়ে আসছে। কড়া ঠাণ্ডা শলোমনকে আক্রমণ করছে ক্রমশ। সম্রাট ভয় পাচ্ছিলেন শাম তাঁকে পিঠ থেকে আবার ছিটকে ফেলে দেবে না তো! বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে চলেছিল শামস। পিঠে বসে চলতে চলতে সম্রাটের মনে হল, শামস ক্ষুধার্ত।

হালিস বস্তির কাছে এসে কয়িনের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণঅশ্ব। কিছুতেই আর এগোতে চাইল না। মাথা নিচু করে ঘাড় সটান করে দিয়ে যেন সে বৃষ্টির ঝাপটা ঠেকাতে চাইল। শলোমন দেখলেন, বৃষ্টি অর উগ্র বাতাসের আঘাতে কয়িনের কুটির মাটিতে শুয়ে পড়েছে এবং পালিত পশুরা কোথাও নেই, বোধহয় সবই চুরি হয়ে গেছে। কয়িন আর এ বাড়িতে ফিরবে কী করে ?

কয়িন ফিরবে না। আনাথের সঙ্গে এ জীবনে কখনও দেখা হবে না। আনাথ কী করে সহ্য করবে ? শলোমনের মনে হল, কয়িনকে যে করেই হোক খুঁজে বার করতে হবে। হাবিল ইশ্মায়েলকে তিনি বলেছিলেন— অসুর সেনাবাহিনী থেকে পলাতক সৈনিককে বধ করার সংকল্প ত্যাগ করতে হবে, তবেই তোমাকে আমি গ্রহণ করব।

হাবিল বলেছিল— তাইই হবে সম্রাট। আসলে আমি পলাতক সৈনিককে সাবধান করতেই এসেছি। কিন্তু এ কথা কোনওভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লে আমি নিজে বিপন্ন হব ; অসুররাজ আমাকেই হত্যা করার জন্য লোক পাঠাবে। অসুররাজ চায়, আমি শলোমনকে হত্যা করে ফিরে যাই। সত্যি বলতে কি, আমাকে পাঠানো হয়েছে জোড়া খুনের জন্য। এই অবস্থায় শলোমনের ছায়ামূর্তির ছদ্মবেশ ছাড়া আমার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে না। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন।

—ঠিক আছে, তাইই হবে ইশ্মায়েল। কিন্তু তুমি যে কাউকে খুঁজছ, কাকে খুঁজছ, খুঁজে পেলে নিশ্চয় আমি জানতে পারব।

—আজ্ঞে, নিশ্চয়ই পারবেন। পলাতকের বাঁ-বুকে অসুরবাহিনীর উল্কি ছাপ রয়েছে, ওই চিহ্ন দেখে তবে চিনতে হবে। তবে চেহারার বিবরণ যা জানি, আমারই অধীনস্থ সেনা বলে, তাতে করে মুখ দেখে চেনা একেবারে অসাধ্য হবে না। যদি সংশয় হয়, তাহলে পোশাক খুলে দেখে নেওয়ার দরকার হবে। তবে আমি ঠিক জানি না, পলাতক এই সৈনিক সত্যিই পালিয়ে এসেছে কিনা, কিংবা তাকে অসুররাজ নিজেই পাঠিয়েছে কিনা!

—মানে ?

—আমি সেনাপতি ছিলাম। কিন্তু প্রত্যেক সৈন্যের মুখ মনে রাখা দুঃসাধ্য। অসুররাজ চায় আপনার সৈন্যবাহিনীর প্রকৃত অবস্থার বিবরণ।

—বটে ?

—হ্যাঁ। পলাতক সৈন্য সেই বিবরণ জোগাড় করতে আসতে পারে। আপনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত খবর যদি সে পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে সে পুরস্কৃত হবে। যদি সে সত্যিই কোনও হিত্তীয় হয়, তাহলে সপরিবারে মুক্তি পাওয়ার শর্তে এই কাজ সে করবে। আবার স্রেফ সে পালিয়ে আসতেও পারে। পুরো ব্যাপারটা যাচাই করে নেওয়ার জন্য পলাতক সৈন্যকে খুঁজে বার করা জরুরি।

—কিন্তু এমন কি হতে পারে না ইশ্মায়েল যে, তুমি নিজে কোনও ইশ্মায়েল নও।

—না। হতে পারে না। আমার কানের আকৃতি দেখুন! বনগর্দভস্বরূপ এই কান, দেখুন! খানিক ঢোলা ঢোলা আর কানে আমার স্বর্ণকুণ্ডল! এ আপনার ইলোহের কান। তাছাড়া আমার লিঙ্গাগ্রত্বক ছিন্ন করা হয়েছে। দরকার হলে আপনি তা-ও পরীক্ষা করতে পারেন!

—নিশ্চয়ই তোমার সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করা হবে।

—অসুর-রাজ অনেক সুদক্ষ সৈনিককে নবিবেশ পরিয়ে ফোরাত পার করে কেনানে পাঠাচ্ছেন। তারা আপনার অশান্তির কারণ। অত্যন্ত নিষ্ঠুর শোনাবে, তবু বলি, মিসরও এই কাজে লিপ্ত। এখন দরকার, ছদ্মনবিদের শনাক্ত করা এবং তাদের জিহ্বা কেটে দেওয়া। আমার ধারণা হচ্ছে, বোবা-উন্মাদটা কেনানেরই লোক, কিন্তু যুদ্ধ জানে, নিশ্চয়ই সে অসুরবাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

—ছদ্মবেশীদের খুঁজে বার কর হাবিল ইশ্মায়েল।

শলোমন শামের পিঠ থেকে নেমে পড়ে ঘোড়ার রাশ ধরে টেনে নিয়ে চললেন ইফ্রোন-উপত্যকার দিকে। হঠাৎ তাঁর মনে জিজ্ঞাসার উদয় হল, আচ্ছা, কয়িন কি তাহলে সেই পালিয়ে আসা সৈনিক ? সে কি জেনে গিয়েছে, কেউ তাকে খুঁজছে ?

বৃষ্টির ভিতর দিয়ে ঘোড়াকে টেনে নিয়ে শলোমন পৌঁছলেন শৌলদুর্গে। তিনি অত্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন। শৌলগৃহের অমরাবতী-কক্ষে ঢুকে পোশাক বদলে ফেললেন তিনি। পালঙ্কের উপর কাবিল গালিয়াৎকে দেখা গেল না। পাশের বিশেষ গোপন কক্ষে সম্রাট ঢুকলেন না।

বৃষ্টির ভিতর দিয়ে ঝাপসা ছায়ামূর্তিকে গবাক্ষ দিয়ে শলোমন দেখতে পেলেন। একটি ছায়ামূর্তি ঘোড়ার পিঠ থেকে একটি শায়িত দেহকে কাঁধে তুলে নিয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখল। তারপর ঢুকে এল শৌলগৃহে। সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়াল সবুজ ছায়ামূর্তি।

—কী হয়েছে ?

—মহানুভব, শিশুকে যে ছায়ামূর্তি হত্যা করেছিল, একশত ছায়ার মধ্যেই সে একজন। হত্যার পর মরুভূমিতে পালিয়ে ফিরছিল।

—ও কি মৃত ?

—হ্যাঁ। কিছুক্ষণ আগে আত্মহত্যা করেছে। আমি নিশ্চিত, এ একজন অম্মোন! দেখুন, ও আদর্শের ভারে মাথা খারাপ করে ফেলে। অপরাধবোধ এবং তীব্র সংশয় থেকেই ও কিন্তু শিশুবধ করেছে। আপনি রাজ্যচ্যুত হবেন, তা সে সহ্য করতে পারেনি।

—কী বলছ হাবিল ?

—ঠিকই বলছি রাজচক্রবর্তী। এই দেখুন, 'শলোমন চিরজীবী', ওর তরোয়ালে খুদে রেখেছে বেচারি! আমার ধারণা, আপনার পরমায়ুর জন্য এই অম্মোন সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করত।

স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন সম্রাট। তারপর হঠাৎই বলে উঠলেন—কয়িন একজন খৈতা। একজন হিটাইট। আমি নিশ্চিত হলাম আদমপুত্র হাবিল! তুমি কয়িনকে খুঁজে বার কর, ওর বুকে নিশ্চয়ই অসুরচিহ্ন রয়েছে।

এ কথা শেষ করেই শলোমন চমকে উঠে শুনলেন, কোনও নারীকণ্ঠ ফুঁপিয়ে উঠল। দেওয়ালের পাশ থেকে সরে ভিতর চলে গেল একটি নারীমূর্তির ছায়া। কে ও?

—আনাথ মহারাজা!

৭. শলোমনের গান

কয়িনকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। শলোমনের হঠাৎ সন্দেহ হল, কাবিল গালিয়াৎ কয়িনকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তাকে বোঝানো দরকার, কয়িনকে কেউ বধ করবে না। বোঝানো দরকার, গালিয়াতের বোন আনাথকে কয়িনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। গালিয়াৎ যেন কয়িনকে সম্রাটের সামনে উপস্থিত করে।

সব শুনে কাবিল গালিয়াৎ বলল—কয়িন কোথায় আমি জানি না মহারাজ।

—তুমি সত্য বলছ কিনা কী করে বুঝব সিমন-পুত্র!

—যাকে আপনি এতটাই অবিশ্বাস করেন, তাকে কেন সহচর ছায়া করে রাখলেন? আমি তো আপনার ক্ষতি করতে পারি!

—কয়িনকে আর সাত দিনের মধ্যে খুঁজে না পেলে, ধরে নেওয়া হবে সে আর বেঁচে নেই।

—তার মৃত্যুর জন্য আপনিই দায়ী হবেন রাজচক্রবর্তী।

—তা হলে আমি কী করব! বল, তুমিই বলে দাও! বলে সম্রাট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

কাবিল গালিয়াৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আমাকে আর আমার বোনকে মুক্তি দিন মহানুভব। আমরা ফিরে যাই।

সম্রাট চকিতস্বরে বলে ওঠেন—কোথায় ফিরে যাবে তোমরা।

—রঙের কারখানায় গিয়ে আবার কাজ ধরব আমরা। আর্যদের বিধবা-পল্লীতে আনাথকে পাঠিয়ে দেব। একদিন বিধবা-মিছিল থেকে আপনার সৈন্যরা ওকে ছোঁ মেরে তুলে নেবে।

—না, না। এ হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না। আমি কখনও কোনও আর্য বিধবার পবিত্র অশ্রু সূর্যের সামনে তর্পণ করতে পারব না কাবিল।

—আপনার হৃদয় যেন সত্য বলে মহামতি সারগন। আপনি শিশুর পরমায়ু চুরি করে বেঁচে রয়েছেন।

—আমি আনাথকে বিয়ে করতে চাই গালিয়াৎ।

—আপনি আপনার আত্মসংকেত হারিয়ে ফেলেছেন মহাশ্রোত্রিয়! আপনার

ধী-ঘড়ি অচল হয়ে গিয়েছে। মহারানি বৎসেবা আজ আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছেন। এখনও সময় আছে মহাধিপতি, আমাদের ছেড়ে দিন। মরুভূমির প্রেম আর যুদ্ধ থেকে আমাদের আনাথকে নিষ্কৃতি দিন নরদেবতা সারগন। বলেই সম্রাটের সামনে নতজানু হয়ে গেল গালিয়াৎ।

শলোমন শৌলসিংহাসন থেকে অসহিষ্ণুর মতো উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, একজন সামান্য আর্য কতদূর আস্ফালন করতে পারে! হাবিল ইশ্মায়েলকে ডেকে এর মাথাটা কেন এক কোপে উড়িয়ে দিচ্ছেন না তিনি? দিচ্ছেন না এই জন্য যে, প্রেমের জন্য, যুদ্ধের জন্য আজও মরুমর্ত তৃষ্ণার্ত। শলোমন নিজেই আজ অগ্নিভক্ষণ করতে পারেন।

গালিয়াতের সম্মুখ দিয়েই তার ভগিনী আনাথকে একটি শৌখিন রথে তোলা হল। আনাথের পরিধেয় অতিশয় শুভ্র এবং মুখমণ্ডল স্বর্গের আলোয় উদ্ভাসিত আর বিষণ্ণ। বোনকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা সে জানে না। বোনের চোখের দিকে একবারই তার চোখ পড়েছিল। দ্বিতীয়বার চেয়ে দেখার সাধ্য তার ছিল না। কারণ এই বোন তাকে বিশ্বাস করে না। জীবনের সব সত্যই আজ হারিয়ে ফেলেছে গালিয়াৎ। কিন্তু বোনটিকে এখন কি একবার স্পর্শ করা যায় না?

আর বুঝি কখনও দেখা হবে না আনাথ? মনে মনে বিড়বিড় করে উঠল গালিয়াৎ। তার শরীরে সহস্র মরু-বৃশ্চিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। দুই ভুরুর মধ্যস্থল সিরসির করতে থাকল।

রথ ছুটিয়া চলিল। আনাথের সঙ্গে সারিন চলিয়াছে। আনাথ দুই ছায়ামূর্তির দিকে দু' একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল, কে তাহার ভ্রাতা তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। কেবলই সে সম্রাটের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া কী যেন বলিতে চাহিল, পারিল না। রথ মানচিত্রের দক্ষিণ সীমান্তের দিকে ছুটিল।

এই সময় খবর আসিল, যিবুষীয়দের সঙ্গে একদল নতুন অনুপ্রবেশকারীর দখল লইয়া দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, দুই পক্ষেরই কিছু মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে। তবে অনুপ্রবেশকারীরা টিকিতে না পারিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট দুই সহচর ছায়ামূর্তি এবং তৎসহ বিশেষ শত ছায়ামূর্তি লইয়া জিরুজালেম রওনা দিলেন। শলোমন রামাসিসের পিঠে চড়িলেন। এই দিনই জিরুজালেমের মন্দির নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড তার দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইল। শলোমন ছায়ামূর্তিদের সঙ্গে লইয়া তার বাঁধা না হওয়া পর্যন্ত জিরুজালেম হইতে নড়িলেন না।

ইব্রিয়ার দল চিৎকারে চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করিল।

সন্ধ্যার চাঁদ উঠেছিল আকাশে। সেই দিকে চেয়ে দেখে অর্থমন্ত্রীকে মিশরে অশ্ব আর যুদ্ধরথ বিক্রির জন্য নির্দেশ দিলেন সম্রাট। তারপর হাবিল ইশ্মায়েলকে ডেকে খাদের গলায় বললেন—তুমি কাবিলকে লক্ষ রেখো, কয়িনের সঙ্গে দেখা করে কিনা সাবধানে বুঝে নেওয়া চাই। আমি চললাম।

শলোমন মরুভূমিতে আবার একা। যদিও পথে পথেই তাঁর সৈন্যরা ঘুরছে। কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করার নিয়ম তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। অবশ্য সে কথা হাবিল

ইশ্মায়েল ছাড়া কেউ জানে না। হাবিল ইশ্মায়েল সম্রাটের অজ্ঞাতেই ছায়ামূর্তিদের দূর থেকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। শলোমন অবশ্য কিছুই বুঝতে পারেন না।

একা যেতে যেতে এক মহাভাব শলোমনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তিনি আপন মনে উচ্চারণ করলেন— "সদাপ্রভু, তুমি দাউদের পক্ষের অস্তিত্ব, তাঁহার সমস্ত কষ্ট স্মরণ কর প্রভু! তিনি তো সদাপ্রভুর কাছে শপথ করিয়াছিলেন, যাকোবের এক বীরের (এক্ষেত্রে মহাত্মা মোশিকে এবং তাঁহার সেনাপতি জশুয়াকে যুগ্মভাবে একক ধরিতে হইবে) কাছে মানত করিয়াছিলেন; আমি নিজ গৃহ-তাম্বুতে প্রবেশ করিব না, নিজ শয়ন-খট্টায় উঠিব না; আমি নিজ চক্ষুকে নিদ্রা যাইতে দিব না, চক্ষুর পাতাকে তন্দ্রামগ্ন হইতে দিব না, যাবৎ দেখিতে না পাই সদাপ্রভুর নিমিত্ত এক স্থান, তিনি জিরুজালেমে বাস করেন।"

শলোমনের মনে হল, তাঁরও নিদ্রা হারাম, তাঁর জন্যও কোনও শয়ন-কক্ষ নাই। এই মহাশূন্য মরুভূমির পথই তাঁর স্থান, শলোমন কোথায় যাবেন এখন। আনাথকে তিনি গ্যালিলি হ্রদের তীরবর্তী রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, গালিয়াতের চোখের আড়ালে সরিয়ে দিয়েছেন।

শলোমন একা একা গানের সুরে উচ্চারণ করলেন— "বাবিলীয় নদী সকলের তীরে, তথায় (হায় আব্রাহাম!) আমরা বসিতাম আর কাঁদিতাম, তখন সিয়োনকে মনে পড়িত। আমরা তথাকার বাইশি বৃক্ষে আপন আপন বীণা টাঙাইয়া রাখিতাম। কারণ তথায় আমাদের বন্দিকারীরা আমাদের কাছে গীত শুনিতে চাহিত, আমাদের উপদ্রবিগণ আনন্দের রব শুনিতে চাহিত, বলিত, 'আমাদের কাছে সিয়োনের একটা গীত গাও।' আমরা কেমন করিয়া বিজাতীয় ভূমিতে সদাপ্রভুর গীতগান করিব?

জিরুজালেম, যদি আমি তোমাকে ভুলিয়া যাই, আমার দক্ষিণ হস্ত [কৌশল] ভুলিয়া যাউক।"

এই অবধি গেয়ে উঠে শলোমন লক্ষ করলেন, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। কেন? তিনি বুঝতে পারছেন না। নিদ্রাহীন অঙ্গীকারবদ্ধ দাউদের মুখ কি স্মরণে কল্পিত হয়? নাকি অন্য কোনও কারণে দুই চোখ উপচে উঠছে? জিরুজালেম, প্রিয় জিরুজালেম, আমি কি তোমারই জন্য অশ্রুপাত করছি? বাইশি বৃক্ষের বীণাগুলি কি একই সঙ্গে রোদন করে উঠছে?

শলোমন আবার গাইলেন, "যদি আমি তোমাকে যাই ভুলে কভু
আমার দক্ষিণ হাত কৌশল ভুলে যাবে প্রভু—
ওহে প্রিয় নাম জিরুজালেম, পবিত্র ভূমি
আমাকে বিজয়ী কর সূফ-সাগর, লাল মরুভূমি।"

আমার জিহ্বা তালুতে গেঁথে যাক, হই যেন মূক
যদি আমি তোমাকে না করি মনে, প্রিয় সুখ!
সমস্ত আনন্দ ম্লান করি তোর কাছে যিবুষ-মৃত্তিকা;
এই গান, শলোমন রচেন সুমনে, এ তাঁর অমর গীতিকা—
এই তাঁর সংহিতা, জয়গাথা, বড়ই মধুর প্রাণবান,
নিজেকেই শোনায় আনমনে, রাজা শলোমন।

হে ইলোহে স্মরণ করুন সেই ক্ষণ
ইদোম-সন্তান যিবুষের জন্য করে মহারণ
বলে তারা, কর উৎপাটন, মূল যেন না বসে কখন;
তবু ছিন্নশির ইদোমের জাতি, ওহে ভগবন্!

তা হলে কি ইব্রিয়া সত্যিই ইদোমপুত্র কোনও, কোনও অমালেক! যিবুষদের জন্য কে এই লোক? তাকে হত্যা না করলে কি মন্দির গড়া যাবে না?

যিবুষের শিকড় ছিন্ন করতে হবে, জ্ঞাতিবধ করতে হবে এবার? ওহে বাবিলকন্যা, হে বিনাশপাত্রি! ধন্য সেই জন, যে তোমাকে সেইরূপ প্রতিফল দিবে, যেরূপ তুমি আমাদের প্রতি [একদা] করিয়াছ। ধন্য সেই, যে তোমার শিশুকে ধরে আর শৈলের উপরে আছড়ায়।

শলোমন তাঁর গান থামিয়ে শিউরে উঠলেন। আনাথের মুখ মনে পড়ে গেল।

যে-শিশুকে শলোমন কখনও দু' চোখে দেখেননি, তার জন্য বুকের ভেতরটা অসম্ভব মোচড়াতে লাগল। কয়িনের কথা ভেবে শলোমনের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। কিন্তু তখনও তাঁর চিত্তে আশ্চর্য সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে উঠছিল।

অযুত কষ্টের মধ্যে যাতে অশ্বপৃষ্ঠে ঘুমিয়ে পড়তে না হয়, সেই জন্য একাকী শলোমন নিজেকে উত্তেজিত করেন আর বলেন: ধর সঙ্গীত, বাজাও ডম্ফ,/ বাজাও নেবল সহকারে মনোহর বীণা। বাজাও তূরী অমাবস্যায়, বাজাও পূর্ণিমায়, আমাদের উৎসবের দিনে।

তারপর বেগনি রঙের আকাশের চাঁদের দিকে চাইলেন শলোমন। এবং তিনি শ্রোত্রিয় বচন স্মরণ করলেন, পিতা দাউদের কাল থেকে অদ্যাবধি। মিশর থেকে দাসত্বমুক্ত ঈশ্বরবাহিনী যখন সেখানে এসে পৌঁছেছিল, তখন তারা মিশর থেকে সঙ্গে করে এনেছিল একটি প্রাণবন্ত দ্রাক্ষালতা আর পুঁতে দিয়েছিল কেনানের মাটিতে—সেই কথা মনে করলেন সম্রাট শলোমন।

এই দ্রাক্ষালতা মাটিতে বদ্ধমূল হল, শাখা বিস্তার করল। সপ্ত জাতির বিনাশ করল এই দ্রাক্ষালতা। এই লতা সমুদ্র, পাহাড়, নদীকে শাখা দিয়ে ঢেকে ফেলেছে। দেশময় ব্যাপ্ত মিশ্রীয় দ্রাক্ষালতা ঈশ্বরতত্ত্ব।

কিন্তু এই লতা যে যিবুষের মাটিতে বাহু বাড়িয়ে এ-মুহূর্তে আর বাড়তে পারছে না। একটি শিশুকে হত্যা করে যিবুষের মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। মনে পড়ে দাউদ-সংহিতায় উল্লেখ ছিল, শলোমনের গানেও তার প্রতিধ্বনি ওঠে, ইস্রায়েলের শত্রুরা একতাবদ্ধ হতে পারে, অতীতে হয়েছে। সাতজাতির চেয়ে জ্ঞাতিসকল অনেক বেশি অবিনয়ী বা উদ্ধত এবং যুদ্ধপ্রিয়।

শাস্ত্র বলেছে— "তাহারা (অর্থাৎ বিদ্বেষিগণ) একচিত্তে মন্ত্রণা করিয়াছে; ইদোমের তাম্বু সকল ও ইশ্মায়েলীগণ; মোয়াব এবং হাগারীয়গণ; গবাল, অম্মোন ও অমালেক—সোরবাসীদের সহিত পলেস্টীয়া (অর্থাৎ আর্যরা), অশূরিয়া (অসুররা)-ও তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে, তাহারা লোত-সন্তানগণের বাহু হইয়াছে।"

অতীতে এই ঘটনাই তো ঘটেছে। তা হলে কি হাবিল ইশ্মায়েল শলোমনের শত্রুমাত্র, অসুরের বাহক? ইশ্মায়েল কি কখনও মাতৃ-অপমান ভোলে না? সুর এবং

অসুর কি শলোমনের পতনের জন্য একতাবদ্ধ ? শলোমনের সমস্ত ছায়ামূর্তিই কি অবিশ্বাস-জড়িত ? গালিয়াৎ এবং ইশ্মায়েলকে হত্যা না করলে কি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না ?

শলোমন গ্যালিলি হ্রদের তীরবর্তী রাজগৃহে প্রবেশ করে অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, সবুজ ছায়ামূর্তি রাজবাড়ি থেকে বার হয়ে গিয়ে কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে উত্তরে উড়ে চলে গেল। শলোমনকে হাবিল ইশ্মায়েল লক্ষ করেনি। সাদা ঘোড়াকে রাজবাড়ির চাতালে দাঁড় করিয়ে রেখে সারগন দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে ঢুকে পড়লেন। চাঁদের আলোয় সবুজ পোশাক ততটা সবুজ লাগে না। তবে কি ওই মূর্তি আসলে কাবিল গালিয়াৎ ?

কে ও ? অন্তঃপুরে সারিনকে দেখা গেল না। পালঙ্কের এক কোণে চুপচাপ বসে সাদা উড়নির প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মুছে নিচ্ছে আনাথ। সম্রাটকে এই প্রথম এত কাছে থেকে স্পষ্ট চোখে দেখছে আনাথ এবং আনাথকেও দেখছেন সম্রাট। আর্যদুহিতা চমকে উঠে খাট থেকে নেমে মেঝেতে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপতে থাকে।

—কে এসেছিল ?

—আস্কিলনের লোক।

—কে ?

—আমার মামা। রাজ-পুরুত।

—কেন ?

—আমি বিধবা হয়েছি কিনা জানতে। আমি...

—বল !

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আনাথ বলল— শুধালো, সমুদ্রতীরে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, আমি লুব্ধক নাচ নাচতে চাই কিনা ! আমি বলেছি...

—কী বলেছ তুমি আনাথ ? চরম হাহাকার ঘুলিয়ে উঠল শলোমনের কণ্ঠে ; সুন্দর চোখ দুটি তাঁর মরুবাষ্পে ভরে গেল।

—বলেছি...

—হ্যাঁ, বল ! কী বলেছ !

সহসা দু' হাতে খাটের বাজু আঁকড়ে ধরে মৃদু অথচ সশব্দে কেঁদে উঠল আনাথ। তারপর অচৈতন্য হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। শলোমন দু দণ্ড হত-স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর দুই বাহুতে করে আনাথকে মেঝে থেকে উঠিয়ে নিতে গিয়ে আর্যনারীর দেহ নিঃসৃত মিসরীয় সুঘ্রাণ পেলেন, যা ইগারের শরীরে ছিল। শরীরের সর্বত্র সেই ঘ্রাণ ছড়িয়ে গেল শলোমনের।

আদম বললেন, শলোমন তাঁর গীত-সংহিতার হিতোপদেশ অংশে লিখেছেন, "প্রজ্ঞাই প্রধান বিষয়, তুমি প্রজ্ঞা উপার্জন কর, সমস্ত উপার্জন দিয়া সুবিবেচনা উপার্জন কর।"

পরকীয়া স্ত্রী কেমন ? শলোমন বলেন, "পরকীয়া স্ত্রীর ওষ্ঠ হইতে মধু ক্ষরে, তাহার তালু তৈল অপেক্ষা স্নিগ্ধ ; কিন্তু তাহার শেষ ফল নাগদানার ন্যায় তিক্ত, দ্বিধার খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ।"

শলোমনই বলেছেন, "পরকীয়া স্ত্রীর কুচযুগ দ্বারা কখনও তুমি আপ্যায়িত হইবে না।"

সম্রাট আনাথকে পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে এই কক্ষ ত্যাগ করবেন ভাবলেন। বাইরে অতি স্বচ্ছ হাল্কা বেগনি-সাদা চাঁদ অমরাবতীর তীরে যেন উদিত হয়েছে। ইলোহে যেন সেই চন্দ্রিকাকে চুম্বন করিয়া আকাশপথে ছাড়িয়া দিয়াছেন। মরু-তমিস্রা কোথায় সরিয়া গিয়াছে, রুধির-লিপ্ত মরু সব অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়া গ্যালিলি হ্রদের জলে চাঁদের বিম্ব ফেলিয়া ঝিলমিল করিয়া হাসিতেছে। বাতাসে কিসের শব্দ শুনা যাইতেছে ? কোথাও মরু-শেফালিকা ফুটিয়াছে, হ্রদের জলে দু' চারিটি শ্বেতপদ্ম ফুটিয়া উঠিল। বাতাস গবাক্ষ বহিয়া আসিয়া একটি ঝাপটা দিয়া আনাথের বুকের বসন সরাইয়া দিল।

এই বাতাস সন্দেহজনক। এই বাতাস লোতকে খাইয়া থাকিবে। এই বাতাস ইগারকে দুঃখ দিয়াছে। ওই চন্দ্রকলায় উরিয়-হত্যা হইয়া থাকিলে থাকিতে পারে। বাতাস আরও ঝটকা দিয়া আনাথের কুচযুগকে পদ্মকলিকার ন্যায় প্রকাশ করিয়া দিল। চাঁদের আলো ফালি কাটিয়া বুকে তির্যক হইয়া লুটাইয়া পড়িল। সম্রাটের স্ফটিক-কয়রা চক্ষু জোনাকির সবুজ আলোর মতো দাপাইয়া উঠিল। মুহূর্তে তাঁহার প্রজ্ঞা বধির হইয়া গেল। আনাথের ওষ্ঠ হইতে মধু ক্ষরিতে লাগিল।

শলোমন আনাথের উপর ঝুঁকলেন। তাঁর মনে হল, তিনি আনাথের বুকের বিচ্ছুরিত আলো মুঠোয় ধরবেন। তাঁর দুই চক্ষুর অভিপ্রায় কী ? আলোকে স্পর্শ নাকি আনাথের ওষ্ঠমধু পান করা ! আর্যনারীকে গমন করার কোনও অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। অবশ্য রাজার দুহিতাকে ধর্ষণের আনন্দ তাঁর জানা নেই। কুচযুগ এখনও বালিকার ন্যায়, বিলাল যে ওই স্তন্য পান করেছে, কিছুতেই তা মনে হয় না।

সম্রাট হাত বাড়ালেন। পায়ের পাদুকা খাটের তলায় পা থেকে খুলে সন্তর্পণে ঠেলে দিলেন। আনাথের বুকের আলোর মধ্যে সম্রাটের ডান হাতখানি শূন্যে অবগাহন করছিল, তখনই আঙুলগুলি অঙ্গারে ঝলসে গেল ; কণ্ঠে অত্যন্ত চাপা কাতরোক্তি করলেন সম্রাট। সংবিত ফিরল আনাথের। সভয়ে সে সম্রাটের হাত দু হাতে আঁকড়ে ধরে ডুকরে উঠল— আমার বিলাল কোথায়, ওকে তুমি কেন ওষুধ দিয়ে বাঁচালে, শিশুর পরমায়ু চুরি করে বাঁচবে বলে ! তোমার এত লোভ ! তুমি চোরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ পাপী ! তুমি ঘাস, তোমার হৃদয় আজ ঘাস হয়ে গেছে। তুমি কয়িনকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ! মামা আমাকে বলে গেছে, বিধবা হলে, আমি হব জাদুকায়া। আমার চোখের জল মহার্ঘ সম্রাট।

বলতে বলতে আনাথ কান্নার চাপ সহ্য করতে না পেরে সম্রাটের হাতের উপর তার একটি চক্ষুকে চেপে ধরল। শলোমনের দগ্ধ আঙুল আনাথের চোখের জলে ভিজে শীতল হয়ে আসছিল।

—আমিই তোমার ভবিষ্যৎ বলব রাজচক্রবর্তী। আমি তোমাকে ছাড়ব না। তুমি আমার শিশুর পরমায়ু চুরি করে বেঁচে থেকেছ ; যাও অনেক মহিষী আছে তোমার, কত উপপত্নী, কত দাসী, কত হারেম ভর্তি যুদ্ধের পাওনা মেয়েমানুষ ! বলেই সম্রাটের হাতের উপর থেকে মুখ তুলে সম্রাটকে ছেড়ে দিয়ে বুকের কাপড় সামলে তুলল আনাথ। অতঃপর উপুড় হয়ে খাটে পড়ে ফোঁপাতে থাকল।

সম্রাট অন্তঃপুর ত্যাগ করলেন। তার আগে একটি ভুসো কালি-পাথর দিয়ে দ্রুত হাতে তিনি গৃহের দেওয়ালে অসুরদের যুদ্ধ-প্রতীক উল্কিছাপ এঁকে দিলেন, যা সহজেই চোখ মেললে আনাথের চোখে পড়তে পারে। তারপর সাদা অশ্বে ছুটে চললেন দাউদ নগরের দিকে। পথের দু'পাশ থেকে কুকুরের মতো ডেকে উঠল অজস্র ডাক-হরিণ। কী তীব্র সেই আর্তনাদ!

পথেই পড়ল একটি মরূদ্যান। সেখানে নেমে পড়লেন সম্রাট। তীব্র স্পষ্ট চাঁদের আলো। চেয়ে দেখলেন সমস্ত মরূদ্যান জুড়ে মাটির উপর সদ্যোমৃত অযুত মৌমাছি চিত-উপুড়-কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। কী মর্মন্তুদ দৃশ্য। এই দৃশ্য সহ্য করার মতো হৃদয়ের জোর সম্রাটের ছিল না। কী করে মরল এরা? একটি মান্নাবৃক্ষ-কে দেখতে পেলেন শলোমন। ঠিক তার পাশের বৃক্ষটিকে চিনতে পারলেন না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর বুঝলেন, এ সমস্তই লাল মরুর গাছ, লবণাক্ত। মৌমাছিরা এই গাছের রস ও মধু নেয় না। সমস্ত মৌমাছিই না খেয়ে মরেছে। মরব, তবু গ্রহণ করব না। এ যদি ক্ষুদ্র মধুপের কথা হয়, তা হলে....

দু' হাতে মুখ ঢেকে মহাআর্তস্বর করে উঠলেন শলোমন। সেই নিঃসঙ্গ কণ্ঠ চাঁদের গায়ে ধাক্কা লেগে মহানীহারিকায় মিলিয়ে যেতে লাগল। রামাসিস অতি ঘন তীক্ষ্ণ হ্রেষায় সম্রাটের সঙ্গে কেঁদে উঠল।

নিজেকে কেমন পাগল পাগল লাগছিল শলোমনের। তিনি নিজেকে আর বিশ্বাস করতে পারছেন না। কাউকেই তিনি আর বিশ্বাস করেন না। হাবিল ইশ্মায়েলকেও সন্দেহ করেন তিনি। কারণ বনি ইস্রায়েলকে কেউ বিশ্বাস করে না। তিনি এই কেনানে অনুপ্রবেশকারী, প্রবঞ্চক।

আর্যনারী আনাথ কখনও শলোমনের হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করবে না। কখনও বিশ্বাস করবে না সম্রাটের হৃদয় সত্য বলতে পারে! প্রেম এবং যুদ্ধের দেবী আনাথ। এই মরুমর্ত কেমন এক দেবীকে রচনা করেছে প্রভু! দেবী আনাথের প্রেমও তো অবৈধ হে ইলোহে!

শলোমনের বিস্ময়কর সৌন্দর্যের দিকে মরুমর্তের সুন্দরী নারীরা ব্যাকুলচিত্তে প্রেমে আর্দ্র হয়ে চেয়ে থাকে। বৎসেবা বলেন, আমার শান্ত (অর্থাৎ শলোমন) মহাজ্ঞানী যোশেফের মতো সুন্দর এবং রূপবান। যদি মিশরের প্রতিটি রাজকন্যার হাতে একটি ছুরি এবং একটি ক্ষুদ্র নরম ফল ধরিয়ে দিয়ে কাটতে বলা হয়, শলোমনের রূপের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তারা নিজেদের আঙুল কেটে ফেলবে। যোশেফের ক্ষেত্রে ঠিক যেমনটি হয়েছিল! কাবুসের কন্যারা, তাদের নিজ নিজ আঙুল কেটে ফেলেছিল।

মৃত মৌমাছিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের পায়ের দিকে চেয়ে দেখে আঁতকে উঠলেন শলোমন। সদাপ্রভু তো তাঁকে যোশেফের মতো সর্বাঙ্গসুন্দর করেননি; আনাথ কি তা হলে তাঁর অতি অসুন্দর পা দু'খানি দেখে ফেলেছে! এল্-ইলোহে-ইস্রায়েল কি তাঁর পা দু'খানি মরুভূমিতে গোপন করার জন্য দিয়েছেন; তাঁর পদচিহ্ন কি জন্তুর মতো? তিনি কেন আজ অবধি খালি-পায়ের ছাপ পিছনে ফিরে চেয়ে দেখতে পারেন না? কেন?

ভয়। তাঁর ভয় করে। পা দু'খানি সেই কবে থেকে হেঁটে আসছে। উর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। তারপর আবার এক দিন মিশরের বন্দীদুর্গ এলিফেন্টাইন থেকে

চলতে শুরু করে জিরুজালেমের দিকে। শুধু পা। শুধু এল্। কেবলমাত্র আলিফ। রক্ত আর বালি আর ঝড়। থেঁতো, মরু-ঈগলের থেঁতলানো ডানার মতো। বিধ্বস্ত রক্তমাখা, কুৎসিত পা। শরীর নেই, হৃদয় নেই।

শলোমনের মনে হল, তাঁর শরীর থেকে পা দু'টি ছায়ার মতো বেরিয়ে চলে গিয়ে সুতীব্র জ্যোৎস্নার ভিতর দাঁড়ালো। তারপর মরুভূমির ভিতর চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কখনও দিগন্তের দিকে চলে গেল, কখনও দিগন্ত থেকে ফিরে এল। দু'খানি ছায়াকাঠি যেন নেচে বেড়াচ্ছে মরু-প্রান্তরে। পায়ের পাতার দিকে চোখ পড়বা মাত্র শলোমন ভয়ে আর্তস্বর করে ওঠে।

এই পা দু'খানি যেন মরু-আলেয়ার মতো শলোমনকে ডাকছে। চল, চল, ওই দিকে দেবস্থান, যিবুষের মাটি। মন্দির না গড়লে মাটি কায়েম হয় না। উৎপাটন না করলে প্রতিষ্ঠা হয় না। যুদ্ধের দেবী তোমার পায়ের দিকে চেয়ে রয়েছে। কিন্তু সেই দেবী কী করে আমার চোখের দিকে চাইবে?

আনাথ যে আমার চোখের দিকে চাইতে পারেনি। একবার অন্তত তোমার চোখের সামনে নগ্ন হতে চাই আমি। তুমি আমার পায়ের দিকে চেয়ে ঘৃণা করবে আর চোখের দিকে চেয়ে ভালবাসবে। আনাথ, আমি কেন যুদ্ধের নিয়ম এবং প্রেমের নিয়ম বেঁধে দিয়েছি? মরুভূমি তো কখনও যুদ্ধ আর প্রেমের জন্য নীতি প্রস্তুত করেনি, কখনও সে হৃদয়কে সত্যের পালকে ওজন করেনি।

কেন আমি হৃদয়কে আবিষ্কার করতে চাইছি। একটি সুন্দরী নারীর পক্ষে আমার রূপই কি যথেষ্ট নয়? জ্ঞান কেন মানুষের হৃদয়ের মধ্যে আশ্রয় চায়? মানুষের জ্ঞানের পরিধি জানবার জন্য কি হৃদয়কেই ওজন করবেন ঈশ্বর? জ্ঞানী কেন রূপবান হয়? আমি কেন এত সুন্দর হলাম বৎসেবা? কেন তা হলে আমার পা দু'টি এত কুৎসিত হল?

—এত হাহাকার কেন পুত্র! তোমার জ্ঞানকে প্রতিনিয়ত দুঃখ দেবার জন্যই পা দু'টি অমন কুৎসিত করেছেন যাকোবের ঈশ্বর!

—কে তুমি?

—চেয়ে দ্যাখো, আমি দেবতা এল্!

শলোমন চেয়ে দেখলেন, তাঁর নিজেরই পা দু'টি সামনে মরুতে পুঁতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পা দু'টির উপর বসে রয়েছে একটি মাথা-অলা বৃষ-স্কন্ধ। কী বীভৎস সেই ছবি! সেই ছবির দিকে চেয়ে থাকতে গেলে বুকটা নিমেষে শুকিয়ে যায়। ভয়ে শলোমন দু'হাতে মুখ ঢাকেন।

বুকের মধ্যে অনুভব করেন আশ্চর্য কঠিন তৃষ্ণা। এত খাঁ-খাঁ-তৃষ্ণা কখনও শলোমনকে ব্যাকুল আর অসহায় করেনি। মনে হল, তিনি আর কোথাও যেতে পারবেন না, তাঁকে আনাথের কাছে ফিরে গিয়ে তৃষ্ণার জল চাইতে হবে।

অন্য কোনও স্ত্রীর কাছে শলোমন কি যেতে পারেন না? কার কাছে যাবেন? যেতে কি পারেন না কোনও হারেমে? কোনও পত্নী আজ তাঁকে আকর্ষণ করে না। তাঁদের তিনি বিয়ে করেছেন শুধুমাত্র সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য। যে-নারী কখনও তাঁকে প্রতিহত করেনি, যে কখনও দুর্লভ নয়, শলোমনের মতো সম্রাট সেই নারীতে কোনও টান অনুভব করেন না।

নারীদেহ যেন ঈশ্বরের মতো দুর্লভ হয়, যেন সেই দেহ জ্ঞানের মতো সূক্ষ্ম হয়, তার সৌন্দর্য যেন অচেনা সুগন্ধির মতো ললিত হয় ; নারীদেহ যেন বলিপ্রদত্ত হোমাগ্নি ঝলসিত পশুমাংসের মতো শস্তা না হয়। তার রূপের মধ্যে মেশানো হবে অপার্থিব বিস্ময়। উগ্রতা আর স্নিগ্ধতার মিশেল হবে এমন অনুপাতে যে তার এক চোখে থাকবে যুদ্ধ, অন্য চোখে প্রেম। নারীর পরাস্ত সমর্পণ পদদলিত লতার মতো উপেক্ষা করেন শলোমন।

তার কুচযুগ উদ্ধত এবং অসি অপেক্ষা তীক্ষ্ণ কিন্তু চোখে তার কখনও মেঘের সুবর্ণমুকুটের আলো এবং কখনও ছায়াঘন প্রশান্ত নীলিমা। কখনও তাকে চেনা মনে হয় না। সেই অবৈধ অচেনা হাত থেকেই তৃষ্ণার জল চাইছেন শলোমন। নিজেকে তাঁর আশ্চর্য কাঙাল মনে হচ্ছিল।

কিন্তু আনাথের কাছে ফিরতে পারলেন না শলোমন। তাঁর অশ্ব দাউদ-নগরের দিকে ছুটে চলল। যে-হারেমে কখনও তিনি আসেন না, সেই পুরনো হারেমের সামনে এসে দাঁড়ালেন এই মধ্যরাতে। এখানেই কি রিদি হিব্রোন রয়েছে ?

কী বিপুল বিস্ময়কর শলোমনের হৃদয়। এই রাত্রে রিদিকেই তাঁর মনে পড়ে গেল। রিদি আর আনাথ কতটা এক, সেই বিচার করাটা এই রাতে জরুরি মনে হল সম্রাটের। তিনি এসেছেন শুনেই মেয়েরা প্রস্তুত হয়ে গেল, তারা নিজেদের কাছ থেকে রাজাদের গোপনে বিদায় করে দিল। এখানকার প্রহরী সম্রাটকে নিয়ে এল বাছা বাছা মেয়েদের কাছে, যাদেরকে রাজারা সহজে স্পর্শ করতে পারে না।

একটি নির্দিষ্ট কক্ষে ঢোকার আগে গলিতে দাঁড়ানো একটি নগ্ন মেয়ে ডেকে উঠল—আমার কাছে সম্রাট দাউদ কখনও আসেনি, তুমিই এসো প্রিয় সারগন। দাউদ ছোঁয়নি, বিশ্বাস কর।

শোনা মাত্র শলোমনের মাথার মধ্যভাগ বজ্রের মতো ঝিকিয়ে উঠল। ঠিক এই কথা কি শুনতে হবে আরও ?

শলোমন গম্ভীর গলায় প্রহরীকে শুধালেন—রিদি হিব্রোন কোথায় থাকে ?

—তার কাছেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি হুজুর।

—আচ্ছা, দাঁড়াও। এটা কার ঘর ? কে আছ ? দোর খোলো।

—কে তুমি ?

—আমি অম্মোন।

—হবে না। বলেই ঘরের ভেতরের মেয়েটা দোর সশব্দে এঁটে দিল।

—ওই দেখুন মহারাজা, দোরের কাছে মুখ বাড়িয়ে আপনাকে দেখছে রিদি।

—হ্যাঁ, তুমি যাও। আমি দেখেছি। আমি অম্মোন রিদি হিব্রোন। তুমি আমাকে চিনতে পার ?

—কেন পারব না ? এসো মহানুভব। দাউদ-হারেমে কেন এলে তুমি। আমি কেবলই তোমার কথা ভেবেছি। রোজই রাজাদের বলতে হয়, আসুন মশাই, আমাকে দাউদ ছোঁয়নি। কেন বলতে হয়, মহাজ্ঞানী শুলায়মন ?

দোরের কাছে এসে ভেতরে একটি পা ঢুকিয়ে থেমে পড়লেন শলোমন। বললেন—মাফ করে দাও মেয়ে। আমিই দাউদ। আমি তোমাকে স্পর্শ করব না। চলি।

শলোমন তাঁর লম্বা পা ফেলে বাইরে চলে এলেন। মনে হল, তাঁর পাপ সম্পূর্ণ হয়েছে। মহাপাপের রাত্রির অন্ত্রে তিনি প্রবেশ করেছেন। তাঁর হৃদয় তাঁকে আর কোনও সংকেত দেয় না। যুদ্ধের খাদ্য এই মেয়েরা, এদের দেহে যৌন-প্রহারে মানুষের চোখে কি জল আসে না ? অবশ্য এরা কি কখনও কষ্ট পেতে জানে ? কখনও কি বুঝবে রিদি হিব্রোন, কেন শলোমন তাঁর কাছে এসেছিলেন ? কেনই বা স্পর্শ না করেই ফিরে গেলেন ?

—মা, খেতে দে মা।

—যুদ্ধ কেন হয় না বাছা রে। যুদ্ধই মহৎ জিনিস, ও নইলে বেশ্যা বাঁচে না। কী খেতে দেব তোকে। কফন, কফনে শুই গিয়া, চ, যাবি ? আহ্ হাঁকরাও কেন মিনসে, পা-খানা পচে যাচ্ছে, দাউদের ঘা কি সহজে শুকায়, কাঁদো, কাঁদো, বালদেব দেখুক, কী সুখ। কী আনন্দ মোদের। যে দেশের রাজা বেশ্যাবাড়ি আসে, তার মুখে ঝাঁটা। মন্ত্রী-যন্ত্রী সব শালা আগুনখোর, সব....এই সারগন বেশ্যাখানার গালভরা নাম দিয়েছে হারেম। এই সারগন বিদ্যালয় গড়েছে। বিদ্বান রাজা, জ্ঞানী রাজা, থুঃ।

—অ্যাই চুপ।

—তুমিও নাকি রাজার বেটা। চুপ কেন করব রে। বেধবা আর বেশ্যার মিছিলে ভরে গেল কেনান। এইডে হল নাকি দুধমধুর দ্যাশ। থুঃ।

—আবার থুঃ।

শলোমনের মনে হল, ওই রূপাজীবা তাঁর গায়ে থুতু ফেলল ঘরের গবাক্ষ দিয়ে। সম্রাট চমকে উঠলেন। তা হলে কিসের ভিতর দিয়ে চলেছেন সম্রাট ? এই মরুভূমি কেন এত পঙ্ক-জটিল, কেন এত ক্ষুব্ধ, ওই ইতর-যন্ত্রণার অবসান কোথায় ? এত ঘৃণা এখানে ?

আমাকে শুদ্ধ কর ইলোহে। আমাকে দেখা দাও হে জ্যোতির্ময়। আমার হৃদয়কে আর যুদ্ধের খাদ্য করো না। আমি শিশুর পরমায়ু চুরি করে বেঁচে রয়েছি। আমাকে ক্ষমা কর প্রভু।

সারারাত পাগলের মতো অশ্বপৃষ্ঠে মরুভূমিতে ছুটে বেড়ালেন মহা সারগন শলোমন। কিছুতেই তাঁর চিত্ত শান্ত হল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, কয়িনের দেখা পেলে তিনি তার হাতে আনাথকে তুলে দিতেন।

—সত্যিই কি দিতে তুমি শলোমন ?

—কে ?

ওই সেই কুৎসিত পা এবং ষণ্ডমূর্তি ; কুকুরের মতো ডাকছে হরিণেরা। রাত শেষ হয়ে আসছে। এই মরুভূমিতে কি কোথাও তৃষ্ণার জল নেই ? আনাথের নগ্ন বুকজোড়া হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল। আনাথের শরীর তীব্রভাবে শলোমনকে টানতে থাকে। কখন প্রত্যুষ হয়। সম্রাট ফিরে আসেন গ্যালিলি হ্রদের তীরে।

ঊষার প্রথম আলো লেগেছে পালঙ্কের প্রান্তে বসে থাকা আনাথের চুলে। সে চেয়ে রয়েছে দেওয়ালের অঙ্কিত অসুরীয় তরোয়ালের দিকে, এই উল্কিছাপ ছিল কয়িনের বুকে। সম্রাট এই জিনিস আঁকলেন কী করে ? কেন আঁকলেন ?

—তোমার স্বামী একজন অসুর ?

—না। হিত্তীয়। বলে পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল আনাথ।

—কোথায় সে ?
—জানি না।
—কে জানে ? গালিয়াৎ ?
—তা-ও জানি না।
—তুমি লুকচ্ছো।
—আমি তো আমার সন্তানকেই লুকিয়ে রাখতে পারিনি সর্বদর্শী ভগবান !
—আমি ঈশ্বর নই আনাথ। তবে আমি ঈশ্বরপুত্র অবশ্যই। আমি সৃষ্টির শুরুতে একা ঈশ্বরের কোলে খেলা করতাম। সেই থেকেই আমি নিঃসঙ্গ।
—তোমার কাঙালপনা দেখে আমার খুব লজ্জা করছে মহারাজা। ঘাতক তো নিঃসঙ্গই হয় শুনেছি ! আমি জানি, কয়িনকে তুমি হত্যা করেছ।
—না, না ! বিশ্বাস কর ! আমি মৌমাছিদের মৃত্যুও সহ্য করতে পারি না। আমি সারারাত কোথাও শান্তি পাইনি।
—আমি জানি মৃত্যু ছাড়া কোথাও শান্তি নেই। তুমি কি আমার কাছে শান্তি চাও ? একমাত্র নিষ্ঠুর সম্রাট ছাড়া এই প্রস্তাব কে করবে। চাও তো দেহ। মাত্র একবার ভোগ করলেই আমি তোমার কাছে পুরনো হয়ে যাব। তুমি আব্রাহামের বংশ-শুদ্ধি, তোমাকে চিনি।
—কী বলছ।
—হ্যাঁ। আমি ইগার এবং বৎসেবার মতো উর্বর। রাজকন্যাকে তুমি দাসী বানাতে চাও। কোলে সন্তান দিয়ে মরুভূমিতে নির্বাসন দিতে চাও। আর আমি ? তোমার প্রেমে কাল কাটাব, চোখের জল ফেলব ! আমি দাসী ইগার নই মহাপ্রভু। আমি আস্কিলনের আর্যরাজ সিমনের পুত্রী, দাউদের চিরশত্রু আমি। আমার বাবাকে বধ করলে, আমার স্বামী ও পুত্রকে শেষ করে দিলে। তারপর শান্তি চাও আমারই কাছে। আমি কি বৎসেবা ? নিশ্চয়ই তোমার জ্ঞানের খুব তারিফ করতে হয় মহারাজা। গালিয়াৎকে তোমার ছায়ার দাসত্ব দিয়ে ধন্য করেছ। তাই না ?
—সমস্ত যুদ্ধ এবং হত্যার পরিণাম বুঝি আমি ?
—তুমিই বললে, ঈশ্বরের প্রথম শিশু তুমি ! আব্রাহামের আগে জন্মে তুমি ঈশ্বরের কাছে ছিলে, এসেছ অনেক পরে। কেন ? আমার শিশুকে হত্যা করবে বলে ?
—ঈশ্বর চাইতেন বলেই আমি....
—আসলে তুমি কে ?
—জানি না আনাথ। আমি তোমার শিশুর পরমায়ু চুরি করা চোর। আমি এই আয়ু নিয়ে এখন কী করব ?
—মন্দির।
—হ্যাঁ, মন্দির। ঠিক আছে। কিন্তু কয়িন যদি আমার সাম্রাজ্যের সমস্ত গোপনীয়তা আসিরিয়ায় পাচার করে দেয় ?
—জানি, তুমি যার কাছে শান্তি চাও, তাকেও বিশ্বাস কর না।
—আমার জ্ঞান আমাকে অবিশ্বাসী করেছে আনাথ। অথচ ওই জ্ঞান দিয়ে ভালবাসা পাওয়ার কথা ছিল।
—আমি তোমাকে বুঝতে চাই না সম্রাট। বুঝতে পারি না, কী করে তুমি

ছাগশিশুকে কোলে তুলে নিয়ে দুধ খাইয়েছিলে। তুমিই আমার শিশুকে ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়েছিলে ! সেই তুমি....আমি জানি, আমার শিশু তোমার কাছেই রয়েছে। দাও, ফেরত দাও আমাকে। আমার বিলালকে ফিরিয়ে দাও মহানুভব !
বলতে বলতে আনাথ সম্রাটের পায়ের তলায় পড়ে গেল। শলোমন দ্রুত হাতে আনাথকে ধরে ফেললেন এবং অর্ধ-অচৈতন্য আনাথকে পালঙ্কে শুইয়ে দিতে গিয়ে লক্ষ করলেন, আনাথের পিছল মসৃণ সাদা পোশাক গা থেকে সরে চলে গেছে। তার দেহ অবারিত, কুচযুগ স্ফুটিত শ্বেতপদ্মের মতো স্নিগ্ধ এবং পবিত্র। শলোমন ভয়ে দু'হাতে নিজের চোখ ঢেকে ফেললেন। বসন দিয়ে ঢেকে দিলেন আনাথের হৃদয় এবং দ্রুত পালিয়ে এলেন ঘর থেকে। ঊষার আলোয় সম্রাটের দুই চোখ ডুবে গেল। রামাসিসের দুই চোখে সূর্যোদয় হচ্ছে।
একটু বাদেই সম্রাটের সাদা ঘোড়া মালাটিয়ার দিকে সম্রাটকে নিয়ে ছুটে চলল। যেতে যেতে শলোমন লক্ষ করলেন, সামনে একটি কালো ঘোড়া আরোহী নিয়ে ধাবিত। এই প্রত্যূষে যেন কোনও মৃত্যু কালো পোশাকে সামনে সামনে চলেছে, ও কি কোনও ছায়া-সারগন ?
—কে যায় ? ওহে, কে যাও, তুমি ?
উত্তর আসে না। কালো মূর্তিকে সম্রাট নাগাল করতে পারেন না। দৃশ্যটা বিস্ময়ের, কারণ একটি সাদা ঘোড়া একটি কালো ঘোড়াকে অনুসরণ করছিল।
এক সময় চোখের সামনে থেকে কালো অশ্ব যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। সম্রাট মালাটিয়ার প্রাচীরের কাছে এসে থামলেন। এই প্রাচীর মালাটিয়াকে সুরক্ষিত রেখেছে। এখানে রাজা ইষানুল দ্বিতীয় সৈন্য দিয়ে প্রাচীরদ্বার কড়া নিরাপত্তায় সজ্জিত রাখে। বাইরের লোক ঢুকতে পায় না। শলোমনের সৈন্যরা দল বেঁধে ঢোকে না কখনও। ইষানুলের সঙ্গে শলোমন এই ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ, শহরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সারগন কখনও হস্তক্ষেপ করবেন না।
মালাটিয়ায় যে লোহার পাত প্রস্তুত হয়, তা খাদ্যশস্য ও অন্যান্য সুবিধার বিনিময়ে ইষানুল শলোমনকে সরবরাহ করে। পাতগুলি শলোমনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কেনানের অস্ত্র কারখানায় বয়ে নিয়ে যায়, সেই অস্ত্রের প্রাথমিক চেহারাটা মালাটিয়াতেই তৈরি হয়ে থাকে। শলোমনের কারখানায় কেবল সেই অস্ত্রগুলিতে বাড়তি শান পড়ে এবং চকচকে হয়ে ওঠে। লৌহবিদ্যার গোপন সূত্র আজও পাওয়া গেল না।
শলোমন বলেছেন—আমি তোমার ওপর বলপ্রয়োগ করতে পারি ইষা। যদি কখনও শুনি তুমি আর্যদের কাছে অস্ত্র চালান করেছ অথবা অন্য জাতির কাছে অস্ত্র গেছে, আমি তোমাকে ছাড়ব না।
—সবই কি আপনার অলক্ষ্য সম্রাট ? আপনার মন্ত্রী জানেন কোন্ কারখানায় কত উৎপাদন হয়। জানেন না ? তাছাড়া ছায়ামূর্তি কিংবা স্বয়ং আপনি সারাক্ষণ নজরদারি করেন, তারপর চোখ রাঙাবেন, তা তো হয় না। আমার আনুগত্য সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ থাকা উচিত না।
—লোহা বানাবার কৌশল তুমি কি কোনও মূল্যেই আমাকে দিতে পার না ?
—না।
—কেন ?

—এ আমাদের জাতীয় বিদ্যা। আপনি বড়জোর আমার কারিগরদের হাতের আঙুল কেটে দিতে পারেন।

—শলোমন কখনও জ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য কারও উপর জুলুম করে না ইষানুল। তাছাড়া জ্ঞানকে বিনষ্ট করার হিংসা আমার নেই। জ্ঞান আমি প্রার্থনা করতে পারি মাত্র।

—জানি, জ্ঞানীরা সেই রকমই বলে থাকেন। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দাবিয়ে রেখে ব্যবহার করার বুদ্ধিই রাজকৌশল মহামতি। শুনেছি উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যকে মুঠোয় ধরেন যিনি, তিনিই সম্রাট।

—জ্ঞানীকে দাস এবং সুন্দরীকে দাসী বানানো পরাক্রান্ত সম্রাটের কাজ বলে শুনেছি। কিন্তু হাতের মুঠোয় ধরতে চাওয়াটা দুর্মতি নিঃসন্দেহে। কারণ উন্নত জ্ঞান এবং উচ্চ সৌন্দর্য সেই মুঠো থেকে ফসকে মরুতে পড়ে যায়। শোনো ইষা, তুমি রাজা, আমার ছত্রচ্ছায়ায় তুমি খুশি নও জানি, কিন্তু জ্ঞানীর শাসনের চেয়ে অস্ত্রের শাসন উত্তম নয়।

—কী বলতে চান?

—ঈশান কোণে মেঘ জমে উঠছে। আমার পতনের সঙ্গে তোমারও সৌভাগ্যের সূর্যাস্ত হবে। সুরাসুর এবং আমার জ্ঞাতিরা ঐক্যবদ্ধ হতে চাইছে, সুরের অত্যাচার ভুলে যেও না, অসুরের অসিও অনেক নৃশংস। জ্ঞান যে প্রার্থনীয় তা বোঝার ধৈর্য এই মরুভূমিতে কোনও নৃপতির কখনও ছিল না। তোমাকে ছিন্ন করার জন্য আমার অধৈর্য কি যথেষ্ট নয়?

—আপনি শান্ত বলেই আমার এত আস্ফালন মহারাজা! বরং আপনি আমাকে হত্যা করে লৌহবিদ্যা করায়ত্ত করুন। আমার ছিন্ন মুণ্ডকে মরুভূমির খুঁটায় ঝুলিয়ে দিন।

—সমুদ্রের জলও পারে না সমস্ত বালিকে হজম করতে। তুমি বৎসেবার স্নেহধন্য, তোমাকে দ্রবীভূত করা যায় না ইষানুল।

—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন মহানৃপতি শুলায়মন! লোহা এবং ঘোড়া আপনার জন্য মাতৃদান। দাতা যতটুকু দেন তাই-ই দান, যতটুকু দেন না তা অদেয় বলেই দেন না। অবশ্য আপনি কেড়ে নিতেই পারেন।

—মায়ের অনুগ্রহই আমার জীবন ইষানুল খেতা। এই জন্যই আমি ইলোহের কাছে পরমায়ু প্রার্থনা করিনি। তোমার মতো ক্ষুদ্র পরাহত কোনও রাজা নয়, জ্ঞানই আমাকে মালাটিয়ার এই প্রাচীরের কাছে এনে প্রতিহত করে ফিরিয়ে দিয়েছে।

—একে আমি শুলায়মনের দয়া বলে মনে করি।

—তোমার বিনয় এবং অহংকারের মাত্রা আমি বুঝতে পারি না হিত্তীয়! লৌহবিদ্যার জন্য তোমার কাছে আমি আমৃত্যু নতজানু হব।

—ক্ষমা করুন ইস্রায়েল! আমি পায়ে পড়ি! বলে শলোমনের পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল ইষানুল খেতা।

প্রাচীরের দ্বারের দিকে চেয়ে চোখে কেমন অকারণ জল এসে পড়তে চাইছিল শলোমনের। ক্রোধ, অপমান, অসহায়তা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। ইষানুলও তাকে বিনয়ের ছলে কামড়ে দেয়। মালাটিয়ার দ্বারে পৌঁছেও তাঁকে ভিতরে ঢোকার জন্য

ইষানুলের অনুমতি চাইতে হয়! দ্বারীকে বলতে হয়—রাজাকে গিয়ে বল দাউদের ছেলে দেখা করতে চাইছে।

অশ্ব আর লৌহসভ্যতা বৎসেবার দান। তার জন্য শলোমনকে মালাটিয়ার প্রাচীরে মাথা কুটতে হচ্ছে। কেমন মহারাজা রাজাচক্রবর্তী তিনি, কিছুই যেন তাঁর হাতের মুঠোয় ধরা দেয়নি! সবই যেন হাত ফসকে মরুভূমিতে পড়ে যাচ্ছে। জ্ঞানীর শাসনকে এই কেনান পদাঘাত করে।

সবুজ এবং কালো ছায়ামূর্তি দু'পাশে এগিয়ে এল। শলোমন জানেন না, কাকে এতক্ষণ তিনি অনুসরণ করে এলেন!

—কাবিল গালিয়াৎ! তুমি ঘোড়া থেকে নেমে গিয়ে দ্বারীর কাছে অনুমতি চাও। আর তুমি হাবিল ইশ্মায়েল, আরও কাছে সরে এসো। অনুমতি পেলে তুমিই ঢুকবে।

দুই ছায়ামূর্তিই সম্রাটের কথা মতো সচেষ্ট হল। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল গালিয়াৎ। ইশ্মায়েল সম্রাটের কাঁধের কাছাকাছি অশ্বপৃষ্ঠে সরে আসতে গিয়ে থেমে গেল চার দণ্ড, তার ঘোড়া এগোতে গিয়ে ছলবল করে উঠছিল। ঠিক তখনই ইশ্মায়েলের মনে এক আশ্চর্য জিঘাংসা জেগে উঠল, যেন তার মনের আকাশ কিসের আঘাতে চিরে চলে গেল। কেন এমন হল! রৌদ্র ঝলমল করছে পাথুরে বালি ছড়ানো ভূমিতে। গাছপালার ফাঁকে সূর্যদেব শামসের ঝিলিমিলি চোখে এসে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল মাথার মগজ।

সামনের এই সাদা ঘোড়ার আরোহী একজন ভিখিরি এবং চতুর, একে খুন করে দাও। এ কথা কেন জাগল মনে ইশ্মায়েল ভেবে পেল না। তারপর নিজেই মনে মনে খুব সংকুচিত হল।

—ইশ্মায়েল কখনও কারও ছায়া হতে পারে না। আমি অধিকার-বঞ্চিত, কিন্তু অভিশপ্ত নই। মনে করি না, আমি অভিশপ্ত। আমি বনি-ইস্রায়েলের যোশেফকে কূপ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। আমারও চাই কালো মাটির অধিকার। কিন্তু শলোমনের কী হবে! ভাবতে ভাবতে হাবিল ইশ্মায়েল সম্রাটের কাঁধের কাছে সরে এল।

সম্রাট তাঁর ইশ্মায়েল-বংশীয় ছায়াটিকে বললেন—শোনো হাবিল, কয়িন একজন পলাতক অসুর। আসলে খবর সংগ্রহ করতে এসেছে। আনাথের হাবভাব, বক্তব্য সবই এ কথা সমর্থন করে। যাও, আত্মদান কর অথবা হত্যা কর।

—কোথায়?

—ইষানুল ওকে কারখানার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে! তুমি প্রবেশ কর।

—কী আশ্চর্য! আপনি একজন হিত্তীয়কে হত্যা করতে বলছেন মহানুভব! আনাথের কী হবে মহামতি!

—তুমি হত্যা না করলে তোমাকেই নিহত হতে হবে ইশ্মায়েল! আমি হত্যার হুকুম দিচ্ছি না, তোমাকে আত্মরক্ষা করতে বলছি।

—হত্যা নয়, আত্মরক্ষা!

—কারণ কেউ আক্রমণ করলে তবেই তুমি প্রতি-আক্রমণ করবে। প্রতি-আক্রমণের ফলে প্রতিপক্ষ নিধন হতে পারে। আমার সংহিতায় ওই নিহতের জন্য আমি শোক প্রকাশ করব, কিন্তু আমার সঙ্গীত কখনও অপবিত্র হবে না। যে আত্মরক্ষার কৌশল জানে না, সে কখনও জ্ঞানী নয় ইশ্মায়েল!

—আপনি রাজা ইয়ানুলকে বলুন, উনি কয়িনকে বার করে দিন, আমি কয়িনকে মরুভূমির প্রান্তরে বধ করতে চাই।

—তুমি দ্বিধা করছ কেন ? আমার কথা কি বিশ্বাস কর না হাবিল ! তুমি কি আত্মরক্ষা সম্মানজনক মনে কর না ?

ইশ্মায়েল তখনও ইতস্তত করে। তার ঘোড়া মাটিতে পা খোঁড়ে। এদিকে দ্বার খুলে গেছে। অশ্বপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে হাবিল এগিয়ে যেতে থাকে। সে মাথা নিচু করে চলেছে।

সহসা সম্রাট পিছন থেকে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন—তোমাকে উৎসর্গ করা হল ইশ্মায়েল !

হাবিল সচিৎকারে জবাব দিল—আমি স্বপ্নদর্শীর খড়্গ বহনকারী মহানুভব। আমি খড়্গধারীর চৈতন্যের জন্য অপেক্ষা করি। কই এসো কয়িন ! বলে আব্রাহাম-পুত্র মালাটিয়ার অভ্যন্তরে দ্রুতই এবার ঢুকে গেল।

কাবিল গালিয়াৎ সম্রাটের হাহাকারে কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুহূর্তেই তার চৈতন্য সজাগ হয়ে উঠল। সে বুঝল, ইশ্মায়েল কয়িনকে হত্যা করতে মালাটিয়ায় ঢুকে গেল।

—সম্রাট এ আপনি কী করলেন !

—তুমিও যাও কাবিল গালিয়াৎ। অনুসরণ কর। তোমরা কী করবে জানি না। আমার কাছে আর কোনও নির্দেশ চেও না।

—আমি যাব ? কিন্তু কেউ আমার প্রার্থনা শুনবে না মহানুভব।

—তখন তুমি যা ভাল বুঝবে করবে।

—আপনি দ্বিতীয়-হত্যা করবেন না জ্ঞানী শুলায়মন।

—তোমাকেও আমি আত্মরক্ষাই করতে বলি গালিয়াৎ। এবং প্রশ্ন করি, পরমায়ুর জন্য আমার লোভ কি খুবই অসঙ্গত আর্যপুত্র ! মন্দির গড়ার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। বেঁচে কি থাকব আমি ?

—শিশুর রক্তই কি আপনার মন্দিরের জন্য যথেষ্ট নয় ? আরও রক্ত চাই ! আপনি আসলে কী চান ! আমি এবং আনাথ আপনার কাছে নতজানু হয়েছি। কয়িন আমাকে বলেছে...

—কী বলেছে ! এতদিন মুখ বুঁজে ছিলে কেন ?

—ভয় করেছে মহানৃপতি ! আমি আজ নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারি না। আমার ছায়াকে দেখে চমকে উঠি মাঝে মাঝে, মনে হয় এই ছায়াটাও আপনার অনুগত !

—ছায়ামূর্তির ছায়া, হাঃ হাঃ !

—আমরা যুদ্ধ আর চাই না মহাজ্ঞানী শুলায়মন। মাত্র দু'দিন আগে কয়িনের সন্ধান পেয়েছি, তাও জানি না সঠিক কোথায় ! কয়িন একজন গরিব ব্যাপারি, ওর স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসারটা মন্দ ছিল না। এখানেই কোথাও বেচারি রয়েছে। আপনি আমাদের মুক্তি দিন সর্বাধিপতি ! কয়িনকে সংসারে ফিরিয়ে দিন। আনাথকে বিয়ে করার সংকল্প ত্যাগ করুন।

—কয়িন একজন গুপ্তচর কাবিল ! যাও, প্রবেশ কর ! তুমি কয়িন আর ইশ্মায়েলকে বাঁচাও রাজপুত্র। বল, কারও মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই। আমি এই শুলায়মন,

কখনও দায়ী ছিলাম না।

—আপনি চতুরতা-গৃহে বাস করেন প্রজ্ঞাবান সারগন। আর্য-অহংকার চূর্ণ করাই আপনার উদ্দেশ্য। বলেই অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে উঠে কাবিল গালিয়াৎ অশ্বকে ঝড়-বেগে মালাটিয়ার অভ্যন্তরে চালিয়ে দিল। তারপর ঘটনা ঘটল অপ্রত্যাশিত। গালিয়াৎ ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ইশ্মায়েল কারখানাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গিয়ে ভিতরে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। একটি কারখানার সামনে পৌঁছনো মাত্র সম্রাটের 'উৎসর্গ' কথাটি তার মনে পড়ে গেল। সে কি তাহলে গিলিয়দ পাহাড়ের ওপার থেকে শলোমনের জন্য আত্মোৎসর্গ করতেই এসেছিল ! পরিত্যক্ত, নির্বাসিত ইশ্মায়েল কেন ছায়া হয়ে এই মরুমর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! কয়িন এবং শলোমন দু'জনই কি তার কাছে বধ্য ছিল না ? কিন্তু এ কোথায় ঢুকেছে সে ! এখানে কোথায় কয়িন ?

—আমিও কেন বিজয়ীর জোয়াল বইছি সদাপ্রভু, হায় পরমেশ্বর ! ইগার-পুত্র কি চিরকালের বোকা ! গর্দভ-মনুষ্য আমি, আমাকে বলি না দিলে রাজাবলির কাহিনী এগোয় না ! আপন মনে বিড়বিড় করছিল হাবিল। ঠিক তখনই কোথা থেকে ফিঙ্গার পাথর এসে ইশ্মায়েলের কপালে লাগল। ঘটনা নিতান্ত নিরীহ মনে হলেও, ফল সামান্য হল না। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেল হাবিল ইশ্মায়েল। মুখ থুবড়ে পড়ল আর মাথা তুলল না।

কাবিল গালিয়াৎ এসে দাঁড়াল মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ইশ্মায়েলের দেহের কাছে।

মালাটিয়ার প্রাচীরের বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর শলোমন তাঁর অশ্বকে খেদিয়ে নিয়ে চললেন। সমুদ্র-বন্দরগুলির দিকে। দেখলেন তাঁর বাণিজ্য-জাহাজগুলি মূল্যবান পাথর, মহার্ঘ বস্ত্র ও দামি ধাতু, বোঝাই করে ফিরেছে। দীপাঞ্চল থেকে দামি কাঠ ভাসিয়ে আনা হচ্ছে, দ্বীপের রাজারা মন্দিরের জন্য কাঠ দিতে চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর উত্তম জ্ঞান ও সুবিচার সেবার রানিকেও আকৃষ্ট করেছিল। সেবার রানি সম্রাটের জ্ঞানের পরীক্ষাও করেন। তিনি দু'টি মালা সঙ্গে করে এনেছিলেন, একটি পাথরের , অন্যটি ফুলের। কিন্তু বোঝার উপায় ছিল না কোনটা কিসের।

—এই মালা দু'টির কোনটি আপনার গলায় পরাব মহারাজা ? আসল মালাটি আপনাকে চিনে নিতে হবে।

শলোমন রাজপ্রাসাদের জানলা খুলে দিলেন। বাগান থেকে ভ্রমর আর মৌমাছি উড়ে এসে যে-মালাটির উপর বসল, সেটিকেই তিনি গ্রহণ করলেন। সেবার রানি বলেছিলেন—কেনানের মৌমাছিও কথা বলে রাজচক্রবর্তী। আপনার চোখকে কিছুই ফাঁকি দেওয়া যায় না। মানুষ নকল হলেও নিশ্চয় আপনি তাকে নিমেষে ধরে ফেলবেন।

সেবার রানির সঙ্গে করে আনা মূল্যবান উপঢৌকন-সামগ্রীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে নীরব রইলেন শলোমন। মাত্র নিঃশব্দে হাসলেন একটুখানি। ওই হাসিটুকু দেখেই রানি প্রথম দফায় বুঝলেন, রাজগৃহে উপস্থিত ছায়ামূর্তিগুলির মধ্যে কোনটি আসলে শলোমন। লজ্জিত হলেন সেবার রানি—মালা দিয়ে যাঁকে তিনি পরীক্ষা

করতে চাইছেন, তাঁকে শনাক্ত করাই তো এক অতি দুর্বোধ্য সমস্যা।

বিস্মিত রানি হেসে ফেলে বললেন—স্বয়ং মৃত্যুও আপনাকে বধ করতে এসে বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে যাবে, যদি না আপনি মৃত্যুর ছেলেমানুষি দেখে হেসে ফেলেন।

শলোমন বললেন—যাঁর হাসি দেখে আপনি এত বিস্ময় প্রকাশ করছেন, ওর নাম হাবিল অথবা কাবিল মহারানি।

—সে কি! প্রজাপতির মতো সুন্দরী রানি কপালে সবিস্ময়ে চোখ তুললেন।

—হ্যাঁ, প্রিয়দর্শিনী, আপনি এদিকে দেখুন, সবচেয়ে অচঞ্চল, নিরাসক্ত, নিস্পৃহ এবং সপ্রসন্ন আমি, আমিই দাউদ-পুত্র জ্ঞানী শুলায়মন, আমি গবাক্ষের কপাট খুলে দিয়েছিলাম একটু আগে। তারপর সরে গিয়েছিলাম। আপনি তখন শুধু মৌমাছির গুঞ্জন শুনছিলেন আর ভ্রমরের পক্ষসঞ্চালন লক্ষ করছিলেন।

—কিন্তু ওই যে হাসি, তা যে অতি উত্তম!

—তা-ও কিন্তু আমারই নকল।

—নকল? তাহলে আসল হাসিটি কেমন!

—একমাত্র মৃত্যু ছাড়া কাউকে আমি সেই হাসি উপহার দেব না।

—প্রেম? তার সামনে আপনি কিভাবে দাঁড়াবেন?

—প্রেম এক যন্ত্রণা মহারানি, তার সামনে কেউ হাসতে পারে না। কারণ এই মরুভূমিতে প্রেম আর যুদ্ধকে মানুষ আলাদা করতে পারেনি।

—আপনার জ্ঞানও কি ব্যর্থ হয়েছে?

—প্রেম হল যুদ্ধের জ্বালানি সেবার রানি। চেয়ে দেখুন, আমিও একজন সৈনিক মাত্র। সৈনিক সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

সমুদ্রে ভাসমান জাহাজগুলির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শলোমন কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। তার হৃদয় সহসা বলে ওঠে, কয়িনের মৃত্যু হয়েছে!

এদিকে দু'টি ছায়ামূর্তি মালাটিয়ার প্রাচীর পেরিয়ে মরুভূমিতে পড়ল। কিছু দূর ছুটে এসেই দু'জনই সমস্বরে ইব্রিয়ার নামে জয়ধ্বনি দিল।

তারপর গালিয়াৎ বলে উঠল—শোনো কয়িন। আর কোনও উচ্চারণ নয়। তুমি বোবা। মনে রেখো, তুমি বোবা এবং উন্মাদ! কারণ তুমি কোনও দ্বিতীয়কে হত্যা করতে চাওনি হাবিল ইশ্মায়েল। দ্বিতীয় হত্যার অপরাধে তুমি বোবা হয়ে গেছ। তুমি ইশ্মায়েল, তুমি বোকা এবং বোবা। ঠিক আছে?

—হুঁম্! কিন্তু যদি ধরা পড়ে যাই!

—যে ছায়ামূর্তির সাহায্যে শলোমন মৃত্যুকে পর্যন্ত ধোঁকা দেন, সেবার রানিকে মোহিত করেন, আমরা স্বয়ং সেই ছায়ামূর্তি কয়িন। আমরাই সর্বোত্তম প্রতারক।

—কিন্তু...

—বল।

—আমার কণ্ঠস্বর!

—সুবিধা এই যে, ইশ্মায়েল নানাকণ্ঠেই বলতে পারত। তবু কণ্ঠস্বর গোপন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা অযথা কোনও সংশয় সৃষ্টি করব না। ছায়ামূর্তির আড়াল থেকেই সবকিছু করতে হবে। দ্যাখ, ইব্রিয়া আমাদের আদর্শ, সহস্র প্রহারেও তাকে কথা বলানো যায়নি।

—আমি কি শলোমনকে হত্যা করব গালিয়াৎ!

—তুমি একা কেন করবে?

—শলোমন আমাদের শিশুকে ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়েছিলেন সিমন-পুত্র!

—তিনিই সেই শিশুকে হত্যা করেছেন!

—না।

—না? কে তবে করেছে?

—ইতিহাস। সবই আমার এবং আনাথের দুর্ভাগ্য গালিয়াৎ। অম্মোন এবং হিত্তীয়ের দ্বন্দ্ব ইতিহাসের নিয়তি!

—তুমি কী চাও?

—মুক্তি।

—পাবে না।

—কেন পাব না? আমি কি চির-পলাতক মিন্দা-পুত্র! ওহে সুরপতির সন্তান, মুক্তি কেন পাব না আমি? আমি শলোমনের প্রজ্ঞার কাছে প্রার্থনা করব!

—ব্যর্থ হবে কয়িন! কারণ শলোমন আনাথকে বিবাহ করতে চান!

—কী! এ রকম মিথ্যা কল্পনা তোমার মুখে মানায় না খেতা গালিয়াৎ!

—আমি কাবিল! আমি প্রজ্ঞার কালো মূর্তি। মিথ্যা বলি না। শলোমন নিজে মুখে আমারই কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন। তোমাকে হত্যার জন্য ইশ্মায়েলকে তিনিই পাঠিয়েছিলেন।

—আমি ইব্রিয়াকে চাইনি গালিয়াৎ! আমি গমদানায় অক্ষর আঁকি ভাই, খাদ্য আর নারী পেলে আমি আর মরুভূমির কাছে কিছুই চাইব না।

—তুমি আনাথকে পাবে না কয়িন!

—তা হলে আমি আর কথা বলছি কেন? একটি ফিঙ্গাও মুক্তি দেয় না আর্যপুত্র। আমার বেঁচে থাকার কোনও মানে নেই।

—আছে। উপায় আছে কয়িন। তুমি আর কথা ব'লো না। আমাকে নিঃশব্দে অনুসরণ কর।

শলোমন শৌল দুর্গের দিকে চলেছেন। পিছন থেকে দুই ছায়ামূর্তি তাঁকে অনুসরণ করে এল। তাঁর সাদা ঘোড়ার দুপাশে চলতে থাকল দুটি কালো অশ্বের আরোহী। সবুজ ছায়ামূর্তিকে দেখে সম্রাট তীব্রভাবে অবাক হলেন।

—তুমি ফিরে এসেছ হাবিল!

হাবিল উত্তর দিল না। শুধু দুর্বোধ্য আওয়াজ করল একটা। গালিয়াৎ বলে উঠল—মহারাজ! কয়িনকে হত্যা করার পর থেকেই ও আর কথা বলতে পারছে না।

—কিন্তু তুমি কী করে পারছ কাবিল গালিয়াৎ?

—আপনি একটি শিশুকে হত্যার পরও কথা বন্ধ করেন না দেখে উৎসাহিত হয়েছি। আমি আমার বোনের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, দেখা করতেও পারি না, আমাকেই হত্যার জন্য ওই হাবিলকে আপনি লাগিয়ে রেখেছেন, তবু কথা বলতে হয়। আপনি আনাথকে বিয়ে করুন মহাধিপতি।

—তোমার হৃদয় যেন সত্য বলে সিমন-পুত্র!

এই কথা শোনামাত্র গালিয়াতের হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেল ক দণ্ডের জন্য। সে মূর্ছিত

হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তাঁর মুখ বেঁকে গেল, গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেল। সে অদ্ভুতভাবে গোঙাতে লাগল, অর্ধ-অচৈতন্য মরুভূমিতে। কয়িন এবার হা হা করে হাসতে লাগল ঘোড়ার পিঠে বসে। সেই হাসির শব্দে বোঝা যায় না, সে আসলে কে।

ওই বিকৃত অবস্থাতেই আবার ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে চড়ল গালিয়াৎ। শলোমন মুখে কিছু না বলে তথাকথিত হাবিল ইশ্মায়েলের পাদুকা-বদ্ধ পায়ের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

শলোমনের বারংবার সন্দেহ হচ্ছিল, সত্যিই কি ইশ্মায়েল ফিরে এসেছে। হঠাৎ মনে হল, তাঁর দু'পাশে মূর্তিমান দুই মৃত্যুর পোশাক চলমান। এদের প্রশ্ন করেও আর লাভ নেই। এরা উন্মত্ত, এরা তাঁরই ধূর্ত ছায়া।

—শোনো! তোমাদের আমি নির্বাসন দিলাম হাবিল-কাবিল। আমাকে তোমরা কখনও আর অনুসরণ করবে না। বলতে গিয়ে শলোমন চুপ করে রইলেন। কী ভেবে তিনি শৌল দুর্গের দিকে তীব্রবেগে রামাসিসকে ছুটিয়ে দিলেন। পিছনে পড়ে রইল ছায়াময় দুই মূর্তি।

হাবিল-কাবিলকে তিনি বর্জন করতে চান। কিন্তু কিভাবে? মৃত্যুর চেয়েও এরা যেন কঠিন।

শৌল দুর্গে পৌঁছে কিছু বাদে তিনি কালো পোশাকে ছুটে আসতে দেখলেন এক ছায়ামূর্তিকে। একাই এসেছে কাবিল গালিয়াৎ, বিকৃত, ভাঙা এক আর্য।

—কী চাও?

—আনাথ! দাও, আমার বোনকে। দাও!

—আমার মন্দির গড়া হলেই মুক্তি কাবিল!

—আমার ফিঙ্গা। ফিঙ্গা ফেরত দাও শুলায়মন!

সম্রাট চুপ করে রইলেন। কথা বলতে পারলেন না।

—তুমি কে? সত্য বল, আমাকে সত্য বল! বলতে গিয়েও পারলেন না শলোমন। শলোমনের সব গান স্তব্ধ হয়ে গেল।

৮. দর্জির পোশাক

সূর্যাস্ত হচ্ছে। সন্ধ্যার আগে ঘুমিয়ে পড়েছে আনাথ। স্বপ্নে শলোমন তার কাছে এসেছেন। এ কেমন ঘোর স্বর্ণসন্ধ্যার মেঘ।

—তুমি সুদ্রাক্ষার চঞ্চল পেয়ালা আনাথ! আমাকে মাফ করে দাও! তুমি আর্যরক্ত দুর্লভ রমণী। তুমি সম্রাট দাউদের বীণাতন্ত্রীর চেয়ে বিষণ্ণ-সুন্দর। তুমি মরিয়মের গানের চেয়ে উদ্দীপক!

—না, এ ভুল! এ মিথ্যা! এ স্তুতি অতি ভয়ংকর!

—নতজানু হই রাজকন্যা!

—এ অন্যায় শলোমন!

—আমাকে রক্ষা কর আনাথ!

ঘুম ভেঙে যায়। কেমন আশ্চর্য লাগে আনাথের। ঘুমের মধ্যে এ কী দেখল সে!

স্বহস্তে আপন কুচযুগকে স্পর্শ করে সে কেমন দুর্বোধ্য কাতরোক্তি করে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছাগশিশুর দুগ্ধমুগ্ধ ছবি, সারগনের কোলে ধরা বিস্ময়, কী অপূর্ব সৌন্দর্য দাউদ-পুত্রের।

—তোমার অনেক আছে মহানুভব! অনেক পশুধন, অনেক অস্ত্র, কত রথ, কত ঐশ্বর্য! কত নারী, কত মহিষী! এত বড় সাম্রাজ্য তোমার! আপন মনে বিড় বিড় করতে থাকে স্বপ্নোত্থিত আনাথ!

—আমি কেউ নই আনাথ! আমাকে ক্ষমা করে দাও!

স্পষ্ট এই কণ্ঠস্বর চন্দ্রাহত মরুবিশ্ব থেকে ভেসে এল। আনাথের বুকের ভেতরটা কেমন দ্রব করে দিতে থাকল।

—কী চাও তুমি? কেন চাও? কেন? আপন মনে প্রায় উচ্চারণ করে ফেলে আনাথ। শরীর তার কেমন অবশ হয়ে আসে।

—আমি জানি না। আমাকে ক্ষমা করে দাও সিমন-কন্যা আনাথ। প্রেম আর যুদ্ধের দেবী, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি ঘাতক নই!

কান পেতে শুনে অলক্ষ্য সেই আর্ত-বিহ্বল স্বরকে বাস্তবে যেন খোঁজার চেষ্টা করল আনাথ। তখনই ঘরে ঢুকে এল ছায়ামূর্তি। সন্ধ্যার ছায়া ঘনালো গৃহে। মূর্তিটি এসে আনাথের গায়ের কাপড় ফেলে দিল। আনাথ আবেশে চোখ বুঁজল। ছায়া তাকে গমন করল।

—এ অন্যায়! এ পাপ!

—কিসের অন্যায়! আমিই তো এসেছি আনাথ!

—কে তুমি?

—আমি।

—আহ্! আরও কাছে এসো। আমাকে আরও নিবিড় করে ধর সুমতি সুন্দর।

—তোমাকে এই মরুতে কতই খুঁজেছি আনাথ!

—চুপ, কথা ব'লো না! আমার পেটে বিলালকে ফিরিয়ে দাও।

—আমি তাই দেব মিন্দার মেয়ে!

—কে তুমি গো মহাপাপী সুন্দর! আমার সাধের সারগন, মহাত্মা নিষ্ঠুর!

—তোর মুখে থুতু দিই আনাথ। থুঃ! এ তুই কী করেছিস আর্যপুত্রী! তোকে আমি খুন করে ফেলব। বলে কয়িন আনাথের গলা টিপে ধরে পাগলের মতো করে উঠল। তারপর আনাথকে ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে খাটের নিচে পড়ে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

—আমি তোমার গলাও চিনলাম না কেন! কেনান-জননী বৎসেবা, এ আমি কী করলাম! আমি স্বামীকে চিনলাম না!

—আমি তোর সম্রাটকে হত্যা করব কুক্কুরী!

—আমাকে একবার ক্ষমা কর কয়িন! আমার মাথার ঠিক নেই হিত্তীয়!

—তোমার সব ঠিক আছে। কিন্তু আমি ঠিক থাকতে দেব না। আমি আর গালিয়াৎ প্রস্তুত। মন্দির কিছুতেই হবে না। এ কী দুঃসহ জীবন! কী করে বইব আমি!

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল কয়িন।

—ওগো ! তোমার গলা যে সারগনের মতো, কী করে বুঝব !

—এ মিথ্যা ! এ ছলনা আনাথ !

—না। আমি যে বুঝতে পারিনি ! কেন পারিনি ! বলে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকল আনাথ গালিয়াৎ।

কয়িন গ্যালিলি হ্রদের রাজবাড়ি ছেড়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

সারা রাত ছটফট করে কাটল আনাথের। সারিন রাত গভীর হলে তার কাছে শুতে আসে। ভোরবেলা চলে যায়। সারাটা দিন একা কাটে। অবশ্য প্রতিদিনই একবার করে অল্প সময়ের জন্য সারগন তার কাছে এসেছেন। আবার কেমন আশাহত হয়ে ফিরেও গেছেন। এখানে ডাক দিলেই আনাথকে সাহায্য করার একটি স্ত্রীলোক সর্বক্ষণের জন্য রয়েছে ; আনাথ তাকে বিশেষ ডাকে না। কারণ স্ত্রীলোকটির মুখের ভাষা একদম সে বুঝতে পারে না।

কয়িন অন্ধকারে মিশে গেল। শলোমনের ছায়ামূর্তি কয়িন। সম্রাট তাকে হত্যা করেননি। বরং কয়িনই তাঁকে হত্যা করতে চায়। কী হবে এখন ! কয়িন আনাথকে আর বিশ্বাস করবে না।

সারিন বলেছে, নারীধর্ষণ এবং হত্যার অপরাধে এর আগের হাবিল কাবিল মরেছে। এ বার কি তা হলে কয়িন গালিয়াতের পালা ! ইশ্মায়েল কোথায় ? এই মানুষটা গালিয়াৎকে অস্ত্রাঘাত করেছিল সত্য, কিন্তু কখনও আনাথকে একফোঁটা বিরক্ত করেনি। আনাথের সামনে এসে জননী বলে ডাকত। অবশ্য দু-চার বারই ডেকেছে সে। এই মরুতে কোনও ছায়াই কি তা হলে স্থায়ী কিছু নয় ?

কয়িন আস্ফালন করলেও মৃত্যুই তার জন্য অনিবার্য। কারণ দাউদ-পুত্র এই নতুন উরিয়কে বাঁচতে দেবেন না। অথচ সেই উরিয়কে কি ভাবে ঠকালো বৎসেবা ! কী কঠিন হৃদয় আমার !

ভাবতে ভাবতে আনাথ আপন মনে মৃদু সুরে শব্দ করে কেঁদে উঠল এই ভোরে। আমার দাদা এবং আমি আর্য জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলাম। একজন ছায়া হয়ে গেল। অন্যজন জাদুকায়া যেন, নিজেকেই সে আর চিনতে পারে না। কয়িন মরবে, এ কথা কি জাদুকায়া আনাথ জানে না ?

কেন এ ভাবে এলে তুমি কয়িন ! আমি যে তোমাকে ভালবেসেই চলে এসেছিলাম ঘর ছেড়ে ! সেই আমি...আচ্ছা, আমি নিজেই কি পারি না শলোমনকে হত্যা করতে ! আমি কি সারগনকে বিষ খাইয়ে শেষ করে দিতে পারি না ! কিন্তু বিষ কোথায় পাব ? আমি অবশ্য বিষলতা চিনি। হ্রদের গায়েই জলের কাছে ওই বিষলতা রয়েছে। অথবা পারি নাকি নিজেকেই শেষ করে দিতে ? কিন্তু কয়িন কি জানবে কেন আমি শেষ হয়ে গেছি ! কেউ কি কখনও বুঝবে আনাথ কেন এভাবে ফুরিয়ে গেল ! কেনই বা বুঝবে না ! সর্বোত্তম জ্ঞানীর সমস্ত জ্ঞানকে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিতে পারে নাকি আনাথ ! পারে, পারে !

আবার একাকী ফুঁপিয়ে উঠল আনাথ। শলোমন জ্ঞান আর সৌন্দর্যের জ্বলন্ত শিখা ! আমি তেকোনা পতঙ্গ, পুড়ে মরতেই কেন জন্মালাম হায় দেবতা দাগোন ! ওই সৌন্দর্য আর জ্ঞানের কাছে আর সবই কি মিথ্যা ! জাতি, ধর্ম, স্বামী, সন্তান !

না। এ হতে পারে না।

—আনাথ !

—কে ?

—আমি তোর মা !

পিছনে ফিরে আনাথ দেখল, সত্যিই তার মা মিন্দা এসেছে। ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে ফেটে কেঁদে উঠল আর্য-রাজকন্যা।

—এ আমি কী করলাম মা !

—সহ্য করতে হবে আনাথ।

কান্না এক সময় স্তিমিত হলে ভেজা গলায় আনাথ শুধালো—কী করে এখানে এলে তুমি !

মিন্দা বলল রথে করে এসেছে। সারগনের রথ। সারথি স্বয়ং সম্রাট।

—কোথায় তিনি ?

—বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, মেয়ের সঙ্গে দেখা করুন। যদি আনাথ যেতে চায়, সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। আমি কেঁদে উঠে বললাম, যে দিন ওর সর্বনাশ হল, কেউ তো আমায় ডাকেনি। আমি জিরুজালেমে ইব্রিয়ার কাছে ছুটে গেছি মা রে ! ওখানেই তোর ছেলের সমাধি হয়েছে। নবি ইব্রিয়া বলেছে...

—কী বলেছে মা ?

—এখানে এখন বলা যাবে না খুকি ! শুধু জেনে রাখ, আমাদের দিন আসছে, তুই আমার সঙ্গে চ। আপন জাতির চেয়ে কিছুই বড় নয় সংসারে। তোর শিশুই আমাদের দেবতা, তোর গর্ভে ঈশ্বর জন্মেছেন। একবার শুধু বল মহারাজাকে, সন্তানের সমাধি একবার খালি চোখ ভরে দেখতে চাস ! তুই গেলে ইব্রিয়া বল পায় মা। যিবুষরা তোরই মুখ পানে চেয়ে রয়েছে !

মায়ের কথা শুনতে শুনতে যেন ঐক যুদ্ধের সংকেত পাচ্ছিল আনাথ। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল বিধবা মিন্দার মুখের দিকে। তার চোখের জল মুহূর্তে শুকিয়ে মুখের চামড়া কঠিন হয়ে উঠল যেন।

শক্ত মুখেই আনাথ মাকে প্রশ্ন করল—কই, তুমি তো কয়িনের কথা একবারও শুধোচ্ছ না ?

—কী হবে শুধিয়ে, ও কি আর আছে ! একটা সৈনিক, পিঁপড়ের সমান প্রাণ, তার কথা অত ভাবতে নেই খুকি।

—মা !

—হ্যাঁ আনাথ, জাতির কথা ভাব। বাপের কথা মনে কর। গর্ভে ধরা ঈশ্বরের কথা চিন্তা কর। আর তুমি আমার সঙ্গে চল এখন।

—তুমি যে আমায় নিয়ে যাবে, সম্রাটের অনুমতি চাও !

—মহারাজা রাজি হয়েছে। পথেই কথা হয়ে গিয়েছে।

—তুমি বলেছ, আসলে তুমি কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ এই আনাথকে ?

—না। শত্রুকে মানুষ সব কথা বলে না। আমি হলে দাউদের ছেলেকে বিষ দিয়ে মারতাম সিমনের মেয়ে ! চ, ওঠ ! মহাত্মা ইব্রিয়ার হাতেই আমরা আমাদের ইজ্জত সমর্পণ করেছি। তুই দেব-মাতা সিমন-কন্যা আনাথ। তুই যুদ্ধের দেবী আর্যপুত্রী !

—আমি প্রেমের দেবী মা গো ! আমাকে আর কষ্ট দিও না ! বলেই আনাথ শব্দ

করে কেঁদে উঠল।

তখনই বাইরে এক উচ্চ গলা শোনা গেল।

—আনাথ! দেবী আনাথ!

—কে?

—আমি জিবরাইল।

—কে জিবরাইল?

—আমি খলিফা জিবরাইল। বাইরে আসুন!

—কী চাও?

—একটা জিনিস দিয়ে যেতে চাই, মরুমর্তে আমার কাজ শেষ হয়েছে মা! দোকান আমি তুলে দিচ্ছি। আসুন!

সবই খুব আশ্চর্য ঠেকছিল আনাথের। সে বাইরে ছুটে এসে দেখল, কোথাও শলোমন নেই। শুধু রথটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সারথি একজন অন্য কেউ। রথ থেকে নেমে সামনে এসে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ স্মিতহাস্যে একটি লম্বা চেতালো বাক্স হাতে দাঁড়িয়ে গেল। ইনিই সারথি।

আনাথ এমন একজন মানুষকে দেখে কেমন দুই চোখ বিস্ফারিত করে দাঁড়িয়ে রইল। জিবরাইল লম্বা বাক্সখানা সামনে এগিয়ে ধরে বলল— আমি দর্জি, এই গ্যালিলিতে অনেক কাল কেটে গেল আমার। কাজ শেষ হয়েছে, এবার যেতে হবে। আমার রথও প্রস্তুত। শেষ যে কাজটা হাতে ছিল করে দিলাম, মহাজ্ঞানী দিব্যদর্শী শলোমনের এই রাত্রিবাসের পোশাক, আপনার হাতেই দিয়ে গেলাম। নিন, ধরুন। সম্রাটকে বলবেন, এ ছাড়া অন্য পোশাক আর হয় না। অনেক ভেবেও মাথায় কিছু এল না। মিন্দাকে বলুন, উনি আমার সঙ্গে যাবেন। আমি পৌঁছে দেব। টায়ার তো পথেই পড়বে আমার, তারপর সাগর পেরিয়ে যাব।

—আমিও যে মায়ের সঙ্গেই যেতাম!

—না, না। আগে পোশাকটা সম্রাটকে পরিয়ে দিন, নইলে আপনার কাজও যে শেষ হয় না জননী। আর শুনুন, সারগনের দেওয়া কাপড়টাও ফেরত দিয়েছি আমি, চাইলে অন্য দর্জিকে দিয়ে একটা কিছু বানিয়ে নেবেন নিজের জন্য। আমি আমার নিজেরই কাপড় দিয়েছি মা!

—কিন্তু দাম?

—ও আর লাগবে না দেবী। শেষ পোশাকের দাম নেবার কথা তুলে লজ্জা দেবেন না। কই গো মিন্দা, এসো, এসো!

ডাক শুনেই মিন্দা গালিয়াৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে রথের কাছে ছুটে এল।

—চ, আনাথ। আমরা যাই। ত্বরিত সুরে বলে উঠল মিন্দা।

জিবরাইল দর্জি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—ওগো মেয়ে মিন্দা! যেতে হবে তোমাকে। ওকে ডাকছ কেন?

—আনাথ যাবে না? মহাত্মা ইত্রিয়াকে কী বলব গিয়ে, ওগো বাছা! বলে কাতর চোখে জিবরাইলের দিকে চাইল মিন্দা।

আনাথ বাক্সটা হাতে নিয়ে কী করবে ভেবে না পেয়ে দ্রুত পাগলের মতো অন্তঃপুরে চলে আসে। প্রথমে বাক্সটা পালঙ্কের উপর রাখে। খুলেও ফেলে ইতস্তত

করতে করতে। ভাঁজ করা একখানা কাপড়। অতি হালকা বেগনি-সাদা কাপড়খানা তোলে। ভাঁজ খুলে মুগ্ধ হয়। গায়ে ফেলে দেখে নেয় তাকে এই কাপড়েরপোশাকে কেমন মানাবে। তারপরই চোখ পড়ে বাক্সের বাকি কাপড়খানার দিকে। সম্পূর্ণ সাদা ওই পোশাকটা কেমন খসখসে। এই মেলায়েম মসৃণ-পিচ্ছল কাপড়ই হত শলোমনের রাত্রির পোশাক। হল না। ওই খসখসে সাদা পোশাকটা তা হলে কী? মজুরি নিল না জিবরাইল।

খসখসে সাদা পোশাকটা হাতে তুলেই আনাথ আঁতকে উঠল। কফন। মৃতের জন্য পোশাক। চিররাত্রির পোশাক পরবেন শলোমন। বুকের সঙ্গে কফনখানাকে জড়িয়ে ধরে কেমন হয়ে গেল আনাথ গালিয়াৎ। ছুটে এল বাইরে। কান্নাধরা গলায় বলে উঠল—আমি কোথাও যাব না মা! তুমি চলে যাও।

বলেই আনাথ অবাক হল। বাইরে কেউ কোথাও নেই। রথ নেই। সারথি জিবরাইল দর্জিও নেই। পথের উপর পড়ে রয়েছে চাকার দাগ। এখন কী করবে আনাথ?

আনাথের এত কান্না পাচ্ছে কেন? তার তো খুশি হওয়ার কথা। খানিক আগেই তো সে শলোমনের মৃত্যু কামনা করেছে। ভেবেছে বিষলতার কথা। আর্যদের চিরশত্রু শলোমন। তার কফন দেখে উল্লসিত হতে পারছে না আনাথ। কেন? নাকি অত্যধিক আনন্দের চাপেই তার চোখে জল এসে পড়ছে!

বেগনি-সাদা পোশাকটাকে, পোশাক না হতে পারা কাপড় আসলে—সেটাকে ভাঁজ করতে করতে সুন্দরী আনাথ বেশ শব্দ করেই কেঁদে ফেলল এবং অপ্রতিভ ভঙ্গিতে স্বহস্তে নিজের মুখ চেপে ধরে কান্না থামাতে চাইল। পারল না। কান্না আরও উচ্চকিত হতে চাইল! এ কী! আনাথ কি তা হলে পাগল! শত্রুর জন্যও কি মানুষ কাঁদে!

রাত্রির এই গাঢ় পোশাক, যদি পোশাক হয়ে উঠত, তা হলে তা পরে কী করতেন শলোমন? কোন নারীকে সোহাগ করতে তিনি? তাকে? পরস্ত্রী আনাথকে কি বুকে টেনে নিতেন? এই বসনের কামনা কী ছিল হা ঈশ্বর!

জিবরাইল দর্জিকে প্রত্যক্ষ করেছে আনাথ। মৃত্যু এত রূপবান, জ্যোতির্ময় কেন? ওই রথই বা কেন এত উজ্জ্বল? ওই রথে করে মা কোথায় চলে গেল? জিবরাইল মিন্দাকে ওই ভাবে ডেকে নিয়ে গেল কেন?

আবার আনাথের চোখ পড়ে সাদা কফনের দিকে। সে তখন বেগনি কাপড় সরিয়ে রাখে। সে জাদুকায়া নারী। তারই ছোঁয়া লেগেছে বলে অর্ধেক ভাঁজ করা রাত্রির পরিচ্ছদ আপনা থেকে খুলে যেতে থাকে। কফন ভাঁজ করা শেষ করে আনাথ দেখে বেগনি বসন খুলে গেছে সমস্ত। তখন সে কফন ফেলে বেগনি কাপড় ভাঁজ করতে শুরু করে।

তার কি মাথার ঠিক নেই? কী করছে আনাথ! একবার মৃত্যুকে ছুঁয়ে ভাজ করে দেখে তার কামনা উন্মুক্ত হয়েছে। কামনাকে ভাঁজের শাসনে আনলে মৃত্যু খুলে যায়।

এই করতে করতে পাগলের মতোই অট্টহাসি হেসে ওঠে সিমন-কন্যা। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। পালঙ্কের উপর ছড়িয়ে থাকা কফনে এবং সোহাগ-রাত্রির

বসনে গড়াগড়ি দেয় আনাথ।

—তোমার কাজ কেন শেষ করে দিলে জিবরাইল ? তুমি কি এমনই অদ্ভুত ! এখনও যে শলোমন তাঁর মন্দিরের কাজ শুরু করতেই পারেননি ! ওহ, আশ্চর্য ! কয়িনের হাতেই শেষ হবেন তিনি ? আমি যে তোমাকেও বঞ্চিত করলাম লিপিকার ! তুমি কেন এসেছিলে অমন সন্ধ্যাকালে ! তোমাকেও আমি উন্মাদ করেছি কয়িন ! কিন্তু এখন কী করব, কে আমাকে বলে দেবে ? কাকে শুধাব, সারিনও রাত্রে আসেনি।

বলতে বলতে পালঙ্কে উঠে বসে আপ্রাণ চেষ্টায় আনাথ কাপড় দু'খানির ভাঁজ শেষ করে বাক্সে ঢুকিয়ে ফেলে। তারপর ভাবে, সে পালাবে। কিন্তু পালাতে গেলেই তো প্রহরীর হাতে ধরা পড়ে যাবে। হঠাৎ তার মনে হয়, যদি শলোমনের কফন সে মরুতে লুকিয়ে ফেলতে পারে, তা হলে মানুষের ইতিহাস কেমন হতে পারে !

—আমি কিছুতেই এ কফন শলোমনকে দেব না। আমি প্রেমের দেবী, আমি কি পারি না কফন লুকোতে ! হায় সোহাগ-রাত্রির বেগনি রামধনু, হে মধুযামিনীর কেনান, আমার কণ্ঠে গান দাও লিবাননের শিবিকা ! তুমি আমার জন্য পাণি-শিবিকা পাঠাও শলোমন। আমাকে বিবাহ কর হেতপুত্র শলোমন। তোমার সপ্তজাতি এবং জ্ঞাতি-সমষ্টি জয়যুক্ত হোক অমর শলোমন, তোমার আর্যপ্রেম দ্রাক্ষালতার মধুপের সঙ্গীত শোনাবে প্রিয়তম। আমি তোমার ভালবাসা সঙ্গে করে লুকিয়ে পড়ব মরুমর্তের আঁধারে, কেউ খুঁজে পাবে না। কেউ জানবে না মৃত্যুর পোশাক সেলাই করা দর্জি কী করে পরাস্ত হয়ে ফিরে গেছে। প্রেমের হাতে কখনও কি মৃত্যুকে তুলে দিতে হয়, হায় দেবতা এল্ ! যুদ্ধের দেবীকে কেন কফন দিয়ে অপমান করেছ ? আমি যে আর বইতে পারি না আমারই হৃদয়কে শলোমন ! তুমি গ্রহণ কর, এসো আমি তোমাকে পূর্ণ করি দাউদ-পুত্র !

বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল আর্যকন্যা আনাথ গালিয়াৎ। ঠিক তখনই মনে হল, বাইরে অশ্বের হ্রেষা উচ্চকিত হয়ে ছুটে আসছে। কান্না থামিয়ে আনাথ গবাক্ষের কাছে ছুটে যায়। দুজন ছায়ামূর্তিকে দেখতে পায়। শলোমনসদৃশ এই দুই ছায়া যে শলোমন নন, তা বুঝতে আনাথের অসুবিধা হয় না। কারণ সম্রাট তার কাছে যখন এসেছে আনাথ সম্রাটের কটিদেশ নিথর অধিকাংশ মুহূর্ত চেয়ে থাকতে চেয়েছে। চোখ তুলে সম্রাটের দিকে চাইতে গেলেও আনাথের দৃষ্টি কেঁপে গিয়েছে। সম্রাট আনাথের সামনে এসে শিরস্ত্রাণের ঝালর বাঁ হাতে টেনে সরিয়ে কথা বলেছেন অথবা শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলেছেন অথবা তিনি যোদ্ধাবেশ ত্যাগ করেই আনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন।

শলোমনের পা দুখানির আকৃতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক। কয়িন গত সন্ধ্যায় যখন আনাথকে গমন করল, শিরস্ত্রাণে-ঝালরে কয়িনের মুখ ছিল ঢাকা শক্ত করে। কেবল মিলন অসম্পূর্ণ রেখেই খাটের তলায় পড়ে গেল বেচারি, তখনই দেখা গেল স্বামীর পাদুকা-বেষ্টিত পা ক্ষুদ্র, পাদুকা ঢলঢল করছে বলে, ফিতেকে টেনে বাঁধা হয়েছে, ওই পাদুকা যেন কয়িনের নয়। আবার সম্রাটেরও যে নয়, বোঝাই যায়। সবই একটু খুঁটিয়ে না দেখলে বোঝা কঠিন। তবে আনাথ সম্রাটের লম্বা পাদুকা চেনে।

শুধু পা দুখানি আজও তবু দেখা হয়ে ওঠেনি আনাথের। শলোমনের একবার মুখে চাইলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। নগ্ন পা দেখার সুযোগ একবারই হয়েছিল, যখন তার নাভা

বুকের দিকে সম্রাটের কুসুমকলিকার মতো আঙুলগুলি প্রসারিত হয়ে এল, অঞ্জলিবদ্ধ হল দুটি হাত ; কিন্তু দুটি চোখ তখন আবেশে বুজে এল আনাথের। দেখা হল না।

ওরা দুটি ছায়ামূর্তি নিশ্চয়। এবং ওরা দুজন কারা ? কয়িন এবং গালিয়াৎ ? নাকি ওরা অন্য কেউ ? কে ওরা, কারা ওরা ? সম্রাটের মতো উদ্ধত ভাব, কোমরে খাপবাঁধা তরোয়াল। শলোমনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বুঝি ! ওদের পা সারগনের পা নয়। ওরা এক ও অদ্বিতীয় সারগন সেজেছে মাত্র।

ঠিক এই সময় সারিন ঢুকে এল। গবাক্ষের কাছে আনাথের পিছনে এসে দাঁড়াল।

—তুমি যাওনি আনাথ ?

—না।

—কেন যাওনি মায়ের সঙ্গে ?

—যাব না।

—কয়িন বেঁচে রয়েছে মিন্দার মেয়ে।

—কী করে জানলে ?

—তোমার কাছে নিশ্চয় আসবে। দ্যাখ, ইশ্মায়েলের পাদুকা ওর পায়ে একদম মানাচ্ছে না। তুমি ইলোহের শাস্ত্র জানো আর্য রাজকন্যা ? শোন, ইশ্মায়েল বেঁচে নেই। গর্দভ-মনুষ্য ইশ্মায়েল। তার কান এবং পায়ের আকৃতি ভাল ছিল না। কখনও কখনও শুধু দু'টি পায়ের আকৃতি দেখে মহাজ্ঞানী শুলায়মন কারও জাতি-পরিচয় বুঝে নিতে পারেন। আমাকেই উনি বললেন, ইশ্মায়েল মারা গিয়েছে।

—তো ?

—বড়ই অবিশ্বাসে হৃদয় পূর্ণ হয়েছে সারগনের। আমি ছাড়া ওঁর আর কেউ নেই সিমনকন্যা।

—এখন কী হবে ?

—সমস্ত ছায়ামূর্তিকে শৌলদুর্গ থেকে মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়েছে কাবিল গালিয়াৎ। আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে তারা সব মরুমর্তে ছড়িয়ে গেল। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখলাম, কিছুই করতে পারলাম না।

—তা হলে কী হবে সারিন !

—মরুতে জাতিদাঙ্গা বাঁধবে ; কে কাকে মারবে হিসাব থাকবে না। ছায়ামূর্তিরা ক্ষুধার্ত আনাথ !

—কী করবে ওরা ?

—একসঙ্গে শতেক মূর্তির বেশি কখনও ছাড়া হত না কোনও কালে। কত ছায়ামূর্তি রয়েছে তা ছায়ামূর্তিরাও জানত না। জানত কেবল হাবিল-কাবিল। ওদের ছাড়বার আগে শলোমনের মন্ত্র শোনানো হত। শতেককে সহস্র ঘিরে রয়েছে বলেই জানতাম আমরা। তাইই জানত ছায়ারা। গালিয়াৎ তামাম শৌলদুর্গকে খালি করে দিয়ে ছায়াদের সঙ্গে মিশে গেছে।

—মুক্তি দিয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—কেন, তা হলে মন্দির হবে না বুঝি ?

—হবে না।

—ওদের ফেরানো যাবে না সারিন ?

—কে ফেরাবে ? কী বলে ফেরাবে ? আদর্শের শিকল একবার ছিঁড়ে পড়লে তাকে ঠিক করা কঠিন। সহস্র বিলাল তার আগেই বিনষ্ট হয়ে যাবে, সহস্র কিশোরী ধর্ষিত হবে। বস্তি পুড়বে, খুন হয়ে যাবে ইব্রিয়া অথবা ইষানুল, আর্যরাজার শির ছিঁড়ে নেবে ওরা। অথবা কী হবে জানি না। গালিয়াৎ যে এত বড় মুক্তি চাইবে সারগন বুঝতে পারেননি। মূর্তিরা আসল দেহকে ছিন্ন করতেও পারে।

—তুমি একবার শুধু সম্রাটের সঙ্গে আমায় দেখা করতে দাও সারিন! আমি তোমার পায়ে পড়ি!

—কী করবে তুমি ? তুমি চলে যাও আনাথ।

—যাব না। পারব না যেতে।

—শলোমন পরাজয় স্বীকার করেছেন, তুমি বন্দী নও আর্য রাজকন্যা! তোমাকে উনি স্পর্শ করেননি। তুমি ফিরে গিয়ে আর্যদের বল, কোনও অসম্মান তোমার হয়নি। তুমি পবিত্র।

—নাহ্! না। বলে আনাথ এবার তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল। ভীষণ নম্র, কোমল আর্যকন্যার এমন উৎকণ্ঠিত আর্ত-চিৎকারে অবাক হয়ে গেল সারিন। গবাক্ষ থেকে ছিটকে ভিতরে সরে গেল আনাথ। বুকে তুলে নিল কাঠের বাক্সটিকে।

—কী আছে ওতে ? দেখাও আমাকে। বলে উঠল সারিন।

—কিছু না। এ আমার নিজস্ব। সুন্দর মৃত্যু এ জিনিস আমাকে উপহার দিয়েছে। এ আমি কাউকে দেব না। দেখতে দেব না। ছুঁতে দেব না। তুমি জোর করো না সারিন!

—মৃত্যু!

—তুমি বুঝবে না। কেউ বুঝবে না। আমি পবিত্র নই ধ্রুবা-জহুরা। কখনও আমি নক্ষত্র হব না। শাস্ত্র আমার কথা লিখবে না। আনাথ কখনও পবিত্র ছিল না। যুদ্ধ আমার অপবিত্রতা, প্রেম আমার শুচিতা ধ্রুবা-জহুরা। আমি শলোমনের অবৈধ নারী। আমাকে নির্বাসন দাও! তার আগে একবার শলোমনকে দেখব আমি।

—তুমি ফিরে যাও আনাথ।

—কোথায় যাব ? কেউ নেবে না আমাকে। এতক্ষণে নিশ্চয় আমার গরিব মাকে জিবরাইল তার উজ্জ্বল রথ থেকে লাল মরুভূমিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মা মরে গেল সারিন!

বলে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকল আনাথ। বাক্সটিকে আরও বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরল।

এই সময় যেন এক শুভ্র দেবদূত ঢুকে এল ঘরে। আলো এল। সারা ঘর ভরে গেল। হুবহু এক মোশিহা। এমন রূপবান নবি যোশেফ ছাড়া কেউই ছিলেন না। শলোমন কত সুন্দর তা তিনি নিজেও জানেন না। তিনি মেঝেয় খানিকটা লুটিয়ে পড়ে থাকা আনাথের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—বাক্সটা একবার আমাকে দেখতে দাও রাজকন্যা। সবই শুনেছি আমি। জিবরাইল যা দিয়ে গেছে, এসো দুজনে আমরা ভাগ করে নেই! দেখলাম, দর্জির দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে, ঘোড়া ছুটিয়ে রথটাকে ধরবার আর চেষ্টা করিনি। দর্জির সাহায্যকারী ছোকরাটা দোকানের বাইরে বসে কাঁদছে, আমাকে দেখে আরও জোরে ফুঁপিয়ে উঠল সে। বাক্সের ভিতরে দুই প্রস্থ কাপড় রয়েছে, ছোকরা নিজে হাতে ভাঁজ করে বাক্সে ঢুকিয়েছে। বলল, রঙিন আর সাদা। বলল, দেখে বুঝে নেবেন মহানুভব। তাই হোক, আমাকে বুঝে নিতে দাও আনাথ। দাও, আমাকে দাও! ভাবছি, দুই ধরনের কাপড় তো আমি দিইনি। তোমারই হাতে যখন দিয়ে গেছে দর্জি, তখন একটা তো তোমারই নিশ্চয়।

—তুমি জানো না জ্ঞানী শুলায়মন, তুমি কী দেখতে চাইছ! চেও না! বলে আরও একবার বাক্সটাকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে সিমনকন্যা। এক হাতে চোখের জল মোছে।

সম্রাট এ বার তাঁর বাড়ানো হাত নিজের দিকে গুটিয়ে নিয়ে স্মিত হেসে শান্ত গলায় বললেন—ঠিক আছে। বাক্সের ভেতরকার পোশাক তা হলে দেখবেন বৎসেবা। আমরা এখন দাউদ-নগর রওনা দেব রাজকন্যা, বাইরে উটের ডুলি তোমার জন্য আমিই প্রস্তুত করেছি।

—ডুলি ?

—আব্রাহাম তার বেশি কী করতে পারে! আমি কোনও সম্রাট নই আনাথ। মরুভূমিতে আজ থেকে অষ্টোরৎ দেবীর পূজা সাড়ম্বরে চালু হল। মোয়াবের দেবতা কমোশ এবং অম্মোনদের দেবতা মিলকম পূজিত হবেন আজ থেকে। ইদোমের এক বংশ ইদদ আমার শত্রু, মিসরের রাজা ফরৌনের অনুগ্রহপ্রাপ্ত। যোশেফকুলের যারবিয়াম আমার প্রতিপক্ষ, ইলোহে আমার রাজত্ব চিরে নিয়ে বারো ভাগের দশ ভাগ তাঁরই হাতে তুলে দিতে চান। জিরুজালেমের এক ভাগ মাত্র আমার জন্য অবশিষ্ট রয়েছে, সেখানেও যিযুষরা মাটি কামড়ে রয়েছে। ইব্রিয়াকে হটানোর সাধ্যও আমার নেই। আমার ছায়ার উপর আমার কোনও কর্তৃত্ব নেই। আমি সামান্য মানুষ।

—তুমি কী বলছ, মহাজ্ঞানী, মহানুভব!

—ঠিকই বলছি আনাথ। আমি দাউদের মতো যুদ্ধের লোক নই। আমার পরমায়ু কম। আমি কারও আয়ু চুরি করে বাঁচতে চাইনি। মন্দিরের জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করেছি। এক ভাগ মাত্র অংশ আমার, সেখানেই মন্দির হবে। জ্ঞান আমাকে বারবার এই মরুতে পবিত্র করেছে রাজকন্যা! জাতিদাঙ্গা কখনও পৃথিবীতে শেষ হবে না, যুদ্ধ বার বার হবে। কখনও কোনও সভ্যতা আমার কৌশলের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে না। কারণ অম্মোন আর হিত্তীয় চির-অপরাধী এবং সম্মানিত। প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র এবং অহংকারী। তারা আমারই ছায়ার মতো ক্ষুধার্ত।

—কী বলছ তুমি মহামতি সারগন!

—হ্যাঁ, আনাথ। আমি মোয়াবীয়া, ইদোমীয়া, সীদোনিয়া, হিত্তীয়া সকল জাতির নারীকে সম্মান দিয়েছি, তাঁদের দেবতাদের অসম্মান করিনি। আমি আমার মন্দির সকল দেবতার অনুগ্রহে নির্মাণ করতে চাই। সকল দেবতার জন্য জিরুজালেমে আমি পর্বতের উপর উচ্চস্থলী নির্মাণ করে দেব। চল, আনাথ, আমাদের যেতে হবে।

সম্রাটের কথা শুনতে শুনতে এ বার সহসা প্রতিবাদ করে উঠল সারিন—না মহাজ্ঞানী সারগন, আনাথকে সঙ্গে নেবেন না, ওকে চলে যেতে দিন। আর্যরা ওকে ফিরে পেলে আপনার উপর থেকে রাগ পড়ে যেতে পারে। রাস্তার মধ্যেই কোথাও কয়িন-গালিয়াৎ ওঁৎ পেতে রয়েছে। ইদদের লোকেরা কোথাও আত্মগোপন করে

রয়েছে, কোথাও রয়েছে যারবিয়ামের সৈন্যরা—মরুভূমি জ্ঞাতিতে জাতিতে ভাগদখল হয়ে গিয়েছে সম্রাট !

—সেই কবে থেকে যুদ্ধটা চলছে সারিন। মোশির যুগ থেকে আজ পর্যন্ত। কিন্তু কী হল সেই যুদ্ধের পাওনা ! বারো গোষ্ঠীর বারো ভাগ। এই বিভক্ত মানুষের উপর যিনি প্রভুত্ব করেন তিনিই কি রাজা ? লোহা আর ঘোড়ার শক্তিই কি শেষ কথা ? সেই বারো ভাগের মাত্র এক ভাগ ইলোহের জন্য অবশিষ্ট রইল। শুধু সেইটুকু রক্ষা করতে গিয়ে আমি শিশুহত্যা করেছি ধ্রুবা-জহুরা। যুদ্ধ, মড়ক, দুর্ভিক্ষ, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প পেরিয়ে এ কোথায় পৌঁছেছি আমি ? আলিফ আর বে—এই দুটি অক্ষর ছাড়া কিছুই আর আমার হাতে রইল না। আলিফ হলেন ঈশ্বর, বে হল বাড়ি বা ঘর। ঈশ্বরের ঘর গড়ে না দিলে সেই নিরাশ্রয় ঈশ্বর লাল মরুতেই ঘুরে বেড়াবেন।

—আপনিই স্বয়ং আলিফ মহারাজা।

—তা হলে এই আনাথ, এই প্রেমের দেবীই বে অর্থাৎ আশ্রয় আমার ! উনি পাপঘ্ন। পাপ দূর করবেন। আলফা-বিটা-গামা। এই গামা হল গিমেল বা জিমেল। অর্থাৎ উট। এই তিন অক্ষরেই শলোমন-সংহিতা শেষ হয়েছে ধ্রুব-জহুরা। আমার মহান-সাম্রাজ্যের সুখ একটি বালিকণার চেয়েও ক্ষুদ্র ছিল। আমি কালো পিঁপড়েদের কথা দিয়েছিলাম...সেই মুক্তোকণাদের কথা দিয়েছিলাম।

—কী কথা ?

—সে বড় কষ্ট সারিন। অযুত মৌমাছি আমি নষ্ট করেছি। বলে দু হাতে মুখ ঢেকে শলোমন ফুঁপিয়ে উঠলেন। এই কান্না অন্যের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। সামান্য ওই ফোঁপানির মধ্যেই সম্রাট বললেন—কী আশ্চর্য দ্যাখ, ইস্রায়েলকে আমিই উৎসর্গ করলাম। আমার লালসা হাবিলকে শেষ করে দিল। মানুষের প্রেম কী রক্তাক্ত, কী বক্র, কী অবাধ্য-করুণ ! আমি কেন বৎসেবার কথা শুনিনি হায় ইলোহিম।

—আপনি আনাথকে ত্যাগ করুন মহামতি সারগন !

—আমি গালিয়াৎকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেয়েছি সারিন। আর্যকে ছায়ায় পর্যবসিত করার চেয়ে অধিক আমোদ কিসে ! যার শিশুকে হত্যা করেছি, সেই নারীকেই ভোগ করার জন্য স্নানে-সুগন্ধে সুবাসিত করেছি। তাকেই এখন সঙ্গে নিয়ে ডুলি সাজাব।

—না, এ হতে পারে না মহানুভব।

—আমারই জন্য বিবলিস-কন্যা আর্য-কুমারী লুব্ধক-নাচ নেচে আগুনে পুড়েছে। বলেই সম্রাট মুখের উপর থেকে তাঁর নিজের হাত সরালেন। দুটি চোখ তাঁর বিস্ফারিত হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

—চুপ করুন সম্রাট। আমরা আর সইতে পারি না !

—আমিই হাবিল-কাবিলকে হত্যা করে আমার পতনকে নিশ্চিত করি, কিন্তু তাদের পা আমার চেয়ে সুন্দর ছিল। তাদের চোখ আমার চেয়ে নির্দোষ ছিল।

—এ সত্য নয় মহামতি !

—তুমিই আমার পাপের সহচরী সারিন। কারণ তুমিই শোকার্ত বোবা আনাথকে গোলাপ-স্নানে সুগন্ধিত করেছিলে ! আমার সব কামনা তুমি টের পাও ধ্রুবা-জহুরা। এখন আমাদের যেতে দাও !

সঙ্গে সঙ্গে আনাথ অত্যন্ত ব্যাকুল তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে বলে উঠল—আমার বিলালের কাছে

আমাকে নিয়ে চল দিব্যদর্শী শলোমন। আমাকে নিয়ে চল ! আমাকে যেতে দাও সারিন। তুমিও তো মা !

—তুমি ইব্রিয়ার অস্ত্র আনাথ ! তুমি এখন কারও মা নও। কারও পত্নী নও। তুমি কারও পাপ দূর করতে পার না ! দোহাই, তুমি দাউদ-পুত্রকে ত্যাগ কর প্রিয়ংবদা। বলে আনাথের দিকে প্রার্থনার ভঙ্গি করল সারিন।

প্রার্থনারত সারিনের ভঙ্গির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে বিদীর্ণ করে আনাথ অর্ধস্ফুট অথচ তীব্রস্বরে বলল—আমি কি ইগারের চেয়েও অভিশপ্ত !

—তুমিই ইগার আর্যকন্যা ! তুমিই যিবুষদের কাছে আমার ইলোহের জন্য মাটি চাইবে !

সম্রাটের এ কথায় সারিন সচকিত হয়ে উঠল। তার মনে হল, সম্রাট এখনও তাঁর কৌশল ভুলে যাননি। আনাথ আসলে সারা, তাঁকেই আব্রাহাম আশ্রয়ের জন্য ব্যবহার করবেন। সারিন আনাথকে সুসজ্জিত করে উটের ডুলিতে তুলে দিল।

৯. মাটির সন্ধানে শলোমন

পথ বিপদ-সঙ্কুল। তবু জিরুজালেমের দিকে চলেছেন শলোমন। উটের লাগাম তাঁর হাতে ধরা। পায়ে হেঁটে চলেছেন তিনি। উটের উপর ডুলিতে বসে রয়েছে আনাথ। এই দৃশ্য মরুভূমিতে অভাবিত। কিন্তু নিরস্ত্র শলোমনকে পথচারী মানুষজন চিনতে পারছে না। এমন বণিকবেশে তাঁকে কেউ কখনও দেখেনি। সাদা পোশাক, ঢিলেঢালা, গায়েরই বসন মাথায় ফেটির মতন উঠেছে, একটি কালো রিং বেড়ে রয়েছে গোল হয়ে ; মনে হচ্ছে যেন মিদিয়নীয় বণিক, গিলিয়দ পাহাড় থেকে আগত।

রাস্তা দিয়ে চলেছে নানান রঙের মানুষ। বিদেশিরা যাচ্ছে, কেনানের চাষি, শ্রমিক যাচ্ছে, কারিগররা চলেছে। ভিনদেশী সেনারাও ঘোড়া করে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে মিসরের দিকে। শলোমনের মুখপানে চেয়ে অনেকেই ভাবছে, মানুষটা দেখতে বুঝি আব্রাহাম বা মোশির মতো। ডুলিতে অধিষ্ঠিতার মুখশ্রী অপূর্ব লাবণ্যযুক্ত। এ যেন সারির মতোই কেউ। কিংবা এ নারী সিপ্পোরা। নিম্নাঙ্গে রঙিন দীর্ঘ ঘাগরা এবং দীর্ঘ হাতাঅলা ঊর্ধ্বাঙ্গের পরিচ্ছদ, মাথা ঢেকে নেওয়া গলায় জড়ানো সুশুভ্র উড়নি। নারীর বক্ষযুগল অতিশয় উদ্ধত। চোখে মদির সুর্মা-আঁকা। এই বণিক কি পথেই লুট হয়ে যাবে !

সাধারণ মানুষ এখনও জানে না, সম্রাট শলোমন তাঁর সৈন্যবাহিনীর উপর কতখানি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। জানে না এ কথাও যে, আজ প্রত্যূষের স্বপ্নে দেখা দিয়ে ইলোহে শলোমনের সাম্রাজ্য চিরে নিয়ে যোশেফের বংশের হাতে দশ ভাগ তুলে দিয়েছেন। বাকি দুই ভাগের মাত্র এক ভাগ শলোমনের হাতে রয়েছে, অপর এক ভাগের দখল আগেই নিয়েছে ইদদ। তলে তলে মরু-অধিপতি যে এতটাই ক্ষমতাচ্যুত সেই সংবাদ রাষ্ট্র হতেও সময় লাগবে। তবে দাউদের অধিকৃত জিরুজালেম এখনও হস্তচ্যুত হয়নি। ইলোহে কেবলমাত্র মন্দিরের জন্যই ওই স্থান শলোমনের হাত থেকে কেড়ে নেননি।

দশ ভাগ যে চলে গেল, সেই সমূহ অঞ্চল প্রকাশ্য দখল নেবে ওরা, শলোমনের

জ্ঞাতিরা, নেতৃত্ব করবে যোশেফ-পুত্র ইফ্রয়িমের মাংস নবাটপুত্র যারবিয়াম। যারবিয়ামের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ইদোমের মাংস ইদদ। এরা উপঢৌকন দিয়ে অসুররাজকে খুশি রেখেছে। কিছুই আজ শলোমনের অপরিজ্ঞাত নয়।

যাকোব বা ইস্রায়েলের ভ্রাতা এষৌ বা ইদোম। অভিশপ্ত ইদোম, তাঁরই মাংস ইদদ। শলোমনের চিরশত্রু। কিন্তু আশ্চর্য লাগে ভাবতে, যারবিয়ামের কথা। যোশেফের মাংস সে। যোশেফ না হলে যাকোব বাঁচে না। ইলোহে যে দশ ভাগ যোশেফ মাংসে তুলে দিতে চাইছেন, তা হয়ত ইতিহাসেরই যুক্তি। যারবিয়ামকে ভালবাসতেন শলোমন, গভীর বিশ্বাস করতেন। যোশেফ কুলের নেতা করেছিলেন তাকে। সেই যারবিয়াম মিশরের রাজা কাবুসের সঙ্গে তলে তলে বন্ধুত্ব করেছে। মিসরের এই রাজার নাম শিশক। অর্থাৎ কাবুস শিশক।

শলোমনের ছায়ামূর্তিরা যারবিয়ামের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। হত্যা করতে পারত। শিশকের কাছে পালিয়ে যায় বিশ্বাসঘাতক ছোকরা। হাবিল-কাবিল ওকে হত্যা করেনি। ঠিকই, ওরা পারবে কেন? শলোমন যে ইব্রিয়াকেও হত্যা করতে পারেননি।

এই ইব্রিয়া অতএব শিশকের লোক অর্থাৎ যারবিয়ামের লোক। উটের লাগাম ধরে টেনে চলা শলোমন বুঝতে পারছিলেন প্রধান আক্রমণ আসবে মিসর থেকে। ইলোহে আজ প্রত্যুষের স্বপ্নে সেই ইঙ্গিতই করেছেন। যারবিয়াম অদ্যাবধি মিসরে আত্মগোপন করে থাকলেও সে বসে নেই।

ইশ্মায়েলের কথানুসারে ইব্রিয়াকে যদি অসুররাজ পাঠিয়ে থাকে, তাহলেও যারবিয়ামের সঙ্গে এই লোকের গূঢ় যোগ রয়েছে। শিশকের নির্দেশেই লোকটা কেনানে ঢোকার আগে আসিরিয়া ঘুরে এসেছে। সরাসরি কেনানে ঢোকেনি। শলোমনের মনে হল, সুর-অসুর-কাবুস কোনও সংযুক্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অতএব বলা যায় আসিরিয়া, মিসর, ফিলিস্টাইন ষড়যন্ত্রে কুটিল তিন শক্তিই তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয়। সুর বা আর্যরাই নয়, হেত বা হিত্তীয়রাও শলোমনের বিরুদ্ধেই যেতে চাইছে। জ্ঞাতিরা যেমন তাঁর আপন নয়, সপ্তজাতিও অনাত্মীয় এবং সুর-অসুররাও তাঁকে ফেলে দিতে চায়। এমন কি বৎসেবাও জাত্যভিমানী এক আশ্চর্য চরিত্র। কিন্তু তিনি জানেন না, তাঁর ছেলে স্বপ্নে সিংহাসনচ্যুত এবং একজন সামান্য যাযাবর।

সবাই ওরা ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হিসাবে আনাথের সন্তানকে হত্যা করেছে। কিন্তু এ কথা প্রমাণ করা যায় না। কেনানের সমস্ত মানুষ আজ ইব্রিয়াকেই বিশ্বাস করবে। শলোমনের কেউ নেই।

বৎসেবা মনে করেন, শৌল-সিংহাসন তাঁর। যোশেফের মাংস মনে করে, সিংহাসন তার। ইদদ ভাবে, শলোমন অনধিকারী। অম্মোন-মোয়াবরা ক্ষুব্ধ এবং শলোমনকে ভাবে প্রবঞ্চক। গালিয়াৎ শলোমনের সরাসরি প্রাণ কেড়ে নিতে চায়, কয়িন ইব্রিয়ার মতোই নিষ্ঠুর। অথচ উটের পিঠে করে শলোমন বহন করছেন আশ্চর্য প্রেম! বহন করছেন তাঁর পক্ষের যুদ্ধের দেবীকে।

আদম বললেন—তুমি আর কী বহন করছ ঈশ্বরপুত্র?

—কী?

—ইগারপুত্র জানত না কী সে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলেছে পিতার সঙ্গে। ওই

পাহাড়ের উচ্চতায় খড়্গধারী অব্রাম কেন টেনে নিয়ে চলেছেন তাঁর পুত্রকে! আনাথের কোলে ধরা বাক্সের ভিতরে কী রয়েছে এখনও তুমি জানো না শলোমন!

—আমাকে বলে দাও ঈশ্বরপুত্র আদম, আমি সত্যিই কাকে বহন করছি! কোথায় চলেছি আমি?

আদম লিপিকারকে বললেন, লেখো ভাই, শলোমন সেই সম্রাট যিনি তাঁর কফন নিজেই বহন করেছিলেন। এবং লেখো, তাঁর প্রেম তাঁরই কফনকে আগলে বসেছিল সালেহের উটের উপর। শলোমনের চেয়ে বিস্ময়-সম্রাট আমি মরুতে কখনও সৃষ্টি করিনি। তিনিই একমাত্র জ্ঞানী যিনি প্রেমের হাতে তাঁর মৃত্যুকে সাজিয়ে দিতে পেরেছিলেন। যুদ্ধ এবং প্রেমকে তিনি নারী-আধারে রেখে নিজের জন্য রচনা করেছিলেন এক আশ্চর্য মরু-সরণি! যখন তিনি ক্ষমতাচ্যুত হচ্ছিলেন, তখনও তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন। ছিলেন নিরস্ত্র এবং নিঃসহায়, যদিও তিনি বহন করছিলেন আনাথের এক অপরূপ সৌন্দর্য!

শলোমন আনাথকে হঠাৎ সতর্ক করার জন্য বললেন—তুমি আমাকে সারগন বলে ডেকো না। জ্ঞানী শুলায়মন বলে সম্বোধন করো না। আমি শান্ত, আমাকে শান্ত বলে ডাকবে। এইই আমার শেষ ছদ্মবেশ রাজকন্যা। তুমি সন্দেহজনক কোনও লোক বা ছায়ামূর্তি দেখলে মুখের উপর পর্দা টেনে নিও। ওই সাদা পর্দায় চোখ দুটি খোলা থাকবে, তাতে তোমাকে অসুন্দর দেখাবে না। তা ছাড়া আমি যেন তোমার সুন্দর চোখ দুটি দেখতে পাই! আমার মনে হচ্ছে এই পথেরই উপর কয়িনের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে।...শুনে আনাথ শিউরে উঠল।

দিন চলে গেল। সন্ধ্যা নামল দিগন্তে। মরু-বিহঙ্গরা ওড়াউড়ি করল কুলায়ে কুলায়ে। অস্তরাগে গাছের পাতারা সোনার মুকুট পরেছে। একটি এলা বৃক্ষতলে কূপের কাছে উট থেমেছে উট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে আনাথ। আকাশে সম্পূর্ণ চাঁদ। চাঁদের কিরণে মিশেছে গোধূলি। ওই আলোয় কিছু দূরে কালো কালো কী যেন দেখা যায়। ঢেউ খেলানো বালির উপর কী যেন সব পড়ে রয়েছে। বালির দিগন্তছোঁয়া ঢেউ কাছে দেখালেও তা আসলে দূরের ঢেউ।

শলোমনের মন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। পাশে দাঁড়ানো আনাথের মুখের দিকে চাইলেন তিনি। বুকে আঁকড়ে ধরা বাক্স, চোখে আনাথের উদ্বিগ্ন বিস্ময়। শলোমনের চোখে চেয়ে সে তার বিস্ময়কে আরও কিছুটা উত্তেজিত করে তোলে।

—কী যেন!

—হ্যাঁ! মৃত মৌমাছির মতো পড়ে রয়েছে ওরা।

—কারা!

—চল, দেখি।

উটকে এলাতলে কূপের কাছে রেখে শলোমন আনাথকে সঙ্গে করে এগিয়ে গেলেন। আনাথ ভয় পাচ্ছিল। এই প্রথম সে লক্ষ করল শলোমনের পা খালি। সম্রাট তাঁর পাদুকা এলাতলে খুলে রেখে এসেছেন। দুটি পা কী দীর্ঘ! এবং ফাটা, আঙুল বিদীর্ণ আর পশুর মতো। এ শুধু মরুভূমিরই যোগ্য, যাযাবরী পা। অত্যন্ত ক্ষিপ্র এই পায়ের গতি। থেঁতো পায়ে কত রক্ত মেখেছেন এই মানুষটা। সম্রাটের পায়ের দিকে চেয়ে আঁতকে উঠে দু হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে পড়ল আনাথ। সে

ভয়ার্ত শব্দ করে ওঠায় শলোমন দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনে ফিরে চাইলেন।

—কী হল!

দু'হাত চোখের উপর থেকে সরাতে পারছে না আনাথ। এবং ভয়ে ভয়ে হাতের আড়াল থেকে দৃষ্টি মুক্ত করলেও রাজকন্যা তার দৃষ্টিকে পায়ের তলার বালিতে ছড়িয়ে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

—তুমি কাঁদছ আনাথ! তুমি কি আমারই মতো দেখতে পেয়েছ, তোমার চোখও কি আমারই মতো অনেক দূর চলে যায়?

—না।

—তাহলে, কী না জানি দেখতে হবে, সেই ভয়ে...

—না।

—তা হলে?

—আমার কোনও দূরদৃষ্টি নেই শান্ত, আমি কাছে এলে তবে দেখতে পাই। আমি দেখতে পেয়েই শিউরে উঠেছি।

—তুমি মৃত মৌমাছিদের দেখতে পেয়েছ?

—না।

—তা হলে কী দেখতে পেয়েছ?

—আমি বলতে পারব না, বোঝাতে পারব না ইস্রায়েল! আমাকে ক্ষমা করে দাও, জানতে চেও না। বলে আনাথ একটুখানি ছুটে গিয়ে সম্রাটের পায়ের তলায় পড়ে গিয়ে একখানি পা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে ডুকরে উঠল। তারপর সেই পায়ে মাথা ঠেকিয়ে স্থির হয়ে রইল। আনাথের উষ্ণ চোখের জল দু'ফোঁটা শলোমনের কদর্য পায়ে টুপিয়ে পড়ে।

সেই তপ্ত অশ্রুর স্পর্শে শলোমনের রাজকীয় যৌনবোধ জেগে উঠল; পায়ের তলা থেকে উপরে ঠেলে উঠল কামনা। মরুভূমি এখানে নির্জন। দূরে পড়ে রয়েছে অসংখ্য মৃত মৌমাছি। আনাথের উপরে ঝুঁকে নামলেন শলোমন। আনাথের বাহু দুটি দু হাতে অত্যন্ত ভদ্রভাবে চেপে ধরলেন তিনি। ছোঁয়ামাত্র সম্রাটের শরীরের ভিতরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই বিদ্যুৎ কোথায় ছিল এতদিন! যুদ্ধের আকাশে মেঘাবৃত ছিল বুঝি!

আকাশে যা হারিয়ে গিয়েছিল, তা যেন আকাশ থেকেই সন্তর্পণে শলোমনের দেহে নেমে এসেছে। এই বিদ্যুৎ আকাশকেই বিদীর্ণ এবং অশান্ত করে তোলে। দু'হাতে টেনে নিজের বুকের দিকে আনাথকে ওঠাতে গিয়ে শলোমন ভাবলেন, এত হালকা কেন এই আর্য-বিহঙ্গিনী! যৌন-আগ্রহ থাকলে অপমানিত নারীও কি মুহূর্তের জন্য তার দেহকে মরু-মায়াবী মেঘের মতো হালকা করে তোলে, নারী কি দেহের ভারকে নিজেরই দেহের ভিতরে লুকিয়ে ফেলে?

—বল, তুমি কী দেখেছ? বল, তুমি কাছ থেকে কী দেখলে আনাথ?

—তোমাকে। তোমার পা...বলে কেঁদে উঠল আনাথ।

—আমার পা! বলেই শলোমন নিজের স্বরকে পীড়িত এবং বিদীর্ণ করে তুললেন। দিগন্তের দিকে তাঁর হতাশা ছুটে চলে গেল।

—আমাকে ক্ষমা করে দাও দাউদপুত্র!

—এ মুহূর্তে কেন তুমি দাউদের নাম করলে আনাথ? কেন করলে? কী করে করলে! বলতে বলতে হাতের মুঠো থেকে বালিতে আনাথকে ছেড়ে দিলেন শলোমন। সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর সম্মুখে চাইলেন। দেহের বিদ্যুৎ আকাশে ফিরে গিয়ে মিলিয়ে গেল। সম্রাট বালির ঢেউয়ের দিকে ছুটতে শুরু করলেন। পাগলের মতো ছুটে চলে গেলেন।

তারপর শোনা গেল শলোমনের গলায় ইস্রায়েলীয় মহা বিপুল যুদ্ধের ডাক, মানুষের কণ্ঠ যেন হ্রেষার মতো বিদ্যুৎময়। মরুভূমি যেন নিজেই বিভীষিকার আর্তরব ছড়িয়ে চলেছে। ইলোহের বজ্ররথ তারায় তারায় জ্বলছে আর ছুটে চলেছে, অসংখ্য উট ভাসছে আকাশে।

—আমাকে দেখে ফেলেছে! আমার সব দেখে ফেলেছে, আমি কে, চিনে ফেলেছে! আমি কে, দ্যাখ আমি কেউ নই! বলতে বলতে কণ্ঠস্বর থেমে গেল সম্রাটের। বালির ঢেউয়ের উপর কিছু পরে উঠে এল আনাথ। তারপর কী দেখল সে?

সহস্র মৃতদেহ। সমস্তই ছায়ামূর্তি। সবই শৌলদুর্গের সৈন্যরা। রক্ত এখনও টাটকা, কিন্তু কোনও দেহেই হয়তো আর প্রাণ নেই। কোনও কাতরোক্তি শোনা যাচ্ছে না।

একটি মূর্তির সামনে মাথার কাছে ঝুঁকে নেমে মূর্তির মুখোশ ধীরে ধীরে খুলে ফেলেন শলোমন, তারপর মৃতদেহের কানের কাছে মুখ রেখে প্রশ্ন করলেন—তুমি কে? বল, তুমি কে? কে তোমার মা? পুত্র, কে তোমার মা? তুমি কি অম্মোন? তুমি কি হিত্তীয়? তুমি মোয়াব? তুমি কি যিবুষ? সপ্তজাতির তুমি কে? আমার জ্ঞাতিদের তুমি কে? তুমি অপরাধী, তুমি কি আত্মত্যাগী? কী তোমার আদর্শ ছিল? কথা বলবে না? উত্তর দেবে না সম্রাট শলোমনকে? তুমি কি কেনানের কেউ নও? তোমার চোখের আলো এভাবে নিবে গেল কেন? দু মুঠো খেতে পাবে বলেই তো আমার ছায়া হয়েছিলে তোমরা! আমার মন্ত্র তাই তোমাদের মুগ্ধ করেছিল।

এই সময় আনাথ ফুঁপিয়ে উঠল। সেই কান্না কানে যাওয়া মাত্র শলোমন বলে উঠলেন—এরা মৌমাছি রাজকন্যা। শৌলদুর্গ ছিল এদের মধুচক্র, এদের ধোঁয়া দিয়ে খুঁচিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল গালিয়াৎ। আদর্শের মধু এদের ঠোঁটেই শুকিয়ে গেছে। এরা মরে গেল, অথচ আমি বেঁচে রইলাম!

কান্না থেমে গেল আনাথের। ভয়ে তার প্রাণ শুকিয়ে গেলেও সম্রাটের অব্যক্ত কান্না তাকে সম্রাটের কাছে টেনে আনল। সে এসে ভয়ে ভয়েই শলোমনের কাঁধে হাত রাখল।

শলোমন একের পর এক ছায়ামূর্তির মুখোশ খুলে ফেলে দেখতে থাকেন এদের সুন্দর মুখগুলিতে কোথায় কষ্ট ছিল কতখানি। তাঁর এই শনাক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা দেখেও কিছুই বলতে পারছিল না আনাথ।

—এই দ্যাখ, এর চোখে এখনও ইলোহের বাসনা আর আলো! দ্যাখ, দ্যাখ এ অপরাধী অম্মোন। এই দ্যাখ হেতপুত্র উরিয়! আমি আর সইতে পারছি না আনাথ। যুদ্ধের দেবী, তুমি বলে দাও, আমি এত নিরস্ত্র হয়ে গেলাম কেন?

—এ উরিয় নয় হেতপুত্র শলোমন। তুমি কাউকে হত্যা করনি। ওঠো, চল!

বলে আনাথ আবার শলোমনের কাঁধ স্পর্শ করল।

—তোমার হৃদয় যেন সত্য বলে আনাথ! বল, এর মধ্যে কে কয়িন! এস প্রত্যেকটি মুখ আমরা চাঁদের আলোয় দেখি। কে তোমার স্বামী, বল আমাকে! একটার পর একটা মুখ উন্মোচন করে চলেন রাজচক্রবর্তী শলোমন। রাত বাড়তে থাকে। চাঁদের আলো আরও তীব্র হয়।

আনাথ কী করবে এখন? কয়িনের মৃত মুখ দেখবে! সে কি সত্যই সহ্য করতে পারবে?

—বল, এইই কি কয়িন?

—না।

—এই যে, এটা?

—না।

—এই মুখটা দ্যাখ!

—না। এ নয়। এরা কেউ আমার নয়।

—এ?

—না, শান্ত।

—আবার দ্যাখ, একে দ্যাখ!

—ও নয় ইস্রায়েল!

—কেন? কে তবে কয়িন, আমাকে দেখাও!

—নেই।

—আছে। আমরা কি ভুল করিনি? কোথাও থেকে গেল না তো ওই মুখগুলির মধ্যে!

—না।

—তোমার হৃদয় যেন সত্য বলে আনাথ!

এ বার আনাথ নির্জন মরুরাত্রিতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কেমন হতভম্ব হয়ে গেলেন শলোমন।

—আমায় আর কষ্ট দিও না, আমি আর পারছি না। আমার ঘুম পাচ্ছে। মানুষের জ্ঞান কি নিজস্ব পাপকেও প্রত্যক্ষ করতে চায়? বলে ওঠে আনাথ।

—হ্যাঁ চায়।

—পারে?

—আমি পারব। আমি পারব আনাথ!

—আমি যে পারব না শলোমন। আমি যে খুব সামান্য মেয়ে। দাসী ইগার, যে তার প্রভুর অন্যায়কে মরুভূমিতে লুকিয়ে রেখেছিল, কাউকে বলেনি!

—তুমি কে? কে তুমি? বলে যেন শিউরে উঠলেন শলোমন।

—আমি বৎসেবা। দাউদের পাপকে আমি গোপন করতে পারি। আমরা সব পারি। আমরা মেয়েরা সব পারি আমদপুত্র জ্ঞানী শুলায়মন। আমাকে আর দেখতে বলো না।

—দেখতেই হবে তোমাকে! আমাকে নিশ্চিন্ত হতে হবে। নিঃসংশয় না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানী থামতে জানে না।

এতক্ষণে আনাথ তীব্রবেগে উচ্চ গলায় হেসে উঠল। সে হাসি সহজে থামতেই চায় না। হাসতে হাসতে এক সময় আনাথ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। সেই কান্নায় সম্মুখের পাহাড় খানিকটা চিরে গেল।

তারপর একটি মৃতদেহের দিকে চেয়ে দেখেই আনাথের দৃষ্টি থমকে থেমে স্থির হয়ে গেল— এই মুখটাকেই একদিন পাগলের মতো ভালবেসেছিল সে। এই মুখটাকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করেছিল। কয়িন কাছে না থাকলে এই মুখটির অভাবে বিনিদ্র রাত কাটত তার।

—এটা কি কয়িন, বল আনাথ, চিনতে পেরেছ!

—না।

—তাহলে?

—না, না। এ নয়, এ আমার কেউ নয়, কখনও ছিলও না।

—আর মাত্র পাঁচটা লাশ রয়েছে।

—আমাকে দেখতেই হবে। শলোমন, উন্মোচন কর ওটা, এটা ঢেকে দাও। সব মুখ আমিই ঢেকেছি!

—এটা?

—না, এ আমার কয়িন নয় সম্রাট। ঢেকে দাও।

একটি মাত্র মৃতদেহ বাকি রয়েছে, তখনই আনাথ বলে উঠল— এটা থাক শান্ত। একে খুলো না। কিছুতেই খুলবে না তুমি।

—কেন? এটাই যদি কয়িন হয়?

—সেই জন্যই তো খুলবে না।

—কেন? কেন?

—তোমাকে কখনও নিশ্চিন্ত হতে দেব না সম্রাট! চুরি করা পরমায়ুর প্রতিটি পল বিঁধব তোমাকে।

—কেন? এ কী বলছ তুমি আনাথ?

—আম উটের কাছে চললাম।

—উত্তর দাও!

—নাহ্। নাঃ! দেব না কখনও, কিছুতেই দেব না। আমি পারি না দিতে। পারি না।

পিছন থেকে ছুটে এসে শলোমন আনাথকে ধরলেন। ভোর হতে আর দেরি নেই। উটের ডুলিতে নিজেও শলোমন চড়ে বসলেন এবং আনাথের সব দুর্বল বাধা প্রতিহত করে আর্যনারীকে চিত্তঘূর্ণির উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে সম্ভোগ করলেন।

সম্ভোগ শেষে সম্রাট দু'হাতে মুখ ঢেকে আনাথের কোলে উপুড় হয়ে সেই মুখ গুঁজে দিলেন শিশুর মতো। অসংবৃতা আনাথ লক্ষ করল, সম্রাটের দেহটা কান্নার নিঃশব্দ চাপে থরথর করে কাঁপছে।

হঠাৎ শলোমন আনাথের কোলে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকতে থাকতে বললেন— আমি বাঁচতে চাই আনাথ! বাঁচতে চাই!

সম্রাটের এই আশ্চর্য হাহাকার শুনে আনাথের গলার মধ্যে কী একটা দুর্বোধ্য কষ্ট দলা পাকিয়ে উঠল। সম্রাটের পিঠে হাত রেখে আনাথ বলল— আমি তোমার

মন্দিরের জন্য যিবুষদের কাছে মাটি চাইব শান্ত। ইব্রিয়াকে বলব...

—কী বলবে ? বল, কী বলবে।

—তুমিই বল, আমাকে কী বলতে হবে।

শলোমন এবার চুপ করে রইলেন। আনাথ লক্ষ করল, এগারো জন অশ্বারোহী সাদা ঘোড়ায় করে কোথা থেকে ছুটে এল। প্রত্যেকেই তারা শলোমন। বণিকের বেশ প্রত্যেকের। যে শলোমন আনাথের কোলে মুখ গুঁজড়ে রয়েছেন, তিনিই যদি শলোমন, তাহলে অশ্বারোহী ওরা কারা ?

—ওরা কারা ! অস্ফুট আতঙ্কে চমকে উঠল আনাথ।

—কে ?

—কারা ওরা !

—কারা ?

—না, কেউ নয় শান্ত। অকারণ আমি ভয় পাচ্ছি, তুমি যেমন রয়েছ থাকো। কেউই নেই কোথাও।

—তাহলে অমন করলে কেন ?

—আলেয়া বোধহয়, আলোর মানুষরা ঘোরাফেরা করছে, আলোর ঘোড়া, আলোর তরবারি। কাছে আসছে আবার দূরে সরে চলে যাচ্ছে।

—অ।

—হ্যাঁ শান্ত। চোখের ভুল। বলে আনাথ ডুলির চারধারে যা পেল হাতের কাছে বস্ত্রাদি তাই দিয়ে পর্দা টেনে নিজেদের আড়াল করল। আসলে সে শলোমনকেই লুকোতে চাইল।

শলোমন আনাথের কোল থেকে মুখ না তুলেই বললেন— ইলোহে আমাকে স্বপ্নে মাত্র দু'বার দেখা করেছেন আনাথ। প্রথমবার আমার প্রার্থনা শুনে অবাক হয়েছিলেন, কেননা আমি তাঁর কাছে জ্ঞান ছাড়া কিছুই চাইনি। দ্বিতীয়বার দেখা হল বিগত প্রত্যুষে, উনি আমার সাম্রাজ্য চিরে নিয়ে বললেন, তুমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হও জ্ঞানী শুলায়মন। এখন থেকে মৃত্যু সর্বক্ষণ তোমাকে অনুসরণ করবে।

আবার শিউরে উঠল আনাথ— সত্যিই ওরা কারা ?

—ওরা হবে সংখ্যায় এগারো জন। আমারই মতো তারা ; অবিকল শলোমনের রূপ ধরে আসবে শলোমনের মৃত্যু। কারণ এতদিন আমিই মৃত্যুকে বিভ্রান্ত করেছি। মরুভূমিতে আসল শলোমন কে বুঝতে না পেরে মৃত্যুই বারংবার গেছে ফিরে। এবার মৃত্যুই জ্ঞানীর কৌশলকে জ্ঞানীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে। আমি মৃত্যুকেও পথ দেখিয়েছি, এই আমি বর্মহীন সৈনিক !

—এগারো জন ! কেন ?

—ওরা এগারো গোষ্ঠী, আমারই জ্ঞাতি, আমি একা এক-গোষ্ঠী আনাথ ! আমি একাই, আসলে সম্রাটের কোনও গোষ্ঠী থাকে না, জ্ঞানী চিরকাল নিঃসঙ্গ। আমি কে, এই প্রশ্নের মীমাংসা জ্ঞানীর কিতাবে থাকে না কখনও। একমাত্র দিব্যতন্ত্রীরাই সব প্রশ্নের উত্তর চোখ বুজে দিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তারা রোজই পাঁচবেলা ঈশ্বর-দর্শন করে, সদাপ্রভু ওদের পোষা স্বপ্নের মতো।

—তোমার কোনও কিছুতেই কি মীমাংসা নেই শলোমন ?

—না।

—কেন ?

—জানি না। তবে মৃত্যুকেও আমি নিশ্চিন্ত হতে দেব না। মৃত্যু আমাকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকবে, আয় শলোমন ! তোকে আমি মাটি দেব, নগর দেব, দেশ দেব, জিতবৃক্ষ দেব, এলোনবন দেব, দ্রাক্ষালতা দেব, জাতিদের দেব পায়ের তলায়, এই মরু-সাম্রাজ্য তোমার, উনুই সকল তোমার, লোহা তোমার, অশ্ব তোমার, সব তোমার !

—না, না, আর ব'লো না শলোমন, হে শান্ত, তুমি চুপ কর।

—তুমিই আমার শেষ মৃত্তিকা আনাথ। শেষ এক ভাগ তুমিই। তুমি বল, আমার মন্দির মাথা তুলে দাঁড়াবে ! বল, ওই এগারো জন কি এগিয়ে আসছে ! আমার ঘুম পাচ্ছে খুব।

আনাথ অনুভব করল, শলোমন আর কথা বলতে পারছেন না। ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডুলির চৌদিক পর্দা সরিয়ে এঁটে দিলেও সামান্য ফাঁক দিয়ে আনাথ লক্ষ করল ওই এগারো জন ছুটে এসে উটের দু'পাশে ঘোড়া নিয়ে চলতে থাকল। একজন অশ্বারোহী উটের সামনে সামনে চলেছে। তার হাতে ধরা একটি ধাতব চোঙা তাতে সে মুখ লাগিয়ে হঠাৎ ঘোষণা করে উঠল— আজ জিরুজালেম চলুন দেশবাসী, সম্রাট শলোমন যিবুষের মাটিতে ইলোহের মন্দির গড়বার জন্য চলেছেন, সেই মাটিতে ভিত্তিপ্রস্তর গাঁথবেন দাউদ-পুত্র, কেনান-জননী বৎসেবার সামনে, সপ্তজাতির সামনে, বারো গোষ্ঠীর সামনে, সমস্ত অভিশাপযুক্ত এবং আশীর্বাদধন্য মানুষের সামনে সম্রাট রাজচক্রবর্তী মহামতি মহাজ্ঞানী শুলায়মন তাঁর পবিত্রতার পরীক্ষা দেবেন। চল, চল, জিরুজালেম চল !

বাকি দশজন সমস্বরে ধ্বনি দিল— জয় ইলোহের জয় ! জয় শলোমনের জয় !

জয়ধ্বনি শুনে আনাথের বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেল। তার কেবলই মনে হতে লাগল, ওই অশ্বারোহীরা যদি একবার টের পায় ডুলির ভিতরে শলোমন আত্মগোপন করে রয়েছেন তাহলে তারই কোলের মধ্যে শলোমনের মৃত্যু হবে। ওরা সম্রাটকে মেরে ফেলবে। সম্রাটের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে সম্রাটকে হত্যা করবে ওরা। মরুভূমির বুকে চলেছে নানা জনপ্রবাহ, সবারই গন্তব্য বুঝি জিরুজালেম। আজ বোঝাই যাচ্ছে না, মানুষের ঢেউয়ের মধ্যে কে বা কারা সম্রাটের শত্রু, কারাই বা সমর্থক। তবে এই এগারো জনকে শুধুমাত্র আনাথ চিনতে পেরেছে। কেউ বুঝতে পারছে না, ওই শলোমনবেশী অশ্বারোহীরা কতখানি ছদ্মবেশী, মৃত্যুর চেয়ে বড় কুশলী কীই বা হতে পারে !

—কে যায় ? ডুলিতে কে যায় ? হেঁকে উঠল সাদা অশ্বারোহীদের একজন। আনাথ উত্তর দিল— আর্য বিধবা একজন। আমি সুর-বেওয়া, জাদুকায়া প্রভু !

—কোথা যাও ?

—শলোমনের জন্য আমি আমার চোখের জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বলেই তীব্র আবেগে কেঁদে উঠল আনাথ। তার চোখের সামনে বারবার কয়িনের মুখটা ভেসে ভেসে উঠল। তার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকা শলোমনের নিদ্রাভিভূত দেহটা বার দুই নড়ে উঠল।

ডুলির রামধনু রঙের ঘেরা পর্দায় সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে তার আভা লাগছে

আনাথের মুখে। তার অশ্রু ঝিলমিল করছে হিরের মতো। তার নাকের পাথরে সেই আলো পড়ে অপূর্ব মায়াবী করেছে তাকে।
এগারো অশ্বারোহী কোনও কথা না বলে সামনে এগিয়ে চলে গেল। দাউদ নগরে পৌঁছাল উট। রাজপ্রাসাদের বৃহৎ চাতালে এসে দাঁড়াল। আনাথ শলোমনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল। উট ডুলিসহ মাটিতে বসেছে। সম্রাট ডুলি থেকে নেমে আনাথের কাছে জিবরাইলের বাক্সটা চেয়ে নিলেন। তারপর প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে না গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন— এস আনাথ! বাক্সটা তুমিই মায়ের হাতে দেবে। বলে আবার বাক্সটা সম্রাট আনাথের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।
আনাথ বলে উঠল— ওই বাক্সে আমারও একখানা বসন রয়েছে শাস্ত!
—তোমার বসন! বটেই তো!
—হ্যাঁ।
—কই দেখি! বলে বাক্সটা ফের চেয়ে নিলেন শলোমন। তারপর খুলে ভিতরে কী আছে দেখার জন্য তৈরি হলেন। তার আগে দেখলেন বৎসেবা প্রাসাদের ভেতর থেকে বাইরের এই চত্বরে ছুটে এসেছেন। মন্ত্রীরা এগিয়ে এসেছে, প্রহরীরা সতর্ক। শলোমনের পত্নীরাও এসেছে।
—আজ তোমার মন্দিরের শিলান্যাস খোকা! এ কাকে সঙ্গে করে আনলে!
—এ আমার যুদ্ধ আর প্রেমের দেবী আনাথ! দর্জির এই বাক্সটা আনাথই তোমার কাছে বয়ে এনেছে। এ সঙ্গে না থাকলে আমার আর পৌঁছনো হত না।
—বাক্সে কী রয়েছে শলোমন?
—দু'খানা বস্ত্র রয়েছে। বয়ে এনেছে বলে একখানা আনাথ এখন নিজেই চাইছে। ওর দাবি খুব একটা অসঙ্গত নয় মা!
শলোমনের অত্যন্ত কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এলেন বৎসেবা। চাপাস্বরে বললেন— মন্দিরতলা ইব্রিয়া সুর-অসুর সৈন্যে ঘিরে ফেলেছে, সব জাতির রাজারা এসেছে, ওরা বলছে, তুমি অপবিত্র হয়েছ! এই আনাথই ওদের সাক্ষী! তুমি ওর সন্তান এবং স্বামীকে হত্যা করেছ!
এই সময় মন্দিরতলা থেকে সুউচ্চ জনরব ভেসে এল। আকাশ মথিত হচ্ছিল জনসমুদ্রের জোয়ারে। ওই আকাশে একদল যুদ্ধ-বিহঙ্গ পাখা ঝাপটে উড়ছিল। কোড়া পাখিদের উন্মত্ত ওড়াউড়ি একবার চেয়ে দেখলেন শলোমন।
—আমার সৈন্যরা কি প্রস্তুত নয় মা?
—তোমার শৌলদুর্গ আজ হাতছাড়া, তোমার গোপন সেনারা কোথায়? ওরা নিজেরাই নিজেদের অর্ধেক শেষ করে দিয়েছে। বাকিরা বিশ্বাসঘাতক।
—আমার রথনগরীর সৈন্যরা?
—ওরা শুনলাম, ইব্রিয়াকে নিষ্ক্রিয় থাকবে বলে কথা দিয়েছে। সেনাধ্যক্ষ মীনাক্ষ সৈন্যদের কিছুতেই নাকি বুঝিয়ে উঠতে পারেনি। আমি মীনাক্ষকে নানাভাবে বলেছি, ও বলছে, মন্দিরের সংকল্প আমাদের ত্যাগ করাই উচিত। এ তুমি কী করলে হেতপুত্র শলোমন!
—মা!
এবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বৎসেবা। শলোমন তাঁর হাতে ধরা বাক্সটার দিকে

ঘাড় গুজে চেয়ে রইলেন। দু'দণ্ড নিঃশব্দ থাকার পর বললেন— আমার ছেলেরা কী করছে?
—ওরা ছেলেমানুষ। যারবিয়াম আর ইদদকে ঠেকাতেই হিমসিম খাচ্ছে। পারছে না। পারবে কেন? ওরা যুদ্ধের কৌশল কতটুকু জানে! যে যেমন পেরেছে মন্দিরতলায় সৈন্য-সমাবেশ করেছে। ইব্রিয়ার পাদোদক খাচ্ছে রাজারা, আশীর্বাদ নিচ্ছে ঘন ঘন। ওরা মঞ্চ তৈরি করেছে আনাথের জন্য। ওই মঞ্চে তোমাকে উঠতে হবে দেবী আনাথ! বলে বৎসেবা নরম করে আনাথের মুখের দিকে চাইলেন।
আনাথ সামান্য শিউরে উঠে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল— আপনাকে প্রণাম কেনান-জননী। আপনার নাতিদের আপনি রক্ষা করুন। আমাকে বিদায় দিন।
—তুমি এখন কী করবে? শুধালেন বৎসেবা।
—আমার দাবি পূরণ করুন, আমি চলে যাই। জবাব করল আনাথ।
—কোথায় যাবে মা?
—ইব্রিয়ার কাছে।
ঠিক এই সময় সেই এগারো জন শলোমনবেশী অশ্বারোহী ছুটে এল। বৎসেবা তাদের দেখতে পেয়ে বললেন— তোমরা আমার শলোমনের গোষ্ঠীভাই, যাকোবের পুত্ররা! বারো গোষ্ঠীর ভিতর থেকেই নির্বাচিত প্রতিনিধি। শলোমন বাদে প্রত্যেকেই মুখোশ পরে রয়েছ। তাই না?
—আজ্ঞে হ্যাঁ। সমস্বরে বলে উঠল এগারোজন।
—শোনো, শলোমন যখন শিলান্যাস করবে, প্রত্যেকেই ওর সঙ্গে এগিয়ে যাবে তোমরা!
—আজ্ঞে জননী!
—ইলোহে কথা দিয়েছেন, শলোমনের হাতেই তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। সমস্ত জাতির চিহ্ন থাকবে সেই মন্দিরে!
—না। ক্ষমা করবেন দ্বিতীয় বৎসেবা। আমরা মাত্র বারো গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, আমরা নিজেদের ছাড়া অন্যের চিহ্ন বহন করি না। আপনি শেষ মুহূর্তে এই ধরনের শর্ত করছেন কেন? ইলোহের মন্দির ইলোহেরই মন্দির, তা দাগোনের নয়, ইস্তারেরও নয়, কোনও দেবতার নয়। ইলোহে পবিত্রতম ঈশ্বর। আপনি যারবিয়ামকে কথা দিয়েছেন ইলোহের মন্দিরই গড়া হবে।
বৎসেবা কণ্ঠস্বর যথেষ্ট শক্ত করে বললেন— কিন্তু হেতপুত্র শলোমন সকল জাতির চিহ্ন বহন করতে বাধ্য একাদশ গোষ্ঠী!
—না, তিনি বাধ্য নন হেতমাতা! ক্ষমা করবেন আমাদের! এগারোজনের একজন বলে উঠল।
শলোমন বুঝলেন, যারবিয়ামকে শর্তবদ্ধভাবে নিরস্ত করেছেন মা। এবার সম্রাট ওই এগারোটি মুখের দিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ হাসি উপহার দিয়ে বললেন— আমি বাধ্য ইস্রায়েলপুত্র!
—কারণ তুমি মহাপাপ করেছ জ্ঞানী শুলায়মন।
—ওই দ্যাখ, আমি ওই পিপীলিকাকে কথা দিয়েছিলাম। ওই দ্যাখ...
দেখা গেল অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্বিষ কৃষ্ণ পিপীলিকা শলোমনের পা বেয়ে বেয়ে

সমস্ত শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। কেউ বুঝতে না পারলেও আনাথ বুঝেছিল, পিঁপড়েরা শলোমনের গায়ে মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে ছুটে এসেছে। সমস্ত দেহে খুবই দ্রুত ছেয়ে যাচ্ছে।

আনাথ বলল— আমাকে আমার বস্ত্র দিয়ে দিন কেনান-জননী। দেরি করবেন না।

—হ্যাঁ দেব। তুমি কাঠের বাক্সটা পাহাড়ের উচ্চস্থলী পর্যন্ত পৌঁছে দাও! এস! চল, তোমরা! বলে উঠলেন বৎসেবা।

মন্দিরতলায় এসে হঠাৎ বেঁকে বসল আনাথ। চিৎকার করে বলে উঠল— আমি এসেছি মহাত্মা ইব্রিয়া!

বারোজন শলোমনকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চস্থলীর দিকে পা বাড়িয়ে থেমে পড়লেন বৎসেবা। শলোমনের হাত থেকে নেওয়া বাক্সটা এবার খুলে ফেলল আনাথ। তারপর দেখল বাক্সের মধ্যে সাদা কফন ছাড়া কিছুই নেই। তখনই মনে পড়ল, সে বেগনি রঙের কাপড়টা ডুলিতে ঘেরার কাজে ব্যবহার করেছে। অথচ সেকথা সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল।

কফনখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মঞ্চের দিকে ছুটল আনাথ। ইব্রিয়ার নির্দেশে সৈন্যরা তাকে মঞ্চে ওঠার পথ করে দিল। মঞ্চে উঠে আনাথ লক্ষ করল বারো জন শলোমন উচ্চস্থলীর পথে না গিয়ে ঘুরে চলে আসছে মন্দিরের ভূমির দিকে।

—তুমি মা, দেখে নাও তোমার সন্তানকে! তোমার গর্ভ থেকে উৎপন্ন দেবতার সমাধি স্পর্শ করে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি মা! সকল জাতি তোমার মুখ চেয়ে রয়েছে। তুমি বলে দাও, কে তোমার স্বামী-পুত্রের হত্যাকারী। কে তোমাকে অপবিত্র করেছে! বলে উঠল নবি ইব্রিয়া।

মঞ্চে উঠে বিপুল জনসমুদ্রের দিকে চাইল বুদ্ধিমতি আনাথ। তার চোখ দু'টি প্রকৃত সারগনকে খুঁজছিল। বারো জনের কে তিনি?

—তোমার হৃদয় যেন সত্য বলে মা। তোমার সমস্ত হৃদয়কে আমরা চিনি। তোমার চোখের জলের দিকে চেয়ে আছি আমরা! আবার হেঁকে উঠল বিক্ষুব্ধ ইব্রিয়া। আনাথ লক্ষ করল ইব্রিয়া নগ্ন এবং আরও কতক নগ্ন সন্ন্যেসী। নগ্নতাকে তার অত্যন্ত করুণ এবং কামার্ত মনে হল।

—আমি আমার অশ্রুকে কতকাল ধরে বয়ে এনেছি মহাত্মা! আমি আর্যকন্যা, আমার অশ্রুকে সারগনই সূর্যের উদ্দেশে তর্পণ করেন।

—তোমার সন্তানকে কে হত্যা করল, সেই কথা বল! বলে বিরক্তি প্রকাশ করল ইব্রিয়া।

—কে দু'হাতে রক্ত মেখেছে! বলে চেঁচিয়ে উঠল দিব্যা। তারপর যোগ করল— তুমি মা, তুমি ভয় ক'রো না।

—আমি যুদ্ধের দেবী সন্ন্যেসিনী। আমার সন্তানকে মানুষের যুদ্ধ গ্রাস করেছে। সম্রাট শলোমন শিশুকে ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি মরুভূমির বিলাপী গাছকে চিনিয়েছেন আমাকে। আমার ছাগশিশুকে দুধ খাইয়েছেন নিজে হাতে শলোমন।

—মিথ্যে কথা! বলে আর্ত-চিৎকার করে উঠল ইব্রিয়া। এবং সহস্র মুখে মুখে গুঞ্জন হতে লাগল।

—তোমাকে শলোমন হত্যা করতে পারতেন ইব্রিয়া। করেননি। ফের বলে উঠল আনাথ।

—মিথ্যে কথা!

—আমার শিশু যখন মরে, তার হত্যার মুহূর্তে তুমি কোথায় ছিলে ইব্রিয়া! কেন রক্ষা করনি আমার ছেলেকে! বল, কেন করনি?

ইব্রিয়া এবার কী বলবে ভেবে পেল না।

—আমিই সম্রাটকে অপবিত্র করেছি। বলে মঞ্চ থেকে নেমে আসে আনাথ। তারপর জনস্রোতে কোথায় মিশে যায়।

ততক্ষণে শিলান্যাস করে উচ্চস্থলীর দিকে এগিয়ে চলেছে বারো জন। পিছনে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন বৎসেবা। সেই সুউচ্চ সরণিতে যেতে যেতে আর যেতে পারলেন না তিনি। পড়ে গেলেন। বারো জন উপরে উঠে চলে গেল।

আনাথ ভিড়ের মধ্যে থেকে এক সময় লক্ষ করল, উপর থেকে এগারো জন সাদা অশ্বারোহী নেমে আসছে। প্রত্যেকের হাতে উন্মুক্ত তরবারি রৌদ্রালোকে ঝলসাচ্ছে। মাঝের একজনের কোষ-খোলা অসির নগ্নতা ঝলকিয়ে চোখে এসে লাগল। আনাথ দেখল, অসিতে রক্তের দাগ। চোখ ধাঁধিয়ে গেল তরোয়ালের ক্রুর কঠিন আলোর ধাক্কায়।

এত দ্রুত তারা মরুভূমিতে নেমে চলে গিয়ে ঝড়ের মতো দিগন্তে মিলিয়ে গেল যে, উচ্চস্থলীতে কী ঘটল বোঝা গেল না। আনাথের মনে হল, সে নিশ্চয়ই ভুল কিছু দেখেছে। তার বুকে ধরা কফন সে তার পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল।

মন্দির গড়ার কাজ শুরু হয়ে গেল। সবাই দেখতে পেল উচ্চস্থলীর টিলার উপর একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন সম্রাট শলোমন। একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে মন্দিরের কাজ তিনি তদারক করছেন। তাঁর পিঠের উপর খাড়া হয়ে আকাশের তলে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড়।

সম্রাট অনড়। নিষ্পলক। বিনিদ্র। কখন তিনি ওখানে ওইভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ জানে না। জননী বৎসেবা যে বারো জন শলোমনকে সঙ্গে করে উচ্চস্থলীর দিকে উঠে যাচ্ছিলেন তাদের মধ্যে এগারো জন ঘোড়ার পিঠে করে নিচে নেমে গেছে, একজন নামেননি, তিনিই সারগন। মন্দিরের মিস্ত্রি-কারিগর-শ্রমিকরা হঠাৎ কাজ করতে করতে চোখ তুলে দেখতে পায় সম্রাট দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কখন এসে দাঁড়িয়েছেন, কে তাঁকে প্রথম দেখে, কেউই বলতে পারে না।

মন্দিরের কাছে উচ্চস্থলীর সরণির গোড়ায় একটি সুবৃহৎ ফলকে লেখা রয়েছে, 'চক্ষু অবনত করে কাজ কর, কারণ স্বয়ং শলোমন তোমাকে দেখছেন।'

তাই কেউ কখনও টিলা ও পাহাড়ের দিকে চোখ তোলে না। চকিতে উপরে চোখ চলে গেলে ভয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। সম্রাটের আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের কথা কেউ জানে না। কেউই বলতে পারে না কেন বৎসেবা উচ্চস্থলীর উপরে যেতে পারেননি, মধ্যপথে পড়ে যান এবং তাঁর মৃত্যু হয়।

উচ্চস্থলীতে বৎসেবার সমাধি হয়েছে। সমাধির পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিনিদ্র সম্রাট। লোকে ভাবে, মাকে ছেড়েও শলোমন কোথাও যেতে রাজি নন। মা তাঁকে প্রেরিত করেন সর্বক্ষণ। আবার কেউ কেউ ভাবে, শলোমন তাঁর মায়ের বাসনা

অনুযায়ী মন্দির নির্মাণ করছেন। সম্রাটের নির্দেশ কিভাবে আসে মন্দিরের নির্মাণকারী মিস্ত্রি-কারিগররাও জানে না। দেখভাল করার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষকরা বারো গোষ্ঠীর লোক, তারা নিশ্চয় সম্রাটের নির্দেশ মেনেই কারিগরদের নকশা প্রস্তুত করে দিয়েছে। এইভাবেই মন্দির গড়ার কাজ শেষ হয়। খুব দ্রুত।

এই একটি দিনের জন্য অপেক্ষা করছিল খেতা গালিয়াৎ। আজ তার মুক্তির দিন। মন্দিরের প্রধান-কারিগর তার মিস্ত্রি এবং কারিগরদের নিয়ে এবং শ্রমিকদের নিয়ে উচ্চস্থলীর দিকে সম্রাটকে কাজ শেষ হওয়ার বার্তা জানাতে চলেছে। তারা প্রণাম করে আপন আপন ডেরায় ফিরে যাবে। কারিগরদের অনুসরণ করে উপরে চলেছে বিশাল জনবাহিনী। কেনানের সমস্ত রাজারাও চলেছেন। তাঁদের আগ্রহ সম্রাট আজ কী বলেন, তাই শোনার। ইব্রিয়া কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না। যিবুষরা নীরব। তারা মন্দিরের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও জিরুজালেমের মাটি ছেড়ে কোথাও যায়নি।

গালিয়াৎ স্থির করেছে, এই বিশাল জনসমুদ্রের ভিতর থেকেই ছায়ামূর্তির ছদ্মবেশে ফিঙ্গা ছুঁড়বে, তারপর নিজ মূর্তির কাঠামো ভেঙে আত্মপ্রকাশ করবে। তার আগে সম্রাটকে অবশ্য প্রণাম করে বলবে— আমি আপনার ছায়া হয়ে গর্বিত ছিলাম মহাজ্ঞানী! কিন্তু আমি দাসত্বের অপমান, জাতির অপমান, ইব্রিয়ার অঙ্গীকার কখনও ভুলিনি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! বলেই সে ফিঙ্গা ছুঁড়বে।

সম্রাট বৎসেবার সমাধির পাশে স্থির, লাঠিটাও অনড়। দূর থেকেই তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছে মানুষ। শলোমন একটি কথাও বলছেন না। একটি হাত লাঠির উপর, অন্য হাতটি তুলে আশীর্বাদ করতে পারেন। কিছুই করছেন না মহামতি সারগন। তাঁর কাছাকাছি চলে গিয়ে আশীর্বাদ চাওয়ার সাহসও কারও নেই। অতিরিক্ত সম্ভ্রমবশত সকলেই দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

এগিয়ে গেল গালিয়াৎ। একেবারে সন্নিকটে চলে গেল। শলোমনের ছায়ামূর্তি ভেবে সৈন্যরা বাধা দিতে পারল না। মাটিতে শুয়ে পড়ে উপুড় হয়ে শলোমনের পায়ের দিকে দু'টি হাত বাড়িয়ে দিল গালিয়াৎ। তারপর চিৎকার করে বলল— আমি আপনার ছায়া হয়ে গর্বিত ছিলাম মহাজ্ঞানী!

গালিয়াতের একটি হাত সম্রাটের লাঠিকে স্পর্শ করা মাত্র সেটি মাটিতে পড়ে গেল।

আশ্চর্য হয়ে গেল গালিয়াৎ। চেয়ে দেখল, লাঠির মাটিতে খাড়া হয়ে থাকাটা সত্যিই বিস্ময়কর, কেননা লাঠির নিচের প্রান্তে উই ধরেছে এবং শলোমন খেয়াল করেননি।

—সম্রাট আপনি চুপ করে রয়েছেন কেন? আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি কাবিল গালিয়াৎ, মহারাজা!

এবার আপনা থেকেই শলোমনের মমি মাটিতে কাত হয়ে পড়ে গেল।

গালিয়াৎ বিশ্বাস করতে পারছিল না। কেমন বোকার মতো কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল। কোমর থেকে ফিঙ্গাটা টেনে নিয়ে কী করবে ভেবে পেল না। সে ফিঙ্গার পাথর নয়, ফিঙ্গাটাই ছুঁড়ে দিল শলোমনের পায়ের দিকে।

মৃত শলোমন শুয়ে রইলেন উচ্চস্থলীতে। উচ্চস্থলীর বিভিন্ন দেবতার মন্দিরে তখন পূজার ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল।

গালিয়াৎ আর্তসুরে চিৎকার করে উঠল— আনাথ! আনাথ!

কেউ জবাব দিল না।

রাত্রি গভীর হল সূর্যাস্তের পর। চাঁদ উঠল আকাশে। গোলাকার সম্পূর্ণ চাঁদ। জ্যোৎস্নার তীব্রতা ছিল। মরু-শেফালিকার গন্ধে ডাক-হরিণেরা ডাকছিল। একটি অতিরিক্ত সাদা উট উঠে এল উচ্চস্থলীতে। ময়ূরকণ্ঠী বেগনি-সাদা কাপড় দিয়ে উটের ডুলি ঘেরা। তা থেকে নেমে এল আনাথ।

শলোমনের পায়ের তলায় বসল আনাথ। তারপর কফনখানা সম্রাটের গায়ে জড়িয়ে দিল। বলল— আমি তোমাকে বাঁচাতে পারিনি শান্ত! আমি ছাড়া কেউ জানে না কখন তোমার মৃত্যু হল! তুমি তো অমরত্ব চাওনি, তবু তুমি এভাবে রয়েছ, তোমাকে যারা এমন করেছে, তারা এই কেনানের দখল চায়। তুমি কি তোমার ইলোহের জন্য মাটিটুকু পাওনি? তার বেশি আর কী চেয়েছিলে, মহাজ্ঞানী শুলায়মন!

শলোমন কোনও কথাই বললেন না। আনাথ তার উটের পিঠে চড়ে বসল। উটে যেতে যেতে আনাথের মনে হল, মৃত্যুকেও ফাঁকি দিয়েছেন তিনি এবং আনাথকেও ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন। সবই কেমন স্বপ্ন-মরীচিকা, উটের ডুলিতে আনাথের কোলে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকা শলোমন কি সত্যিই শলোমন ছিলেন?

উট দিগন্তের দিকে চলে যেতে লাগল। এক অশ্বারোহী এই উটকে অনুসরণ করে আসছিল। পিছন থেকে ডেকে উঠল— আনাথ! আনাথ!

আনাথ সাড়া দিল না। অশ্বারোহী থেমে গেল এবং দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। উট চলে যেতেই থাকল। দাঁড়াল না।

আদম বললেন, লেখো ভাই লিপিকার, সবই ভূমরুর ছায়া বটে, কিন্তু আনাথের তলপেটে যে মানবপিণ্ড ঘাই মেরে উঠল তা মানুষেরই মূর্তি, তা বাস্তব।